এখন বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান গ্যারি কার্স্টেন

টেলিভিশন : এ-পক্ষের নির্বাচিত অনুষ্ঠানসূচি

৬ নভেম্বর ১৯৯৬ আনন্দবাজার প্রকাশন পনেরো টাকা

আনন্দমেলা

দেশ-বিদেশের গোয়েন্দা গল্প

মাধ্যমিক পরীক্ষার লেখাপড়া

অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরামর্শ ও 'মডেল' প্রশ্নোত্তর

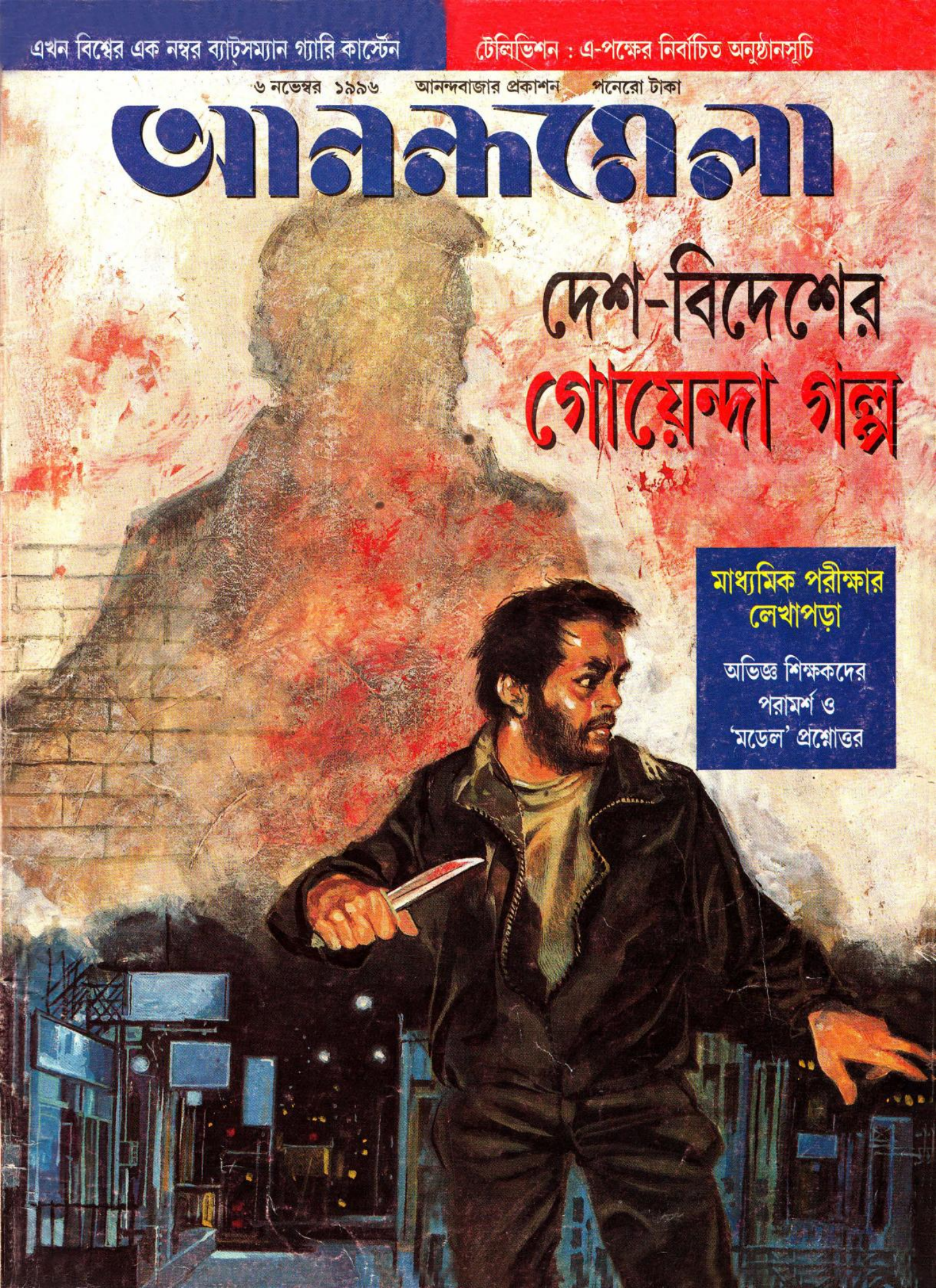

জীবনেও যেন না ভুলি কখনো এই কথাটি

PARLE

জীবনের পথ এই তো সত্যি!

জীবনের এই চলার পথে পরীক্ষা তো প্রতিপদে, কোন্ পথে পা বাড়াবে, কোন্‌দিক থেকে মুখ ফেরাবে, তাইতো জানায় আমাদের পরিচয়। বিনা আশায় কারো বেদনার ভাগ নেওয়া, বিনাস্বার্থে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, এইতো বাঁচার মত বাঁচা, সততার সাথে বাঁচা। জীবনেও যেন না ভুলি কখনো এই কথাটি, জীবনের পথ এইতো সত্যি।

ব হু ব ছ র ধ রে ভা র তে র স ব চে যে বে শি চা হি দা র বি স্কু ট

স্বাদভরা, সত্যিকার শক্তিভরা

everest/95/PPL/110bn

আনন্দমেলা

২২ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২০ কার্ত্তিক ১৪০৩ ৬ নভেম্বর ১৯৯৬

৯ দেশ-বিদেশের গোয়েন্দা গল্প

ছোট কোনও একটা সূত্র, আর বাকিটা স্রেফ বুদ্ধির খেলা। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি আর নিখুঁত অনুমানক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এভাবেই জটিল সব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারেন গল্পের গোয়েন্দারা। দেশ-বিদেশের গোয়েন্দা গল্পে দেখা যায় এঁদের অবিশ্বাস্য নানা বাহাদুরি। এবারের আনন্দমেলায় রইল এরকমই একগুচ্ছ দুর্দান্ত গোয়েন্দাগল্প। লিখেছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ও হিমানীশ গোস্বামী। এ ছাড়া থাকছে তিনটি বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের অনুবাদ।

৭০ অঙ্কুর '৯৬

আনন্দমেলা পত্রিকা ও পাঠভবন স্কুলের মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছে আন্তঃস্কুল বাংলা একাঙ্ক নাটকের প্রতিযোগিতা 'অঙ্কুর '৯৬'। গত ৬ অক্টোবর রবীন্দ্রসদনে হয়েছে এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের অনুষ্ঠান। জানিয়েছেন অভীক ভট্টাচার্য।

৭১ মাধ্যমিক পরীক্ষার লেখাপড়া

মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে এ-সংখ্যা থেকে নিয়মিতভাবে শুরু হচ্ছে নতুন বিভাগ 'লেখাপড়া'। থাকছে বিভিন্ন বিষয়ে ভাল নম্বর পাওয়ার জন্য জরুরি পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় মডেল প্রশ্নোত্তর। লিখছেন অভিজ্ঞ শিক্ষকরা। এ-সংখ্যায় থাকছে ভৌতবিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ে আলোচনা। লিখেছেন যথাক্রমে অজয় চক্রবর্তী ও কালিদাস চন্দ।

আগামী আকর্ষণ

প্রচ্ছদকাহিনী : **বিস্ময়মানব**

রোমাঞ্চকর সব ঘটনা ঘটিয়ে খবরের কাগজের শিরোনাম হয়ে ওঠেন এক-একজন মানুষ। কেউবা কম্পিউটারের চেয়েও দ্রুত কষে ফেলেন জটিল অঙ্ক, দাঁত দিয়ে বিশাল এরোপ্লেন টানতে পারেন কেউ, আবার কেউ মোটরবাইকে চড়ে লাফিয়ে পেরিয়ে যান চিনের প্রাচীর। বিস্ময়কর ক্ষমতার অধিকারী এই মানুষদের নিয়েই আগামী সংখ্যার প্রচ্ছদকাহিনী। এ ছাড়া থাকছে নিয়মিত বিভাগ **'মাধ্যমিক পরীক্ষার লেখাপড়া'**। মাধ্যমিকে ভাল ফল করতে হলে মন দিয়ে পড়তে হবে এই বিভাগটি।

এ ছা ড়া ও

গো য়ে ন্দা গ ল্প

পটলবাবুর বিপদ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৯
অর্জুন হতভম্ব সমরেশ মজুমদার ১৭
কিস্তিমাত সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ২১
নিখুঁত খুনের কাছাকাছি হেনরি হোল্ট ২৫
কাফে রয়্যালে গণ্ডগোল ক্ল্যারেন্স রুক ৩০
কিট্টুর রোমহর্ষক কীর্তি হিমানীশ গোস্বামী ৩৪
স্বীকারোক্তি প্যাট্রিসিয়া ম্যাকগের ৪৩
রহস্য রজনীগন্ধার ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৫৮

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পাণ্ডব গোয়েন্দা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৬৭

খে লা ধু লো

খেলার খবর ৮৩
মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল... রতন চক্রবর্তী ৮৭
পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয়... সমীরণ সেন ৮৯
এখন বিশ্বের এক নম্বর... তানাজি সেনগুপ্ত ৯০

নি য় মি ত ক মি ক্ স

আর্চি ৩৩ **টিনটিন** ৩৬ **গোখরো উপত্যকা** ৪০ **গলদেশ পরিক্রমায় অ্যাসটেরিক্স** ৪৪ **অরণ্যদেব** ৪৮ **ডাঃ রেক্স মর্গান** ৫৬ **টারজান** ৬০ **গাবলু** ৬৪

নি য় মি ত বি ভা গ

ফেলুদা কুইজ ৪ **কুইজ** ৫ **কেরিয়ার গাইড** ৭
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ১৫ **কবিতা** ৫০ **শব্দসন্ধান** ৬৮
টেলিভিশন ৯২ **ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালি** ৯৪

প্র চ্ছ দ

অনুপ রায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস 'হরিপুরের হরেক কাণ্ড' অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল না। আগামী সংখ্যা থেকে আবার নিয়মিত প্রকাশিত হবে।

স ম্পা দ ক

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দাম ১৫ টাকা। বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা
উত্তর-পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

ফেলুদা কুইজ

পিয়ালি বসুবিশ্বাস

গত সংখ্যার উত্তর

জটিল ফেলুদা ❑ ১

(১) একশো বছরের পুরনো স্ট্যাম্পে 'পোস্টেজ' (Postage) শব্দটির 'G'-এর স্থানে 'C' ছাপা হয় (কৈলাস চৌধুরীর পাথর)। (২) প্রথমে লখনৌ-এর ভুলভুলাইয়ায় ; পরে নিজেরই দেশলাই বাক্সে (বাদশাহী আংটি)। (৩) 'কৈলাস চৌধুরীর পাথর' গল্পে। (৪) রঞ্জন মজুমদার ; ১৩ নং রোল্যান্ড রোড (লন্ডনে ফেলুদা)। (৫) জটায়ুর 'পিঠাপুরমের পিশাচ' গল্পের এক আধপাগলা চরিত্র (হত্যাপুরী)। (৬) সুপুরিভরা কোডাক ফিল্মের কৌটো ও খবরের কাগজ (বাক্স রহস্য)। (৭) আনন্দবাজার পত্রিকা, কারণ ওই টাইপটা শুধুমাত্র আনন্দবাজারেই ব্যবহৃত হয় (ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি)। (৮) প্যারাডাইস (বোম্বাইয়ের বোম্বেটে)। (৯) কৈলাস ও কেদার চৌধুরী (কৈলাস চৌধুরীর পাথর) ও চন্দ্রনাথ বোস, ডলি মুন্সী (ডাঃ মুন্সীর ডায়েরী)। (১০) মিরান্ডা (ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর)। (১১) স্নো লেপার্ড (হত্যাপুরী)। (১২) শ্যামলাল মল্লিক (গোঁসাইপুর সরগরম)।

জটিল ফেলুদা ❑ ২

(১) নারায়ণ (সোনার কেল্লা)। (২) টিনটোরেটোর যীশু। (৩) অমৃতবাজার পত্রিকায় দেওয়া ফেলুদার বিজ্ঞাপন দেখে (কৈলাস চৌধুরীর পাথর)। (৪) PRI = Private Tex-Tec এর বহুবচন Tec = Detective (গ্যাংটকে গণ্ডগোল)। (৫) 'কৈলাস চৌধুরীর পাথর'-এ ফেলুদার যে ভিজিটিং কার্ডের পরিচয় পাই, তাতে নামের বানান 'PRODOSH' আর 'বাক্স রহস্য'-এ দেখা যায় বানান পালটে হয়েছে 'PRADOSH'। (৬) ত্বাষ্ট্র (গোলকধাম রহস্য)। (৭) সুধীর ধর (সোনার কেল্লা)। (৮) লালমোহন গাঙ্গুলি (কৈলাসে কেলেঙ্কারী)। (৯) বিরূপাক্ষ মজুমদার (দার্জিলিং

জমজমাট)। (১০) হুয়ান ভুকেন্টিচ্ (সোনার কেল্লা)। (১১) আখতারি বাঈ (জয়বাবা ফেলুনাথ)। (১২) গোকুল (ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা)।

মহিলা চরিত্র

(১) কার্লা ক্যাসিনি (টিনটোরেটোর যীশু)। (২) শকুন্তলা দেবী (শকুন্তলার কণ্ঠহার)। (৩) টমাসের মেয়ে শার্লট গডউইনের (গোরস্থানে সাবধান)। (৪) ভিক্টোরিয়ার চিঠি (গোরস্থানে সাবধান)। (৫) নিলীমা দেবী (ছিন্নমস্তার অভিশাপ)। (৬) সুচন্দ্রা দেবী ; তিনি 'কারাকোরাম'— সিনেমার নায়িকা (দার্জিলিং জমজমাট)। (৭) রাজেন মুনসীর স্ত্রী ডলি (ডাঃ মুন্সীর ডায়েরী)। (৮) হেলগা উঙ্গার (গ্যাংটকে গণ্ডগোল)। (৯) রূপা (কৈলাসে কেলেঙ্কারী)। (১০) মেরী শিলা বিশ্বাস (শকুন্তলার কণ্ঠহার)।

ভিলেন

(১) বনবিহারী সরকার (বাদশাহী আংটি)। (২) সিদ্ধেশ্বর মল্লিক (ভূস্বর্গ ভয়ংকর)। (৩) মণিমোহন সমাদ্দার (সমাদ্দারের চাবি)। (৪) জয়বাবা ফেলুনাথ, যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে ও গোলাপী মুক্তো রহস্য। (৫) বনবিহারী সরকার (বাদশাহী আংটি)। (৬) নরেশচন্দ্র পাকড়াশী (বাক্স রহস্য)। (৭) রাজেন্দ্র রায়না (দার্জিলিং জমজমাট)। (৮) মিঃ গোরে (বোম্বাইয়ের বোম্বেটে)। (৯) মগন লাল মেঘরাজ (জয়বাবা ফেলুনাথ)। (১০) সুনীল তরফদার (নয়ন রহস্য)।

অন্তিম ফেলুদা

(১) ফেলুদা আংটি পরেই না। একবারই ও আংটি পরেছিল— বাদশাহী আংটি (বাদশাহী আংটি)।

কু
কু ই জ
জ

গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাস প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো

এরক্যুল পোয়ারো থেকে শার্লক হোম্‌স, ব্যোমকেশ বক্সী থেকে ফেলুদা—গল্পের এই গোয়েন্দারা অনেক সময় হার মানান বাস্তবের অনেক নামী গোয়েন্দাদেরও।

সামান্য একটা পায়ের ছাপ অথবা আধপোড়া একটা সিগারেটের টুকরো এবং বাকিটুকু স্রেফ বুদ্ধির খেলা। এভাবেই জটিল সমস্ত রহস্যের সমাধান করে ফেলা শার্লক হোম্‌স বা ফেলুদার কাছে, যাকে বলে বাঁ হাতের ব্যাপার। নকল পেন্টিংয়ের ওপর কোথায় রঙের গায়ে আটকে আছে সামান্য এক শ্যামাপোকা, বা কোনও এক অজ্ঞাতপরিচয় মানুষ হাঁটার সময় বাঁ দিকে একটু ঝুঁকে চলেন, এটুকু সূত্র থেকেই সমাধানে পৌঁছে যেতে পারেন ওঁরা। এবং ঘটনা হল, গল্পের এই গোয়েন্দারা এত অনায়াসে জট ছাড়িয়ে ফেলেন সমস্যার যে, পড়তে-পড়তে মনে হয় ব্যাপারটা আসলে খুব সোজা, চেষ্টা করলে হয়তো আমি-আপনিও হয়ে যেতে পারি এরক্যুল পোয়ারো বা শার্লক হোম্‌স। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু অত সোজা নয়। আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, দ্রুত ভাবতে পারার ক্ষমতা আর ক্ষুরধার অনুমানক্ষমতা ওঁদের আমাদের চেয়ে আলাদা করে তুলেছে। গত প্রায় ১৫০ বছরের গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাসের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, কেন এবং কোথায় ওঁরা আমাদের চেয়ে আলাদা।

১৫০ বছর ? শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি, গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাস প্রায় অতদিনেরই পুরনো। আরও নিখুঁত হিসেব যদি করতে হয়, ১৮৪১ সালে প্রকাশিত এডগার অ্যালান পো-র 'দ্য মার্ডার্‌স ইন দ্য রু মর্গ' গল্পটিকেই ধরতে হবে সবচেয়ে পুরনো গোয়েন্দা গল্প হিসেবে। এই যুক্তি অনুযায়ী, গল্পের গোয়েন্দাদের মধ্যে 'আর্কেটাইপ' বলে কাউকে চিহ্নিত করতে গেলে তিনি অবশ্যই অগুস্ত্‌ দুপ্যাঁ। কিন্তু বিস্ময় জাগে, যখন ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, পো-র পর নতুন গোয়েন্দা গল্পের বই প্রকাশিত হতে সময় লাগে প্রায় ৩৭ বছর। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয় আনা ক্যাথারিন গ্রিন-এর বিখ্যাত গল্প 'দ্য লিভেনওয়ার্থ কেস'। এর পর অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে যায় গোয়েন্দা গল্পের জোয়ার। ইউরোপে গোয়েন্দা গল্প জনপ্রিয় হয়ে ওঠে গত শতকের ছয়ের দশকে।

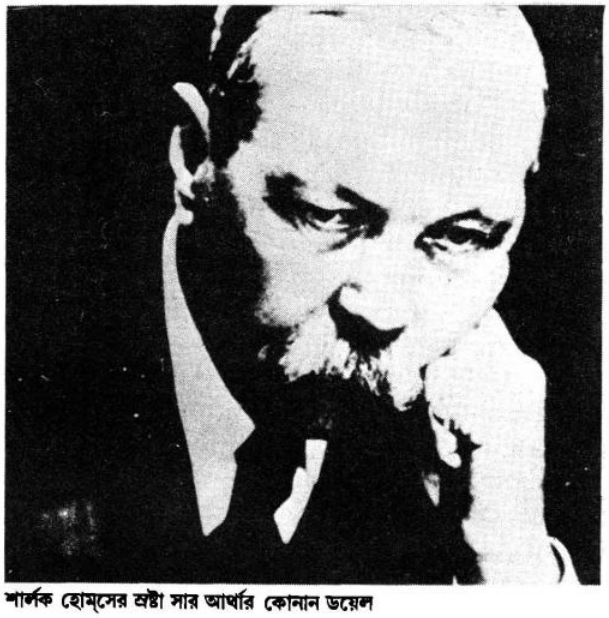

শার্লক হোম্‌সের স্রষ্টা সার আর্থার কোনান ডয়েল

ফ্রান্সের এমিল গ্যাবোরিয়াউ-এর 'লা অ্যাফেয়ার লে রোগ' দিয়ে শুরু, তারপর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকাশিত হয় ফরচুনে দু বোয়গোবি এবং গাস্তঁ লেরো-র বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা গল্প। গ্যাবোরিয়াউ-এর গল্পের নায়ক মসিয়ঁ লেকো তো রীতিমত জনপ্রিয়ই হয়ে ওঠেন। গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাসে অবশ্য ইংল্যান্ডকে একটা আলাদা জায়গা দিতেই হবে। কারণ, আর্থার কোনান ডয়েল এবং শার্লক হোম্‌স। কিন্তু কোনান ডয়েলের আগেও ইংরেজিতে গোয়েন্দা গল্প লেখা হয়েছে। সবচেয়ে পুরনো ইংরেজি গোয়েন্দা গল্প হল উইল্‌কি কলিন্স-এর 'দ্য উওম্যান ইন হোয়াইট' এবং 'দ্য মুনস্টোন'। চার্ল্‌স ডিকেন্স-এর 'দ্য মিস্ট্রি অব এডউইন ড্রুড' নিঃসন্দেহে হতে পারত সর্বকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা উপন্যাস, কিন্তু ডিকেন্স তাঁর জীবৎকালে উপন্যাসটি শেষ করে যেতে পারেননি। কোনান ডয়েল-এর প্রথম উপন্যাস 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট' প্রকাশিত হয় ১৮৮৭ সালে, এবং প্রথম আবির্ভাবেই বাজার মাত করে দেন শার্লক হোম্‌স। এর পর 'দ্য সাইন অব দ্য ফোর', 'দ্য হাউন্ড অব বাস্কারভিল্‌স', 'দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার' এবং অসংখ্য ছোটগল্পে হোম্‌স এবং সহকারী ওয়াটসনের সাম্রাজ্যবিস্তারের ধারাবাহিক কাহিনী। সত্যি বলতে কী, হোম্‌সের চেয়ে জনপ্রিয় গোয়েন্দা গত ১৫০ বছরের গোয়েন্দা গল্পের ইতিহাসে আর কেউ এসেছেন বলে মনে হয় না। আগাথা ক্রিস্টি-র এরক্যুল পোয়ারো এবং মিস মারপল-এর কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে, ভোলা চলবে না এইচ. সি. বেইলি-র রেজিনাল্ড ফরচুন বা এ. বি. কক্স-এর রজার শেরিংহ্যাম-এর কথাও। আর হ্যাঁ, মনে রাখতে হবে ছিপছিপে দোহারা চেহারার ছ'ফুটের ওপর লম্বা দুর্ধর্ষ কারাটে-জানা ঠোঁটে চারমিনার ঝোলানো আদ্যন্ত স্মার্ট কলকাতার এক যুবকের কথাও। যে-কোনও বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন, এত 'এক্সটেনসিভ' পড়াশোনা ; গোয়েন্দাগিরির সূত্রে চষে ফেলেছেন গোটা ভারত, অসম্ভব ধারালো চোখ আর আশ্চর্য অনুমানশক্তির এই মানুষটি হলেন সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা গল্পের নায়ক শ্রীপ্রদোষচন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা।

গত সংখ্যার উত্তর

(১) জিয়োভান্নি শিয়াপারেলি।
(২) আনন্দবাজার পত্রিকায়।
(৩) অরবিন্দ ডি সিলভা।
(৪) শরৎচন্দ্র পণ্ডিত।
(৫) যথাক্রমে ডোনোভান বেইলি এবং গেল ডেভার্স।
(৬) হ্যারল্ড ডেনিস বার্ড।
(৭) দিয়েগো মারাদোনা।
(৮) লোম্বার্ড ওয়ার্ল্ড চ্যালেঞ্জ ট্রোফি।
(৯) পণ্ডিত রবিশঙ্কর।
(১০) ডন ব্রাডম্যান।
(১১) উত্তরপ্রদেশের।

আনন্দমোহন চক্রবর্তী

(১২) ম্যান্ডেলা গোল্ড।
(১৩) স্পিরিদোন লুইস।
(১৪) নীহাররঞ্জন গুপ্ত।
(১৫) জন ফিটজেরাল্ড কেনেডি।
(১৬) টোব্যাকো মোজেইক ভাইরাস।
(১৭) আনন্দমোহন চক্রবর্তী।
(১৮) নবীনচন্দ্র সেন।
(১৯) জওহরলাল নেহরু।
(২০) ১৮৭৩ সালের ২৪ জানুয়ারি।

(১) ভারতের সবচেয়ে পুরনো খবরের কাগজের নাম কী ?
অরিজিৎ দাশ, যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল, কলকাতা।
(২) হাতির শুঁড়ে কতগুলি মাংসপেশি দেখতে পাওয়া যায় ?
শেখ মহম্মদ মুরশেদ, গোপালনগর, মেদিনীপুর।
(৩) কোন ভারতীয় ক্রিকেটার তাঁর জীবনের প্রথম রঞ্জি, দলীপ এবং ইরানি ট্রোফির ম্যাচেই শতরান করেন কনিষ্ঠতম খেলোয়াড় হিসেবে ?
শরদিন্দু দত্ত, দেবীপুর, হাওড়া।
(৪) কোন ক্রিকেটারকে ডাকা হয় 'ব্ল্যাক ব্রাডম্যান' নামে ?
চিরদীপ গুহ, ফণীন্দ্র দেব ইনস্টিটিউশন, জলপাইগুড়ি।
(৫) রোমান সাহিত্যের মহাকবি ভার্জিলের পুরো নাম কী ?
নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, আশ্রম রোড, কোচবিহার।
(৬) ম্যানোয়েল ফ্রান্সিসকো ডস স্যান্টোস এক বিখ্যাত ফুটবলারের নাম। এঁকে আমরা কী নামে চিনি ?
তন্দ্রা চক্রবর্তী, সরোজিনী হস্টেল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
(৭) রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে সর্বপ্রথম কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন ? কত সালে ?

অনন্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আহিরীটোলা, কলকাতা।
(৮) কার আত্মজীবনীর নাম 'ডায়েরি, ১৯৯৬' ?
জয় সরকার, জেনকিন্স স্কুল, কোচবিহার।
(৯) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ কোনটি ?
সুপর্ণা রায়, দুর্গাচরণ চৌধুরী লেন, কলকাতা।
(১০) আজহারউদ্দিনের আত্মজীবনীর নাম কী ?

প্রশ্ন

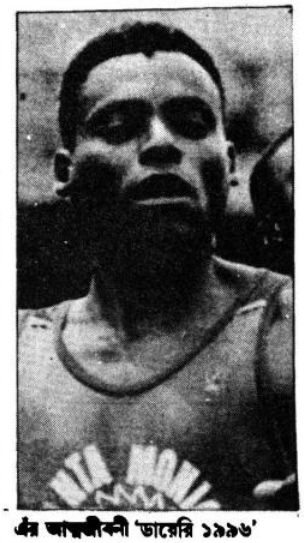

এঁর আত্মজীবনী 'ডায়েরি ১৯৯৬'

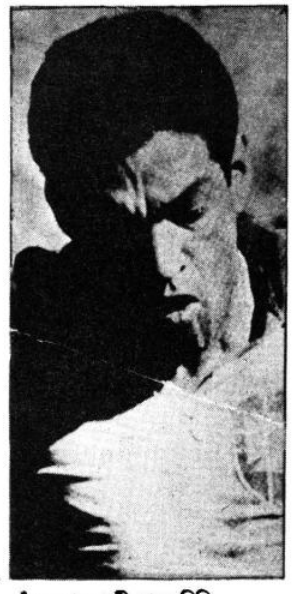

এঁকে আমরা কী নামে চিনি

তমালিকা মৌলিক, শোভাবাজার, কলকাতা।
(১১) শ্রীঅরবিন্দ এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে একটি বিষয়ে মিল আছে— দু'জনেরই প্রয়াণ একই তারিখে। কত তারিখ ?
বিজয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। মহিষাদল, মেদিনীপুর।
(১২) 'যাযাবর' ছদ্মনামে লিখেছেন কোন সাহিত্যিক ?
রাসেল রহিম, কে. কে. ইনস্টিটিউশন, ঝাড়গ্রাম।
(১৩) ভারতের কোন শহরকে বলা হয় 'অরেঞ্জ সিটি অব ইন্ডিয়া' ?
ঈশিতা রায়চৌধুরী, বৈদ্যবাটী, হুগলি।
(১৪) কলকাতা পুলিশের ডগ স্কোয়াডের প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী কুকুরদুটির নাম কী ছিল ?
অঞ্জনা রায়, বিজয়গড়, কলকাতা।
(১৫) ১৯৯৬ সালের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে জুরি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একজন বাঙালি চিত্র পরিচালক। তাঁর নাম কী, বলতে পারো ?
তারক শাসমল, কাঁথি, মেদিনীপুর।
(১৬) দেখতে ছোট হলেও পিঁপড়ের ভার বহন ক্ষমতা চমকে দেওয়ার মতো। নিজের ওজনের কত গুণ ভার বইতে পারে পিঁপড়ে ?
রথীন্দ্রনাথ দে, কোন্নগর, হুগলি।
(১৭) স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনীর প্রথম সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন ?
দিয়া সেন, গল্ফ গ্রিন, কলকাতা।
(১৮) 'ক্রল' কথাটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত ?
দেবাশিস মৈত্র, বারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগণা।
(১৯) হ্যালহেড-এর বাংলা ব্যাকরণ কত সালে প্রকাশিত হয় ?
তিথি ভট্টাচার্য, কালিম্পং, দার্জিলিং।
(২০) কে লিখেছেন "দ্য গ্লিম্পসেস অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি" বইটি ?
শ্রেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

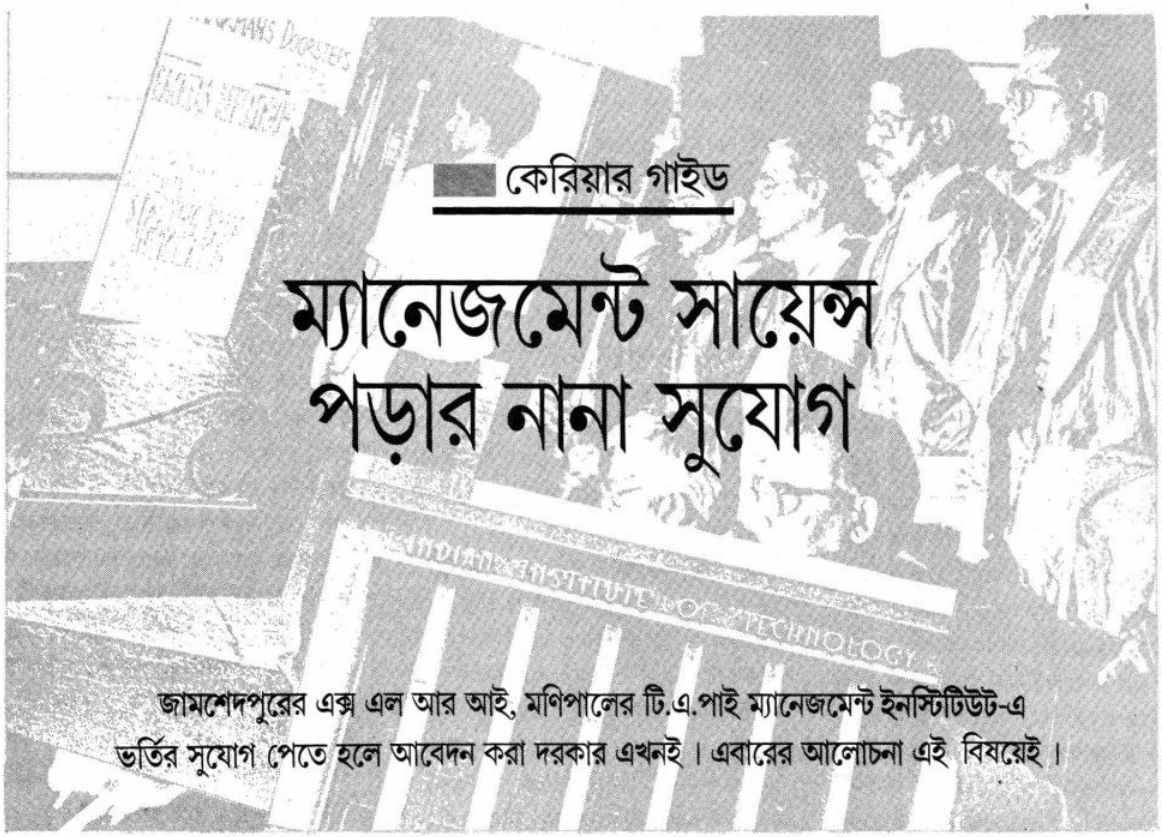

কেরিয়ার গাইড

ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স পড়ার নানা সুযোগ

জামশেদপুরের এক্স এল আর আই, মণিপালের টি.এ.পাই ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট-এ ভর্তির সুযোগ পেতে হলে আবেদন করা দরকার এখনই। এবারের আলোচনা এই বিষয়েই।

এক্স এল আর আই

এদেশের যে-ক'টি 'ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট'দেশে-বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে, জামশেদপুরের জেভিয়ার লেবার রিলেশন্স ইনস্টিটিউট (সংক্ষেপে এক্স এল আর আই) নিঃসন্দেহে প্রথম সারির শিক্ষায়তন। এখানকার স্নাতকরা দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশাদারি পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন।

বিভিন্ন পাঠক্রম

'ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স' অর্থাৎ 'ব্যবস্থাপনাবিদ্যা'র যেসব কোর্স এখানে পড়ানো হয় সেগুলি হল : (১) 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট' ; (২) 'পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন্স' ; (৩) তিন বছর মেয়াদের সান্ধ্যকালীন 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কোর্স' ; (৪) 'ফেলো প্রোগ্রাম ইন ম্যানেজমেন্ট'।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

দু'বছর মেয়াদের বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কিংবা পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ এগ্রিগেটে নম্বর পেয়ে ১০+২+৩ পর্যায়ের স্নাতক পরীক্ষায় পাশ করতে হবে। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অবশ্য ৪০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলেই ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। যাঁরা ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তারিখের মধ্যে স্নাতক স্তরের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করবেন, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। সান্ধ্যকালীন কোর্সটি মূলত কর্মরত প্রার্থীদের জন্য। যাঁরা জামশেদপুর অঞ্চলে কর্মসূত্রে আছেন এবং যাঁদের 'এগ্‌জিকিউটিভ' পদে দু'বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে, এমন প্রার্থীরা এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আর 'ফেলো প্রোগ্রাম'-এ ভর্তি হতে হলে প্রার্থীকে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রির পরীক্ষায় কমপক্ষে ৫৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। তফসিলি ক্ষেত্রে অবশ্য ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করলেই হবে। যেসব প্রার্থী বি ই কিংবা বি টেক পরীক্ষায় কমপক্ষে এগ্রিগেটে৬০ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করেছেন এবং যাঁদের তিন বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আছে, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন।

কীভাবে আবেদন করবেন

প্রথমে ইনস্টিটিউটের অফিস থেকে 'প্রসপেক্টাস' সংগ্রহ করা দরকার। সেখান থেকে বিভিন্ন নিয়ম দেখে নিয়ে ফর্ম পূরণ করতে হবে। প্রসপেক্টাস ও ফর্ম সংগ্রহ করতে হলে আপনাকে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার এক্স এল আর আই জামশেদপুর শাখার ওপর একটি 'ড্রাফ্‌ট' কাটতে হবে। ৫০০ টাকা মূল্যের ড্রাফ্‌টটি হবে 'XLRI JAMSHEDPUR'-এর অনুকূলে। অনুরোধপত্রের সঙ্গে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট ছাড়াও তিন ইঞ্চি × দুই ইঞ্চি মাপের, নামঠিকানা লেখা/টাইপ করা (বড় হাতের ইংরেজি অক্ষরে) 'স্টিকার' পাঠাবেন। যোগাযোগের ঠিকানা : অ্যাডমিশন্স কো-অর্ডিনেটর, XLRI, সি. এইচ. এরিয়া (ই), জামশেদপুর-৮৩১ ০০১।

দরকারি কথা

লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের ভিত্তিতে প্রার্থী মনোনয়ন করা হবে। লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে ৫ জানুয়ারি, ১৯৯৭ তারিখে। পূরণ-করা ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ দিন, ১৫ নভেম্বর ১৯৯৬।

টি. এ. পাই ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট

কোর্সের নাম 'পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রাম ইন ম্যানেজমেন্ট'। এই কোর্সটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার অনুমোদিত মাস্টার্স ডিগ্রির সমতুল।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

'আর্টস,' 'সায়েন্স', 'কমার্স', 'বিজনেস ম্যানেজমেন্ট', 'এঞ্জিনিয়ারিং', 'এগ্রিকালচার', 'ভেটেরিনারি', 'ফিশারি', 'ফার্মাসি', 'হোটেল ম্যানেজমেন্ট', 'মেডিসিন'—যে-কোনও শাখার ১০+২+৩ পর্যায়ের স্নাতক হতে হবে এবং স্নাতকস্তরে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বরসহ পাশ

করতে হবে। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে অবশ্য ৪৫ শতাংশ নম্বরসহ পাশ করলেই হবে। 'চার্টার্ড', 'কস্টিং', 'কোম্পানি সেক্রেটারিশিপ' ডিগ্রি প্রাপকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভর্তির নিয়ম

এই ইনস্টিটিউটে যাঁরা ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তাঁদের আলাদাভাবে আই আই এমের 'ক্যাট' পরীক্ষায় বসতে হবে এবং সেজন্য আলাদাভাবে আই আই এম কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতে হবে। ক্যাট 'র‍্যাঙ্ক' অনুসারে বাছাই প্রার্থীদের ইন্টারভিউ এবং 'গ্রুপ ডিসকাশন'-এর মাধ্যমে মনোনীত করা হবে।এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য প্রসপেক্টাস ও ফর্ম সংগ্রহ করতে হলে ৬০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট পাঠাতে হবে—টি এ পাই ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের অনুকূলে। ড্রাফ্ট কাটতে হবে সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক, কর্পোরেশন ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, কানাড়া ব্যাঙ্ক, বিজয়া ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক অব বরোদা, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া—যে-কোনও ব্যাঙ্কের মণিপাল বা উদুপি শাখার ওপর। তফসিলি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকার ড্রাফ্ট পাঠাতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা : দ্য অ্যাডমিশন্স কো-অর্ডিনেটর, টি এ পাই ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, মণিপাল-৫৭৬১১৯, কর্নাটক। পূরণকরা ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৯৬।

এই পক্ষের সুযোগ

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিচুড টেস্ট ইন এঞ্জিনিয়ারিং

এঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, আর্কিটেকচার, ফার্মাসি বিভিন্ন বিষয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে ভর্তি হতে হলে গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিচুড টেস্ট -এ সফল হওয়া দরকার। কেননা 'গেট' সফল প্রার্থীদের তালিকা থেকে ভর্তির জন্য মনোনীত করা হয় এবং সেই প্রার্থীরাই স্কলারশিপ কিংবা 'অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ'-এর জন্য বিবেচিত হন।

কারা এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন

এই পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীকে এঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি, আর্কিটেকচার, ফার্মাসির গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। এ ছাড়া যাঁরা ম্যাথমেটিক্স, স্ট্যাটিসটিক্স, 'কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন' যে-কোনও বিষয় নিয়ে এম এসসি পাশ করেছেন তাঁরাও পরীক্ষায় বসতে পারবেন। তবে শর্ত হল বি এসসি পর্যায়ে ম্যাথমেটিক্স কম্বিনেশন হিসেবে থাকা চাই। এ ছাড়া যাঁরা 'ইন্টিগ্রেটেড মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রাম ইন এঞ্জিনিয়ারিং' পাশ করেছেন তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন।

ফর্ম কোথায় পাবেন

গ্র্যাজুয়েট অ্যাপটিচুড টেস্ট ইন এঞ্জিনিয়ারিং (সংক্ষেপে গেট-'৯৭) পরীক্ষায় বসতে হলে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদন করতে হবে। ফর্ম ও প্রসপেক্টাস সংগ্রহ করা যাবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার নির্দিষ্ট শাখা থেকে। এক-একটি আই আই টি-কে কেন্দ্র করে এক-একটি 'জোন' তৈরি করা হয়েছে। আই আই টি খড়্গপুর জোনের আওতায় পড়ছে ত্রিপুরা, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, অসম ইত্যাদি অঞ্চল। সেজন্য এসব অঞ্চলের প্রার্থীরা স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যেসব শাখা থেকে নগদ ৫০০ টাকা দিয়ে ফর্ম ও প্রসপেক্টাস জোগাড় করতে পারবেন সেগুলি হল : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া—আগরতলা, ভাগলপুর, ভুবনেশ্বর, বিলাসপুর, বর্ধমান, বারলা, কলকাতা (মেন ব্রাঞ্চ),, দুর্গাপুর, গুয়াহাটি, হাওড়া, ইম্ফল, ইটানগর, যাদবপুর, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, কাঁকিনাড়া, কল্যাণী, আই আই টি খড়্গপুর, পটনা, রায়পুর, রাঁচি, রউরকেলা, শিলচর, সিঙ্গি, তালচের, বিশাখাপত্তনম ইত্যাদি শাখা। স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট আই আই টি-র গেট অফিস থেকে ৫০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট পাঠিয়ে ডাকযোগে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। যে কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী নাম লেখাতে চান সেই কেন্দ্রের অনুকূলে ড্রাফ্ট কাটতে হবে। সঙ্গে প্রার্থীর নাম-ঠিকানা লেখা দুটি 'স্লিপ'ও পাঠাতে হবে। প্রার্থী যদি তফসিলিভুক্ত জাতি বা উপজাতির প্রার্থী হন, তবে তাঁকে ২৫০ টাকার ড্রাফ্ট এবং জাতিগত সার্টিফিকেটের কপি পাঠাতে হবে। এই সুবিধে তফসিলি প্রার্থীরা ব্যাঙ্ক কাউন্টার থেকেও পাবেন। ড্রাফ্ট, নাম-ঠিকানা-লেখা স্লিপসহ অনুরোধপত্র পাঠাতে হবে প্রার্থীর পছন্দমতো যে-কোনও একটি কেন্দ্রে। (১) চেয়ারম্যান, গেট (GATE), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, বাঙ্গালোর-৫৬০০১২ ; (২) আই আই টি পাওয়াই, মুম্বই-৪০০০৭৬ ; (৩) আই আই টি হাউজখাস, নিউ দিল্লি-১১০০১৬ ; (৪) আই আই টি কানপুর-২০৮০১৬ ; (৫) আই আই টি খড়্গপুর- ৭২১৩০২ ; (৬) আই আই টি মাদ্রাজ-৬০০০৩৬। এ ছাড়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার উল্লিখিত যে-কোনও শাখার নোটিস বোর্ডেও এ-ব্যাপারে বিস্তারিত জানা যাবে।

দরকারি কথা

ব্যাঙ্ক কাউন্টার থেকে ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে ১৩ নভেম্বর ১৯৯৬ তারিখের মধ্যে। পূরণ-করা ফর্ম নেওয়া হবে ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৬ পর্যন্ত। পরীক্ষা নেওয়া হবে ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ তারিখে।

অমর দাশ

ফোটো : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

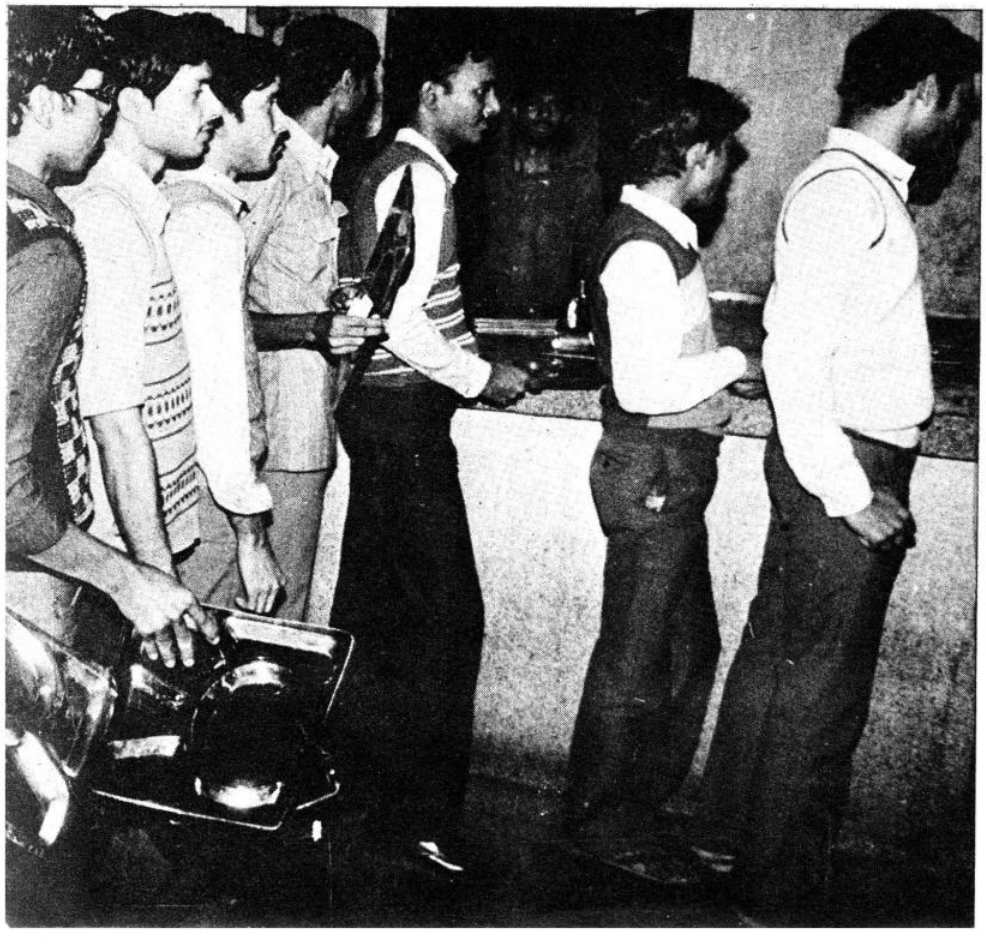

গোয়েন্দা গল্প

পটলবাবুর বিপদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পটলবাবু খুন হয়েছেন, অথচ তাঁর লাশ পাওয়া যাচ্ছে না, এইটেই সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। খুন হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই। কারণ তাঁকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল ভিমরুল। আর ভিমরুল যদি কাউকে খুন করার হুমকি দেয় তবে সেই লোক নিজেকে নিহত বলে ধরেই নিতে পারে। কারণ, ভিমরুল হল এক সাঙ্ঘাতিক আততায়ী। পুলিশ-টুলিশ তার টিকিরও নাগাল পায় না। অথচ সে বহাল তবিয়তেই তার পছন্দমতো লোককে খুন করে বেড়ায়। তাও আবার আগে থেকে তাকে সতর্ক করে দিয়ে।

পটলবাবু অবশ্য লোক সুবিধের নন। সোনা-রুপোর ব্যবসায় তাঁর লাখো-লাখো টাকা আয়। সুদের কারবারও আছে। তা ছাড়া তাঁর আবার একটি পোষা গুণ্ডাবাহিনীও আছে। পটলবাবুর হয়ে এই গুণ্ডাগুলোই আদায়-উশুল করে। রথতলা এবং আশপাশের অঞ্চল পটলবাবুর ভয়ে তটস্থ। মাসকয়েক আগে শ্রীমন্ত নামে একটা গরিব লোক বউয়ের গয়না বাঁধা রেখে পটলবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল। শোধ দিতে না পারায় কয়েক মাসেই পটলবাবুর নিজস্ব সুদের হারে ধার বেড়ে সুদে-আসলে দাঁড়াল পাঁচ হাজার। শ্রীমন্তর তো মাথায় হাত। যাই হোক, হঠাৎ শ্রীমন্ত একটা লটারিতে পাঁচ লাখ টাকা প্রাইজ পেয়ে গেল। আনন্দে সে তখন আত্মহারা। ঠিক সেই সময়ে পটলবাবুর গুণ্ডারা গিয়ে হাজির। তারা বলল, সুদে-আসলে পটলবাবুর পাওনা ওই পাঁচ লাখই দাঁড়িয়েছে। শ্রীমন্তকে মারধর করে তারা লটারির টিকিটটা কেড়ে নিয়ে এল। পটলবাবু দিব্যি হাসতে-হাসতে প্রাইজের টাকাটা বাগিয়ে নিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ভিমরুলের চিঠি এল। সেই মার্কামারা নীল রঙের খামের ওপর একটা ভিমরুলের ছবি। ভেতরে নীল চিরকুটে পরিষ্কার হাতের লেখায় কয়েকটি কথা, "তোমার পাপের সীমা ছাড়িয়েছে। মরার জন্য প্রস্তুত হও। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীমন্তর পাঁচ লাখ টাকা ও তৎসহ ক্ষমাভিক্ষার মূল্যস্বরূপ আরও দশ হাজার টাকা তাকে প্রত্যর্পণ করতে পারলে ভাল, নইলে আর সাতদিনের মধ্যেই তোমাকে খুন করা হবে। —তোমার যম ভিমরুল।"

ভিমরুলের চিঠি ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। সুতরাং উদ্বিগ্ন পটলবাবু পুলিশের কাছে গেলেন।

দারোগাবাবু চিঠিটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে হাই তুলে বললেন, "আমাদের কিছু করার নেই মশাই। উড়ো চিঠির পেছনে ছোটা আমাদের কর্ম নয়।"

উত্তেজিত পটলবাবু বললেন, "উড়ো কী মশাই, এ যে ভিমরুলের চিঠি!"

"সে তো জানি মশাই, কিন্তু ঘটনাটা না ঘটলে তো আর কিছু করতে পারি না। আগে ঘটুক তারপর দেখা যাবে।"

আসলে পুলিশও পটলবাবুকে ভাল চোখে দেখে না।

পটলবাবু তখন এসে ধরলেন গোয়েন্দা বরদাচরণকে। "বাবা বরদা, আমি যে মারা পড়তে চলেছি।"

বরদা একটু হেসে বলল, "শুভস্য শীঘ্রম।"

"তার মানে! তুমি কি আমার মৃত্যু চাইছ?"

"ভোট নিলে দেখবেন জনমত তাই চাইছে। তবে আমি গোয়েন্দা। আর্তকে রক্ষা করাই আমার কাজ। দেখি চিঠিটা।"

বরদা চিঠিটা ভাল করে দেখল। নিজের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে আঙুলের ছাপ খুঁজল। পেল না। পোষা কুকুর টমিকে চিঠি শুঁকিয়ে খানিক এদিক-ওদিক খুঁজে এল। তারপর চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, "সাতদিন একটু সাবধানে থাকবেন।"

"সাবধানে থাকব! তুমি তো বলেই খালাস। সাবধানে থাকলেই কি ভিমরুল রেহাই দেবে? সে যে ভিমরুলের মতোই সাত হাত জলের তলায় গিয়ে হুল দেয়।"

"কেন, আপনার তো একটা গুণ্ডাবাহিনী আছে বলে শুনেছি। তারাই আপনাকে পাহারা দেবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পটলবাবু বললেন, "তা তারা দেবে। কিন্তু তারা বেশি বুদ্ধি ধরে না। গায়ের জোর দিয়ে কি আর সব কাজ হয়? শুনেছি ভিমরুল তুখোড় চালাক, কোথা দিয়ে যে তার মৃত্যুবাণ আসবে কে জানে। বাপু বরদাচরণ, তোমাকে মোটা টাকা দেব, আমাকে পাহারা দেওয়ার ভারটা তুমিই নাও।"

বরদাচরণ পটলবাবুকে পছন্দ করে না। তা বলে পটলবাবু খুন হন সেটাও সে চায় না। বলল, "পটলবাবু, আমার হাতে এখন অনেক কাজ। চারদিকে অপরাধের সংখ্যা যেমন বাড়ছে গোয়েন্দাদের ব্যস্ততাও তেমনই বাড়ছে। তিনটে দিন কোনওরকমে যদি কাটিয়ে দিতে পারেন তা হলে চতুর্থ দিন থেকে আমি আপনার নিরাপত্তার ভার নেব। আগামী তিনদিন আমি বড়ই ব্যস্ত। তবে আমি বলি কি, ওই বেচারার টাকাগুলো দিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।"

পটলবাবু খ্যাঁক করে উঠলেন, "হক্কের টাকা দিয়ে দিলেই হবে? ধর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে না?"

"ওঃ তাই তো! ধর্ম বলেও তো একটা কথা আছে।"

পটলবাবু বরদাচরণের ফি বাবদ পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু বুকের ধুকধুকুনিটা যাচ্ছে না। রাতে ঘুম আসে না, খিদে পায় না, কাজে মন দিতে পারেন না। তাঁর তিনজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর মধ্যে ন্যাপা হল প্রাক্তন ব্যাটরাশ্রী। বিশাল চেহারা, যার গায়ে পেশি কিলবিল করছে। দ্বিতীয় দেহরক্ষী হল কুংফু ক্যারাটের ওস্তাদ গুলে। তিন নম্বর দেহরক্ষী স্বর্ণপদকজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা হারু। তারা পটলবাবুর কাছ থেকে মোটা বেতন পায়। ষণ্ডা-গুণ্ডার কাজে তারা খুবই দড়। তবে বুদ্ধির ব্যাপারে তাদের খামতি আছে। কিন্তু ভিমরুল অতি বুদ্ধিমান। সে মোটা দাগের কাজ করে না। পটলবাবু খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে রইলেন। স্থির করলেন, তিনদিন আর ঘরের বাইরে যাবেন না।

দ্বিতীয় দিন সকালে মহীতোষ নামে এক মহাজন এল। মোটা সুদে লাখ টাকা ধার নিয়েছিল। সুদে-আসলে দু'লাখ টাকা শোধ দিতে এসেছে। সঙ্গে দু'জন পাইক।

টাকা-পয়সার লেনদেন হয় নীচের বৈঠকখানার পাশের ঘরে। এ-ঘরে

সিন্দুক-টিন্দুক আছে। পটলবাবু তাঁর দেহরক্ষীদের কক্ষনো এ-ঘরে ঢুকতে দেন না। লেনদেনের সময় তিনি সবসময়েই একা থাকেন, মক্কেলরাও একাই সে-ঘরে ঢুকতে পায়।

পটলবাবু ঘরে ঢুকে মহীতোষকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু মহীতোষ যখন ঘরে ঢুকল তখন পটলবাবুর একগাল মাছি। লোকটা মোটেই মহীতোষ নয়।

পটলবাবু শুধু আঁ-আঁ করে দু'বার চিৎকার করার অবকাশ পেয়েছিলেন। তারপর যে কী হল, তা কেউ জানে না। ঘণ্টাখানেক পরেও ঘর থেকে কেউ বেরোচ্ছে না দেখে বাড়ির লোকজন জড়ো হল। বিস্তর ডাকাডাকি আর চেঁচামেচির পর দরজা ভেঙে দেখা গেল, মহীতোষ নামে আগন্তুক এবং পটলবাবু, কারও চিহ্ন নেই। গণ্ডগোলের সুযোগে মহীতোষের পাইক দু'জনও পালিয়েছে।

ঘরের মোটা গরাদের একটা জানলা ভাঙা। কিন্তু জানলা দিয়ে পটলবাবুকে নিয়ে যদি আততায়ী বেরিয়েও গিয়ে থাকে তা হলেই বা সে কী করে বাড়ির উঁচু পাঁচিল ডিঙোল কিংবা কী করেই বা দরোয়ানের চোখ এড়িয়ে ফটক দিয়ে বেরোল ?

পুলিশ এসে সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে বলল, "এটা গুম কেস। খুনের কেস বলা যাবে না।"

যাই হোক, সবাই ধরে নিল শুধু গুম নয়, গুম করে পটলবাবুকে খুনও করা হয়েছে। কারণ ভিমরুলের যেই কথা সেই কাজ। লাশটা অবশ্যই দু-চারদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

কিন্তু একদিন-দু'দিন করে সাতদিন কাটতে চলল। পটলবাবুর লাশের কোনও হদিস হল না।

পটলবাবুর চার ছেলে গিয়ে বরদাচরণকে ধরে পড়ল, "বাবা আপনার ওপর খুব ভরসা করেছিলেন, কিন্তু আপনি তো বাবাকে রক্ষা করতে পারলেন না। এখন কী হবে ?"

বরদাচরণ নানারকম কেস নিয়ে সর্বদাই ভাবিত। গম্ভীর মুখে শুধু বলল, "হুঁ।"

"বাবার লাশটাও যে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"হুঁ।"

"ভিমরুলকে ধরার ব্যাপারেও তো কিছু হচ্ছে না।"

"হুঁ।"

বিরক্ত হয়ে পটলবাবুর ছেলেরা ফিরে এল।

গভীর রাত। বরদাচরণ তার দোতলার ঘরে একটা কেস হিস্ট্রি লিখছে। গভীর চিন্তামগ্ন।

হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা ঢিল এসে পড়ল। ঢিলে বাঁধা একটা কাগজ।

বরদাচরণ ঢিলটা কুড়িয়ে নিয়ে কাগজটা খুলে দেখল, তাতে লেখা : "কাহারপাড়ায় মজা পুকুরের ধারে পটলের লাশ পড়ে আছে। —ভিমরুল।"

বরদাচরণ কাগজটা মুড়ে পকেটে রাখল। তাড়া নেই। লাশ তো আর উঠে পালাবে না। সকালে গিয়ে দেখলেই হবে।

সকালে দেরিতে ঘুম থেকে উঠে একটু গড়িমসি করে যখন বরদা মজাপুকুরের কাছে পৌঁছল তখন সেখানে লাশটাশ দেখা গেল না। মজাপুকুর খুব নির্জন জায়গা। চারদিকে ঘন কসাড় বন। দিনেদুপুরেও এখানে কেউ বড় একটা আসে না। একসময়ে ডাকাতের আড্ডা ছিল। ডাকাতে-কালীবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। চারদিকটা ঘুরে দেখে বরদা পুকুরের ধারে এসে দেখল একটা রোগামতো ছোটখাটো চেহারার লোক পুকুরের একধারে বসে ছিপ দিয়ে নিবিষ্টমনে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। একটু আগেও লোকটা এখানে ছিল না।

বরদাচরণ লোকটার দিকে অবহেলার চোখে একটু চেয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে খুব আলগা গলায় বলল, "ক'টা মাছ পেলেন ?"

লোকটা বরদাচরণের দিকে ফিরেও তাকাল না। কিন্তু একটু চাপা গলায় বলল, "একটা মাছ ধরব বলেই বসে আছি। বড় মাছ। খুব লেজে খেলাচ্ছে।"

বরদাচরণ একটু হেসে বলল, "বড় মাছ ধরতে হলে উপযুক্ত টোপ চাই তো। তা টোপটা কী ?"

"সেইটেই বড় মাছটার কাছে জানতে চাইছি।"

বরদাচরণ একটু ভেবে বলল, "বড় মাছটা টোপ গিলবে না। তবে আপস করতে রাজি আছে।"

লোকটা ছিপ গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিতান্তই হেঁটো ধুতি আর কামিজ গায়ে একটা গেঁয়ো লোক। বয়স ত্রিশের আশপাশে। মুখখানা একদম ভাবলেশহীন। বরদাচরণের দিকে না তাকিয়ে মাথাটা নিচু রেখে বলল, "আপসটা কীরকম ?"

"পটলবাবুকে মহীতোষ সেজে আমিই সরিয়েছি বটে, তা বলে আমি তার সমর্থক নই। লোকটা আমার মক্কেল, তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।"

রোগাভোগা লোকটা নিচু গলাতেই বলল, "ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছেন ! আপনার সাহস আছে বটে।"

"আমি ভিমরুলের শত্রু নই।"

"পটলকে না মারলে এলাকায় শান্তি থাকবে না। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।"

মাথা নেড়ে বরদা বলল, "তা হয় না। তাকে মারলে আমার শর্ত ভঙ্গ হবে।"

"তা হলে তো ভিমরুলের সঙ্গে শত্রুতাই আপনি চান। আমার যে কথা সেই কাজ।"

"না, ভিমরুলের মুখরক্ষার ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছি।"

"কী ব্যবস্থা ?"

"পটলকে বলেছি, প্রাণ বাঁচাতে গেলে তাকে দেশত্যাগ করতে হবে এবং অন্য জায়গায় অন্য নামে বেঁচে থাকতে হবে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। সে যে বেঁচে আছে এ-কথা কেউ জানবে না।"

"সে যদি আর কখনও এ-তল্লাটে আসে—"

"না, সে-ভয় আর নেই। আপনার ভয়ে সে আধমরা।"

"আর শ্রীমন্তর টাকাটা ?"

"পটল আমার সঙ্গে পালানোর সময় নগদ পাঁচ লাখ দশ হাজার আদায় করে শ্রীমন্তর জন্য নিয়ে নিয়েছিল। টাকাটা কাল রাতেই শ্রীমন্ত পেয়ে গেছে।"

ভিমরুল এবার একটু হাসল। বলল, "চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছেন, তবু আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি একজন দক্ষ গোয়েন্দা।"

"ধন্যবাদ।"

ছোটখাটো লোকটা ছিপটা হাতে নিয়ে কসাড় বনের মধ্যে ঢুকে কোথায় চলে গেল কে জানে।

বরদাচরণ বাড়িতে ফিরে এসে তার দোতলার ঘরের পাশে পুরনো লেপ-তোশকের মস্ত কাঠের বাক্স খুলে পটলবাবুকে বের করল। পটলবাবু তখন চিঁচি করছেন।

"তা পটলবাবু, এবার কী করবেন ?"

"প্রাণরক্ষা করো বরদা, তারপর কী করব ভাবা যাবে।"

"প্রাণের ভয় আর নেই। ভিমরুল শতধীনে আপনাকে রেহাই দেবে। কিন্তু আপনি যাবেন কোথায় ?"

"হিমালয়ে।"

"সাধু হবেন নাকি ?"

"না, না, ব্যবসা আমার রক্তে। হিমালয়ে মেলা সাধু। আমি ঠিক করেছি সাধুদের চাল, ডাল, আটা, লোটা-কম্বল, কৌপীন ইত্যাদি সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবসা করব।"

"সাধুদের সাপ্লাই দেবেন ? টাকা দেবে কে ?"

"ভক্তরা দেবে বাবা। ওসব আমার ছক করা আছে।"

পটলের ব্যবসাবুদ্ধি দেখে বরদা অবাক হয়ে গেল।

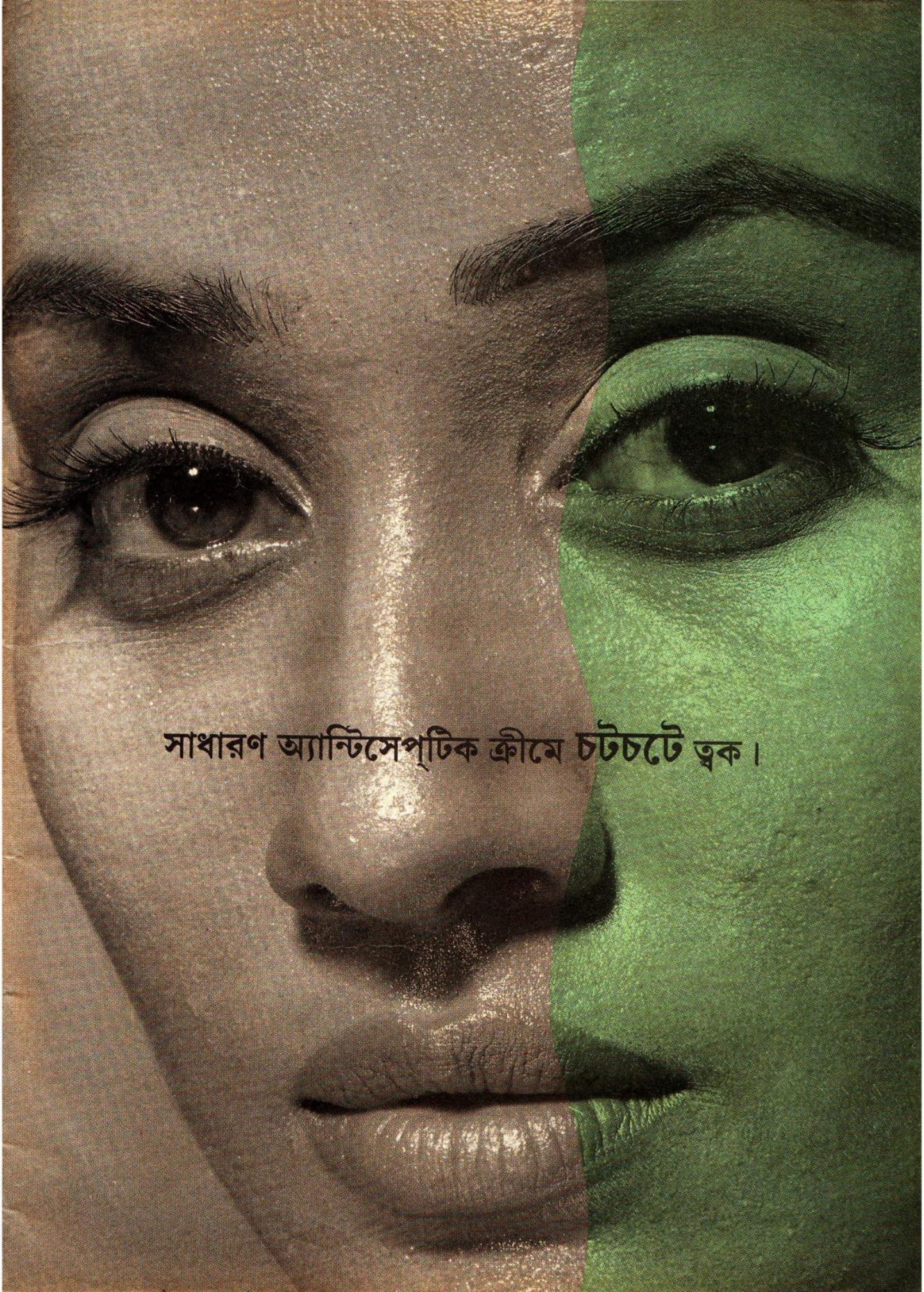
সাধারণ অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রীমে চটচটে ত্বক।

Mudra:PAR:9592 Ben.

পেশ হল বোরোসফ্‌ট।
ফাটা ত্বকের
রুক্ষতা দূর করে,
চটচটানি ছাড়াই।

শীতকালে ত্বক আর ঠোঁট ফাটা বা রুক্ষ হয়ে যাওয়া নিত্যকার ব্যাপার।
এ সময়ে সাধারণ অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম ব্যবহারের ফলে
আপনার ত্বক সারাক্ষণ চটচটে থাকে। কিন্তু নতুন **বোরোসফ্‌ট নন-স্টিকি**
অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম একটুও চটচটে নয়। শুধু তা-ই নয়,
এটি খুব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে এবং ফাটা ত্বকের রুক্ষতাও দূর করে।
আর, এতে আছে অ্যালোয়েভেরা, যা ত্বককে বানায় সফ্‌ট,
ঠিক আগের মতন। **বোরোসফ্‌ট**।

বোরোসফ্‌ট নন-স্টিকি অ্যান্টিসেপ্‌টিক ক্রীম।

A
PARAS
PRODUCT

"আমার এমন ছেলে
চাই — যে সকাল থেকে
ভাঁজে
'মুগুর',
রাতকে বানায় দুপুর —
আর আমার
সামনে লেজটি
নেড়ে করে ভুকুর ভুকুর!"
ELLE 18
তোমার জীবন,
দৃষ্টিভঙ্গি তোমার
ELLE 18
কালার কস্‌মেটিক্স
নতুন যুগের প্রতীক
Ambience/LE 49/3/Ben

সূর্যই হয়ে উঠতে পারে বিকল্প শক্তির মূল উৎস

খনিজ জ্বালানি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহারের ফলে তৈরি হচ্ছে নানা ক্ষতিকর গ্যাস। পরিবেশের ওপর পড়ছে এদের বিষাক্ত প্রভাব। এজন্যই বিকল্প উপায়ের কথা ভাবা হচ্ছে। লিখেছেন তুষার যশ

অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের মতো শক্তিও আধুনিক মানুষের অন্যতম চাহিদা। আগুন আবিষ্কারের পর মানুষ গোড়ার দিকে কাঠ এবং কয়লা পুড়িয়ে আগুনের শক্তিকে দৈনন্দিন জীবনে রান্না কিংবা শরীর উষ্ণ করার কাজে ব্যবহার করে এসেছে। শক্তির অন্যান্য উৎস হিসেবে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার শুরু হয়েছে এই শতকের গোড়া থেকে।

বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন এসেছে। কয়লা, তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস— এইসব খনিজ জ্বালানিগুলি কাজে লাগানো হচ্ছে দেশের বড়-বড় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে। শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর জন্য একটার পর একটা তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র বসানো হয়েছে। ফলে প্রচলিত শক্তির এইসব উৎসের ভাণ্ডার ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। হিসেব বলছে, আমরা যে-হারে খনিজ জ্বালানি খরচ করছি তাও যদি বজায় থাকে, তা হলে পৃথিবীতে যে-পরিমাণ খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চিত আছে, তা ফুরিয়ে যেতে সময় লাগবে ৩০ থেকে ৪০ বছর। আর কয়লা ফুরিয়ে যাবে আগামী ১০০ বছরের মধ্যে।

ফলে দরকার হয়ে পড়েছে বিকল্পশক্তির ব্যবহার। পৃথিবীতে সূর্য মোট যে-বিকিরণ পাঠায় তা এক শতাংশ ব্যবহার করলেও আমাদের শক্তির সমস্ত চাহিদা মেটানো যায়। আবার, অন্যভাবে বললে, সৌরশক্তি অফুরান। আর-একটা বড় কথা হল, এ-শক্তির ব্যবহারে পরিবেশ দূষিত হয় না। কিন্তু সৌরশক্তিকে কীভাবে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়?

১৯০৫ সালে পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক দেখান যে, আলোক শুধুমাত্র তরঙ্গ নয়, বরং অসংখ্য শক্তিপুঞ্জ দিয়ে গঠিত। এই শক্তিপুঞ্জকে বলা হয় 'ফোটন'। প্রতিটি ফোটনের শক্তির পরিমাপ আলোকের তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। সূর্যের আলোয় এই ফোটনগুলির উপস্থিতিই সৌরশক্তির আধার।

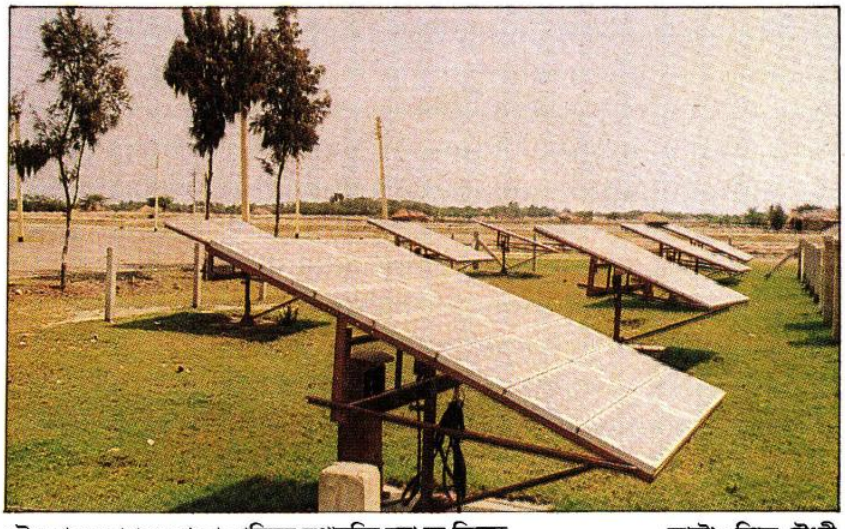

সৌরকোষের সাহায্যে আলোকশক্তিকে রূপান্তরিত করা হয় বিদ্যুতে ফোটো : বিজন চৌধুরী

মেরু অঞ্চলের আকাশে আলোর খেলা

প্রাথমিক সৌরশক্তিকে দু'ভাবে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। প্রথমটিকে বলা হয় সৌর আলোকভোল্টীয় রূপান্তর এবং দ্বিতীয়টি সৌর-তাপীয় রূপান্তর।

প্রথমে বলি 'সোলার ফোটোভোল্টেইক'-এর রূপান্তরের কথা।

সূর্যের বিকিরণকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে ফোটোভোল্টীয় রূপান্তর

সৌরশক্তির সাহায্যে আলো জ্বালানো এখন আর নতুন কোনও ঘটনা নয় ফোটো : বিপ্লব মৈত্র

বলে। এটা করা হয় মূলত কোনও 'সেমিকন্ডাক্টর' বা 'অর্ধপরিবাহী' পদার্থের ওপর সূর্যের আলো ফেলে। বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিবহণের ক্ষমতা বা অক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই কোনও পদার্থকে 'পরিবাহী' বা 'অপরিবাহী' বলা হয়। কিন্তু কিছু-কিছু পদার্থ, কোনও বিশেষ অবস্থায়, বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারার জন্য তাদের অর্ধপরিবাহী বলে, যেমন, সিলিকন মৌলটি সূর্যের আলোয় বিদ্যুৎপ্রবাহে সাহায্য করে বলে সিলিকন একটি অর্ধপরিবাহী। এই অর্ধপরিবাহী পদার্থ দিয়েই তৈরি হয় 'সোলার সেল' বা 'সৌরকোষ'।

এখন যে সৌরকোষগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেগুলি অতিবিশুদ্ধ একক কেলাস সিলিকনের ওপর ফসফরাসের আস্তরণ ফেলে তৈরি করা। এই কোষগুলি ১০ সেন্টিমিটার ব্যাসের অতি পাতলা গোলাকার চাকতি। প্রকৃতিতে অফুরন্ত পরিমাণ বালি পাওয়া যায়। বালির মূল উপাদান সিলিকন। সেদিক থেকে সিলিকন সরবরাহের ঘাটতির কোনও আশঙ্কা নেই। সাধারণত ৩৬টি সৌরকোষ একটি আয়তাকার অ্যালুমিনিয়াম বাক্সের মধ্যে শ্রেণী সমবায়ে বসানো থাকে। বাক্সটির ওপরে একটি স্বচ্ছ কাচের ঢাকনা থাকে। সৌরকোষ সমেত একটি বাক্সকে একটি 'মডিউল' বলা হয়। এই আলোকভোল্টীয় মডিউল কোনও খোলা জায়গায় রাখা হয়, যাতে প্রচুর রোদ পাওয়া যায়। মডিউলের সঙ্গে একটি লেড-অ্যাসিড সঞ্চয়কোষযুক্ত থাকে। দিনের বেলা সৌরকোষগুলি সৌরশক্তি থেকে যে-বিদ্যুৎ তৈরি করে, সেটা সঞ্চয়কোষকে চার্জ করে। রাত্রে, যখন সূর্য থাকে না, তখন এই জমা হওয়া শক্তিকে একটি 'ইনভার্টার'-এর মাধ্যমে আলো জ্বালাতে, পাখা চালাতে বা অন্যান্য কাজে লাগানো হয়।

গোয়েন্দা গল্প

অর্জুন হতভম্ব

সমরেশ মজুমদার

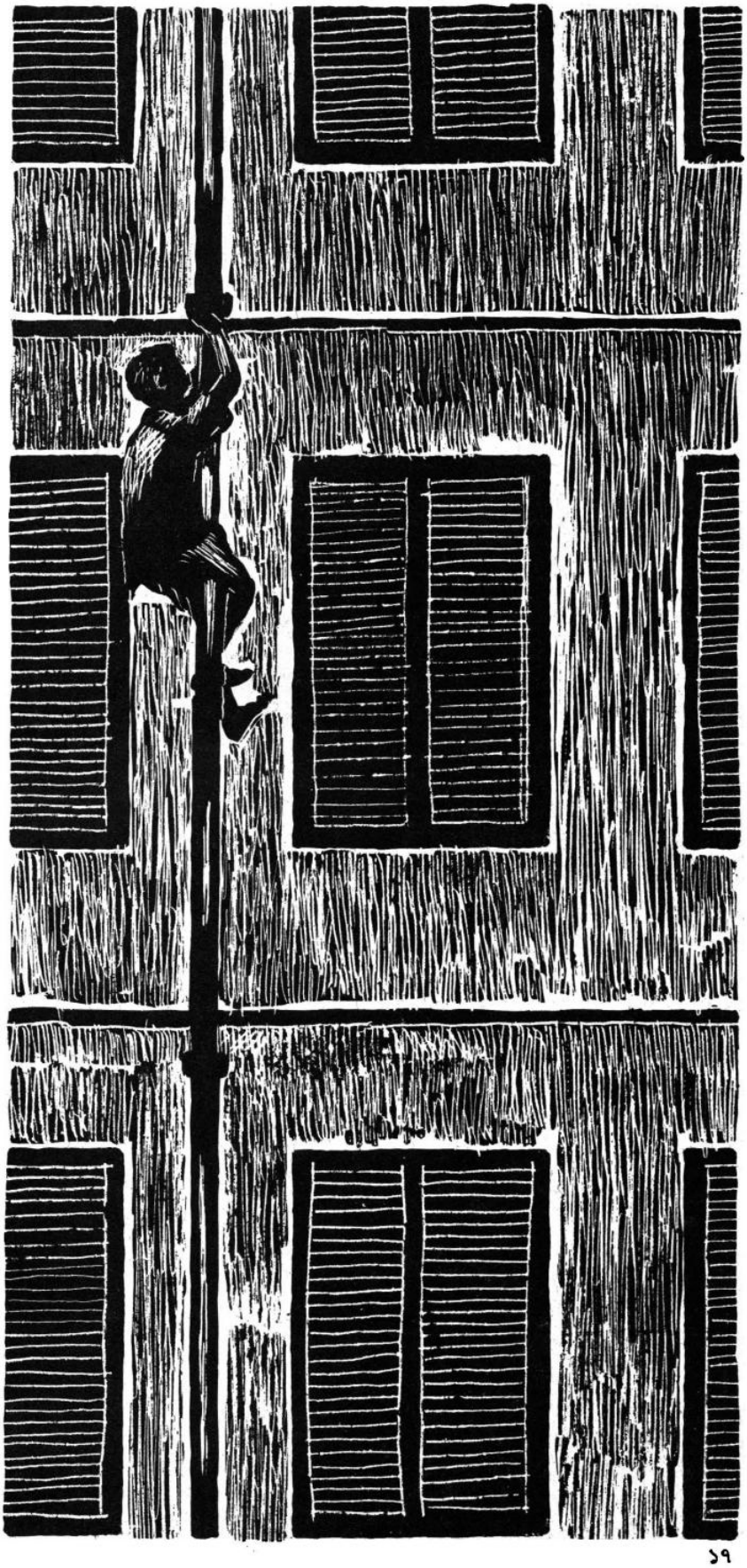

বারান্দায় চোরের মতো দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা। দরজা খুলে একপলক দেখে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বলুন, কী দরকার ?"

লোকটি পিটপিট করে তাকাল। তারপর হাতজোড় করে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, "আপনি আমাকে বাঁচান বাবু। আমি মরে গিয়েছি।"

রোগা এবং বেঁটে লোকটির পরনে শস্তার শার্ট-প্যান্ট। দেখলেই বোঝা যায়, অবস্থা ভাল নয়। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমি যে আপনাকে বাঁচাতে পারি, এ-কথা কে বলল ?"

"আপনার কথা আমি আগেই শুনেছিলাম। আমার এক শালা রূপমায়া সিনেমাতে টিকিট ব্ল্যাক করে, ও আপনার খুব প্রশংসা করে। বাবু, আমি বড় বিপদে পড়েছি।" লোকটি তখনও হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে।

"আপনার নাম কী ?"

"যজ্ঞেশ্বর মাইতি।"

"কী করেন ?"

লোকটি মুখ নামাল, "বলতে সঙ্কোচ হয়, তবু বলি, আমি চুরি করি বাবু।"

"চুরি করেন ? চোর !" অর্জুন অবাক।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কাজকর্ম পাইনি, পয়সাও নেই যে দোকান-টোকান দেব, তাই চুরি করে পেট ভরাই। বাড়িতে বউ আর দুই ছেলেমেয়ে ! মুখ দেখে তো কেউ খেতে দেবে না !"

"আপনার বিপদটা কী ? পুলিশ ?"

"না বাবু, চুরির জন্যে পুলিশ আমাকে ধরলে আপনার কাছে আসতাম না।" রাস্তার দিকে চট করে তাকিয়ে নিল যজ্ঞেশ্বর, "এখানে দাঁড়িয়ে বলা কি ঠিক হবে ? কেউ যদি শুনে ফেলে !"

অর্জুনদের বাড়ি গলির একটু ভেতরে। গলিটা চওড়া, রিকশা যাচ্ছে, মানুষজন হাঁটছে।

একটা চোরকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গিয়ে বসাতে প্রথমে ইচ্ছে হচ্ছিল না, পরে মত বদলে সে ডাকল, "ভেতরে আসুন।"

যজ্ঞেশ্বর সন্তর্পণে ভেতরে ঢুকতেই চেয়ার দেখিয়ে দিল অর্জুন, "বসুন।"

"না, না আমি ঠিক আছি, আপনি বসুন বাবু।"

অর্জুন আর অনুরোধ না করে চেয়ার টেনে নিল, "আপনার নাম নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় আছে?"

"তা তো থাকবেই বাবু। এর আগে চারবার জেল খেটেছি। তবে ওই তিন থেকে ন' মাস। বড় কাজ তো কখনও করিনি। এবার করতে গিয়েছিলাম।" যজ্ঞেশ্বর হাতজোড় করেই বলল, "ওই যে কথায় বলে না বামনের চাঁদে হাত দেওয়ার শখ, তাই হয়েছিল আমার। সেটা করতে গিয়ে ফেঁসে গেছি বাবু।"

"ফেঁসে গেছেন?" অর্জুন মাথা নাড়ল, "তা আমার কাছে কেন এসেছেন?"

"আপনি ছাড়া আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। পুলিশের বড়কর্তারা আপনাকে খুব খাতির করে, আপনি বললে ওরা শুনবে।" ককিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর।

"যারা অন্যায় কাজ করে আমি তাদের সাহায্য করি না।" অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল।

"বিশ্বাস করুন বাবু, আমার বাচ্চার দিব্যি, গত রাত্রে আমি কোনও অন্যায় করিনি।"

"তা হলে আপনি কিসের ভয় পাচ্ছেন?"

এবার যজ্ঞেশ্বর সব কথা খুলে বলল। গত রাত্রে সে চুরি করতে গিয়েছিল শিল্পসমিতি পাড়ায়। কয়েকদিন থেকে লক্ষ করছিল ওই বাড়িতে প্রচুর গাড়ি আসছে-যাচ্ছে। বাড়িটার সামনে পাঁচিলঘেরা বাগান আছে। বাগানের গেট লোহার। আগে কোনওদিন দরোয়ান ছিল না, গাড়িগুলোর আসা-যাওয়া শুরু হওয়ার পর একটা নেপালি দরোয়ান রাখা হয়েছে। বাড়ির মালিক দীর্ঘকাল জলপাইগুড়িতে ছিলেন না। যজ্ঞেশ্বর খবর পেয়েছে তিনি আমেরিকায় ব্যবসা করেন বলে নিজের শহরে এতকাল আসতে পারেননি। যজ্ঞেশ্বর বুঝতে পারছিল, তার জন্য অনেক সম্পদ ওই বাড়িতে অপেক্ষা করছে। একে আমেরিকার ব্যবসাদার, তার ওপর গেটে দরোয়ান বসানো, এ-সবই ইঙ্গিত করছে ওই বাড়িতে এখন দামি-দামি জিনিসপত্র এসেছে। এই শহরের যে-কোনও বাড়ির ভেতরের ছক জেনে নিতে যজ্ঞেশ্বরদের বেশি সময় লাগে না। ওই বাড়িটারও জোগাড় হয়ে গেল। দরোয়ান থাকলেও সে পরোয়া করেনি। রাতের অন্ধকারে পাঁচিল টপকে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছিল বাগানে। দরোয়ান টের পায়নি। তারপর জলের পাইপ বেয়ে সোজা তিনতলায়। সে দোতলায় নামেনি। কারণ সেখানে আলো জ্বলছিল। তিন তলাটা অন্ধকারে পড়ে ছিল। ব্যালকনিতে নেমে সে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ সব জরিপ করে নিল। ব্যালকনি থেকে ভেতরের ঘরে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ। এবং সেটা ভেতর থেকেই। অর্থাৎ ওই পথ যজ্ঞেশ্বর ব্যবহার করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত তাকে দোতলায় নেমে আসতে হল। পাইপ ধরে ঝুলে থেকে যখন নিঃসন্দেহ হল বারান্দার আশপাশে কেউ নেই, তখন সে দোতলায় নামল। ওইভাবে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলে বিপদে পড়তে হবেই, যজ্ঞেশ্বর দ্রুত একপাশে সরে এল। ভেতরে কারও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। এ-সময় অবশ্য গৃহস্থ জেগে থাকে না, কিন্তু কেউ তো এত আলো জ্বালিয়ে রেখে ঘুমোয় না। একটু অপেক্ষা করে সে উঁকি মারল। ঘরটি খালি। সেটা ডিঙিয়ে সে যে-ঘরে এল, সেখানে অনেক আসবাব। একটি খাটও আছে। কিন্তু কোনও মানুষ নেই। ঘরের আলো জ্বলছে। যজ্ঞেশ্বরের অস্বস্তি হল। অন্ধকার ছাড়া চুরি করতে সে কখনওই পারে না। ঠিক ওই সময় একটা আর্তনাদ তার কানে এল। প্রাণের দায়ে মানুষ এমন আওয়াজ করতে পারে।

কিন্তু চিৎকারটা সম্পূর্ণ হল না। কেউ যেন মুখ চেপে ধরেছিল। যজ্ঞেশ্বর পা টিপে-টিপে পাশের ঘরে দরজায় গিয়ে উঁকি মারল। একটা ষণ্ডামার্কা লোকের হাতের থাবা চেপে রয়েছে শুয়ে-থাকা বৃদ্ধের মুখে। বৃদ্ধটির হাত-পা খাটের সঙ্গে বাঁধা। একটু দূরে ইজিচেয়ারে বসে খিলখিল করে হাসছে গোল আলুর মতো দেখতে একটি লোক। লোকটি বলছে, "কেটে টুকরো-টুকরো করে তিস্তায় ভাসিয়ে দেব। আমার সঙ্গে চালাকি? অষ্টধাতুর ব্রজগোপালের মূর্তিটা কোথায়? এখনও সুযোগ দিচ্ছি, বলে ফেলো। হাত সরাও।"

"আমি জানি না। তুমি তো তোমার মায়ের শ্রাদ্ধের সময় আসোনি, এলে তখনই জানতে পারতে ওঁর মৃত্যুর দু'দিন আগে থেকেই মূর্তিটা নেই। সেই শোকে সেই সতীলক্ষ্মী হার্টফেল করলেন।" ষণ্ডামার্কা হাত সরাতে ককিয়ে ককিয়ে বললেন বৃদ্ধ। সঙ্গে-সঙ্গে গোল আলু বলল, "নাভিতে পিন ফোটা।"

ষণ্ডামার্কা হুকুম তামিল করতেই আবার চিৎকার, আবার মুখ চেপে ধরা। গোল আলু এবার রেগে গেছে। "ব্রজগোপালের অষ্টধাতু-টাতু সব বাজে, ফালতু। আই-ওয়াশ। ওর পেটের মধ্যে ছিল দামি হিরে। অনেকদিন

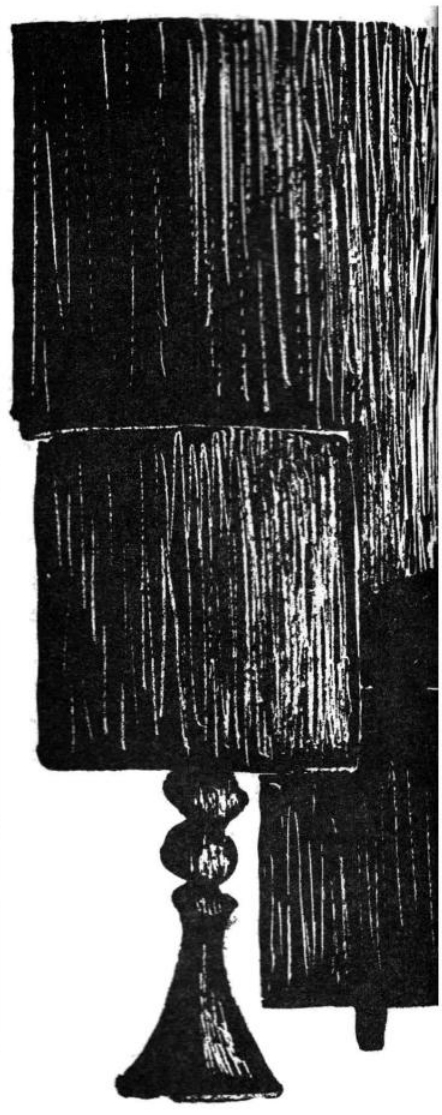

আগে মুঘলদের কাছ থেকে ডাকাতি করে ওটা পেয়েছিল আমার পূর্বপুরুষ। পেয়ে লুকিয়ে রেখেছিল জিনিসটা, ব্রজগোপালের পেটে। তুমি ছাড়া কেউ এ-বাড়িতে ছিল না। অতএব না বলা পর্যন্ত তোমাকে আমি ছাড়ছি না।"

এসব কাণ্ড দেখে যজ্ঞেশ্বর বুঝল, ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। হাতের কাছে যা পাবে তাই নিয়ে কেটে পড়লেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সে চটপট একটা আলমারি খুলল। জামা-কাপড়ে ঠাসা। হঠাৎ তার মনে হল বড্ড বেশি লোভী হয়ে পড়েছে। ওই ষণ্ডামার্কা লোকটার হাতে পড়লে তার বারোটা বেজে যাবে। সে দ্রুত ব্যালকনিতে বেরিয়ে এল। ওই সময় একটা চেয়ারে তার পা ঠুকে যাওয়ায় শব্দ হল। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে গোল আলু চিৎকার করে উঠল, "কে, কে ওখানে?" আর কোনওদিকে না তাকিয়ে পাইপ বেয়ে নীচে নেমে বাগান পেরিয়ে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়ে এসেছে

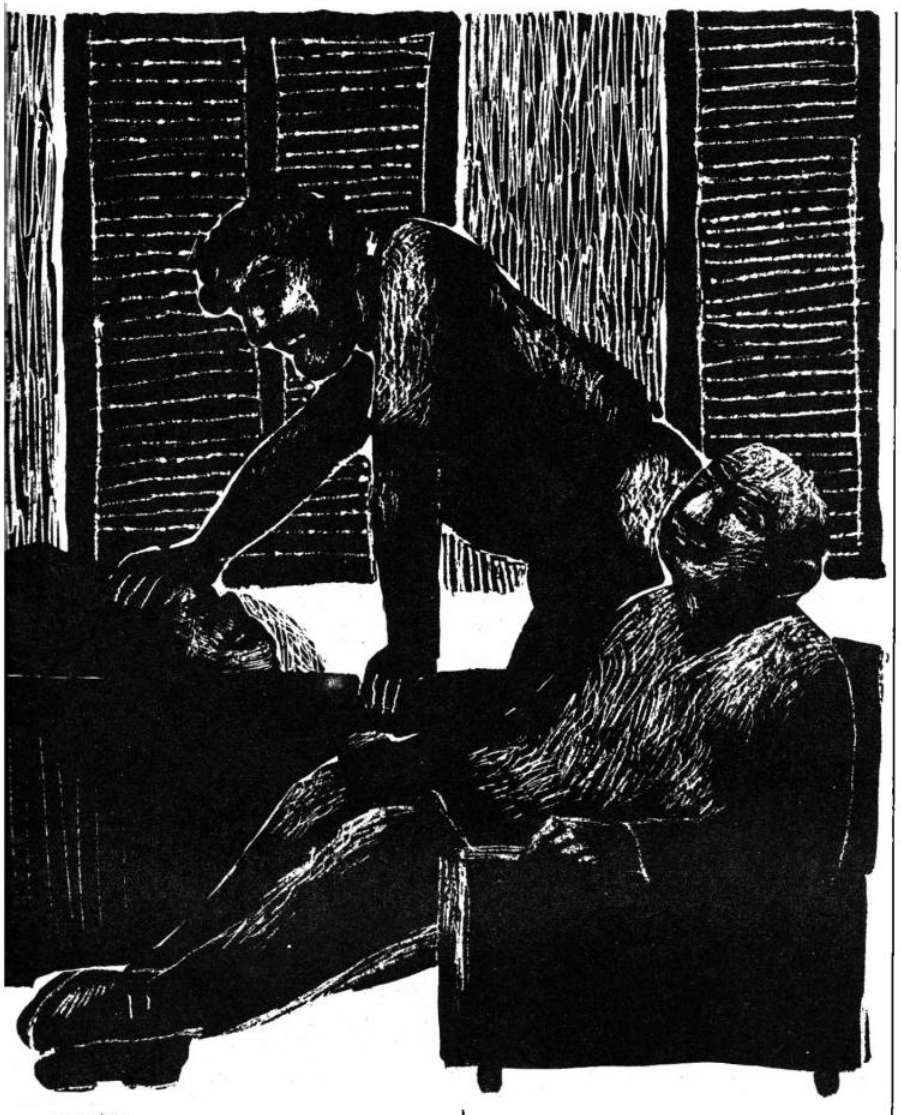

যজ্ঞেশ্বর।

অর্জুনের বেশ লাগছিল একজন চোরের আত্মকাহিনী শুনতে। এবার বলল, "আপনাকে তো কেউ দেখেনি, ধরতেও পারেনি। তা হলে ফেঁসে গেলেন কী করে?"

"ওই তো বিপদ। ওই হাঁক শুনে পালাবার সময় ভয়ের চোটে তাড়াহুড়োতে আমার তালা খোলার যন্ত্রটা ফেলে এসেছি।" ককিয়ে উঠল যজ্ঞেশ্বর।

"ওটা যে আপনার, তা কী করে লোকে জানবে?"

"পুলিশ জানে। এই শহরের সব চোরের হাতিয়ার পুলিশের জানা।"

অর্জুন স্থির করতে পারছিল না সে কী করবে। অন্যের বাড়িতে চুরি করার জন্য গভীর রাত্রে ঢুকে যজ্ঞেশ্বর নিশ্চয়ই অপরাধ করেছে। অপরাধীকে বাঁচানো তার কাজ নয়। কিন্তু একজন বৃদ্ধকে বেঁধে রেখে হিরের জন্য অত্যাচার করা নিশ্চয়ই ন্যায়কর্ম নয়। যজ্ঞেশ্বর যা বলল তা যদি সত্যি হয় তা হলে চুপচাপ বসে থাকার কারণ নেই।

অর্জুন বলল, "আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথায়?" ভয় পেয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর।

"থানায়। পুলিশকে এসব কথা খুলে বলবেন।"

"ওরে ব্বাবা! পুলিশ আমাকে ফাটকে ঢুকিয়ে দেবে।"

"আপনি নিশ্চয়ই অন্যায় করেছেন। পুলিশ তা করতেই পারে। কিন্তু আমি আপনাকে এ ছাড়া অন্য কোনওভাবে সাহায্য করতে পারছি না।"

শোনামাত্র যজ্ঞেশ্বর বারান্দা থেকে নেমে চোঁ-চোঁ দৌড় দিল। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল লোকটা।

অর্জুনের এবার অস্বস্তি শুরু হল। মাথার ভেতর কিছু ঢুকে গেলে সেটা না বের হলে স্বস্তি নেই তার। মোটরবাইক বের করে থানায় চলে এল সে।

বাইক থামাতেই বড়বাবুর সঙ্গে দেখা। বেজার মুখে তিনি জিপের দিকে এগোচ্ছিলেন। অর্জুনকে দেখে হাসার চেষ্টা করলেন, "কী ব্যাপার! সাতসকালে?"

"আপনার কাছেই এসেছি। চললেন কোথায়?"

"আর বলবেন না। আমাকে আজকাল ছোটখাটো অপরাধের তদন্তেও যেতে হচ্ছে। ভদ্রলোক আবদার করেছেন এস. আই. পাঠালে চলবে না, আমাকেই যেতে হবে। শুনছি উনি খুব ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক। তাই।"

"কার কথা বলছেন?"

"এস. পি. সেন। আমেরিকার বড় ব্যবসায়ী। শিল্পসমিতি পাড়ায় ওঁর আদি বাড়িতে এসেছেন। কাল রাত্রে নাকি সেই বাড়িতে চোর ঢুকেছিল।"

অর্জুন খুশি হল, "আমি যদি আপনার সঙ্গে যাই তা হলে অসুবিধে হবে?"

"অসুবিধে? না, না। কিন্তু এটা চুরিটুরির কেস। খুনটুন তো নয়।"

"তাতে কী?"

বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, "বেশ, চলুন।"

বড়বাবুর জিপটাকে অনুসরণ করে বাইকে চেপে অর্জুন শিল্পসমিতি পাড়ার যে বাড়িটায় পৌঁছল সেটি সদ্য সারানো এবং সাজানো হয়েছে। পুলিশ দেখে দরোয়ান গেট খুলে দিল। ভেতরে ঢুকে অর্জুন আন্দাজ করে নিল, কাল রাত্রে যজ্ঞেশ্বর কোন পথে ওপরে উঠেছিল।

এস. পি. সেন লোকটিকে গোল আলু বলেছে যজ্ঞেশ্বর। একবর্ণ মিথ্যে কথা বলেনি। বসার ঘরে সোফায় শরীর ডুবিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, "হোয়াট ইজ দিস? জলপাইগুড়ি শহরের ল অ্যান্ড অর্ডারের অবস্থা এইরকম? আমি সি. এমকে জানাব। এন. আর. আইদের উনি দেশে ফিরতে বলছেন কিন্তু কোন ভরসায় আসব?"

বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী-কী চুরি গিয়েছে আপনার?"

"চুরি করতে পারেনি। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার আগে একটা দিশি যন্ত্র ফেলে গিয়েছে। টমি!" চিৎকার করলেন এস. পি. সেন।

যজ্ঞেশ্বর যাকে ষণ্ডামার্কা লোক বলেছিল, তাকে দেখতে পেল ওরা। লোকটা দুটো লোহার সরু শিকগোছের জিনিস টেবিলে

রাখল। দুটো হলেও মাথাটা একটা তারে বাঁধা। যজ্ঞেশ্বর এই দিয়ে তালা খোলে।

বড়বাবু সেটা তুলে দেখলেন, "একদম পাতিচোর। একে নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ক্লু যখন রেখে গিয়েছে, তখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে।"

"তাই? লোকটা কে, জানতে পারলেই আমাকে জানিয়ে দেবেন অফিসার।"

এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ও কোন ঘরে ঢুকেছিল?"

"দোতলায়। পাইপ বেয়ে উঠেছিল।"

"একটু দেখা যেতে পারে?"

"শিওর। টমি, এদের নিয়ে যাও।"

দোতলায় উঠে এল ওরা। যজ্ঞেশ্বরের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বড়বাবু বললেন, "চুরি যখন করতে পারেনি তখন এখানে সময় নষ্ট করে লাভ কী?" এটা একদম ছিঁচকে ব্যাপার। পেছনে কোনও ব্রেন নেই।"

"তা ঠিক। আচ্ছা, ওপাশের ঘরে কে থাকে?" অর্জুন টমিকে প্রশ্ন করল।

"কেউ না।"

উত্তরটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুন দরজার পাল্লা টেনে উঁকি মারল। না। ঘরে কেউ নেই। অথচ যজ্ঞেশ্বরের বর্ণনা অনুযায়ী ওই ঘরেই বৃদ্ধের ওপর অত্যাচার হয়েছিল। বৃদ্ধকে কোথায় সরাল ওরা?

সে জিজ্ঞেস করল, "এ-বাড়িতে কে-কে থাকেন?"

টমি বলল, "কয়েকজন কাজের লোক, আমি আর সাহেব।"

"আগে একজন বৃদ্ধ এখানে থাকতেন। তিনি কোথায়?"

"আমি জানি না। বোধ হয় দেশে চলে গিয়েছে।"

"দেশ! দেশ কোথায়?"

"আমি জানি না।"

নীচে নেমে এস. পি. সেন কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, "আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনেছি আপনাদের এই বাড়িতে অষ্টধাতুর তৈরি ব্রজগোপালের মূর্তি আছে। খুব দামি। সেটা ঠিক আছে তো?"

"ব্রজগোপালের মূর্তি!" এস. পি. সেন ভ্রূ কোঁচকালেন।

"আপনি জানেন না? ওহো, আপনি তো সেন। এ-বাড়ির কর্তারা রায় ছিলেন। গেটে তো দেখলাম 'রায়বাড়ি' লেখা আছে।"

"আমার মামা হৃদয়রঞ্জন রায় বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান ছিলেন। মারা যাওয়ার আগে এইসব সম্পত্তি তিনি আমার নামে উইল করে গিয়েছেন। মনে হচ্ছে আমাদের এই বাড়ির ব্যাপারে আমার চেয়ে আপনি বেশি জানেন!" এস. পি. সেন বাঁকাস্বরে কথাগুলো বললেন।

"আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনাদের এ-বাড়ির অষ্টধাতুর কথা শহরের সবাই জানে। শুনেছি বাহাদুর শাহ যখন পালিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন একদল মুঘল সৈন্যের ওপর লুঠতরাজ করে এই বংশের পূর্বপুরুষ অনেক সম্পদ পেয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি বড় হিরে ছিল। সেই হিরে ওই অষ্টধাতুর মূর্তির ভেতর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। চোর এসেছিল শুনে আমার মনে হয়েছিল ওই মূর্তির সন্ধানেই সে এসেছিল।" অর্জুন হাসল, "যাক, মূর্তিটি চুরি যায়নি?"

"আমি এমন মূর্তির কথা কখনও শুনিনি। অবাক লাগছে।"

"যে বৃদ্ধ এ-বাড়িতে থাকতেন, তিনিও তো রায়। তিনি জানতে পারেন।"

"পারেন। কিন্তু আমি আসামাত্র তিনি ছুটি নিয়ে তীর্থে চলে গিয়েছেন। তা ছাড়া ওসব গল্প বিশ্বাস করার মন আমার নেই।"

"তা হলে অন্য কথা। তবে ওই বৃদ্ধ হাকিমপাড়ায় প্রায়ই যেতেন।"

"হাকিমপাড়া! কেন?"

"ওখানে একজন ব্যাচেলর প্রবীণ মানুষ আছেন। অমল সোম। লোকে ওঁকে খুব বিশ্বাস করে। নির্লোভ মানুষ। এমন হতে পারে বৃদ্ধ আপনাকে নিজের বংশের মানুষ নন মনে করে অমল সোমের কাছে মূর্তিটা গচ্ছিত রেখেছেন।"

বড়বাবু বললেন, "আমরা অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে ওঁর সময় নষ্ট করছি। মূর্তি সম্পর্কে ওঁর যখন কোনও ইন্টারেস্ট নেই, তখন; আচ্ছা চলি। চোরটাকে ধরতে পারলেই আপনাকে জানাব। নমস্কার।"

বাইরে বেরিয়ে এসে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বড়বাবুর জিপকে অনুসরণ করে শেষপর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে জিপটাকে থামাল অর্জুন। বড়বাবু অবাক! অর্জুন তাঁকে এবার সব কথা খুলে বলল। বড়বাবু হতভম্ব হয়ে বললেন, "তা হলে সেই বুড়ো মানুষটাকে ওরা ওই বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছে?"

"মনে হয়। ছাদের চিলেকোঠা অথবা মাটির তলার ঘর, যে-কোনও একটা জায়গায় হয়তো এখন সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু অমলদা এখন জলপাইগুড়িতে নেই। আজই ওঁর বাড়িতে হানা দেবে এরা। হাবু বাড়িতে আছে। ও কথা বলতে পারে না, কিন্তু গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে। খুনোখুনি হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের উচিত ওঁর বাড়িতে লুকিয়ে পাহারা দেওয়া।" অর্জুন বলল।

"ফাঁদ পাততে বলছেন? কিন্তু এস. পি. সেন আপনার ফাঁদে পা দেবেন?"

"লোভ বড় মারাত্মক জিনিস।"

"ঠিক আছে। ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।"

সেই রাত্রে অমল সোমের বাড়িতে কোনও হামলা হল না। অর্জুন একটু অবাক। তার পাতা ফাঁদে পা দেবেন না এস. পি. সেন, এটা সে ভাবতে পারেনি। সকালে হতাশ এল সে। বড়বাবু বললেন, "আপনার যজ্ঞেশ্বর হাওয়া হয়ে গিয়েছে।"

"মানে!"

"তার বউ বলছে সে নাকি কাজকর্মের খোঁজে শিলিগুড়িতে গিয়েছে।"

অর্জুন বলল, "আমি একটু ঘুরে আসছি। যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানাটা দিন তো?"

মাসকলাই বাড়িতে যজ্ঞেশ্বরের ভাঙা টিনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ওর বউ বলল, "কবে ফিরবে বলে যায়নি।"

"টাকাপয়সা কিছু দিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওর তো হাতে টাকা ছিল না। দিল কী করে?"

"একজন বুড়োমানুষ এসেছিলেন ওর কাছে। রায়বাবু নাম। তিনি দিলেন।"

"কবে এসেছিলেন।"

"কাল সকালে।"

"কীরকম দেখতে?"

"খুব রোগা আর বুড়ো।"

বাড়ি ফিরে এসে অর্জুন বড়বাবুকে ফোন করল, "বড্ড বোকা বনে গেছি। এস. পি. সেন কাউকে বেঁধে রেখে অত্যাচার করেননি। সেই বৃদ্ধ বাইরে, আর তার পরামর্শে যজ্ঞেশ্বর ওই বাড়ি থেকে অষ্টধাতুর মূর্তি চুরি করে একসঙ্গে উধাও হয়ে গিয়েছে। লোকটা আর পাতিচোর নেই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ও কেন আমার কাছে এল? আমার কাছে আগ বাড়িয়ে মিথ্যে বলে ওর লাভ কী হবে?

বড়বাবু বললেন, "একদিনের জন্যে আমরা ওর দিকে নজর দিতাম না, এটা কি ওর কম লাভ? বুড়োর সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারল! কিন্তু কোথায় পালাবে?"

অর্জুন রিসিভার নামিয়ে রাখল। সে হতভম্ব!

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

গোয়েন্দা গল্প

কিস্তিমাত

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"আপনাকে একটা বিষয় অবশ্যই ভাবতে হবে।"

"কী বিষয়!"

"আজ এক মাস হয়ে গেল, ভৈরববাবু নিরুদ্দেশ। তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।"

"ব্যাপারটা দুঃখের এবং উদ্বেগের। ভৈরব আমার বন্ধু; কিন্তু আমি কী করব বলুন! আমার কী করার আছে!"

"দেখুন, সন্দেহটা কিন্তু আপনার দিকেই যাচ্ছে।"

"আমার দিকে? আমি কী করেছি? জলজ্যান্ত একটা মানুষকে অদৃশ্য করে দিয়েছি?"

"যদি বলি, তাই। নিরুদ্দেশ নয়, তিনি খুন হয়েছেন।"

"এই সিদ্ধান্তে আসা গেল কী করে!"

"ভৈরববাবু রোজ সন্ধ্যায় আপনার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন, ঠিক কি না!"

"অবশ্যই ঠিক।"

"সেদিনও এসেছিলেন!"

"এসেছিলেন, এবং আমরা খেলায় বসেছিলুম। ভৈরবের হাত পাকা, কিন্তু সেদিন খুব অন্যমনস্ক ছিল। আজেবাজে চাল দিচ্ছিল। হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, 'আমি যাই, আমার একটা কাজ আছে।' চলে গেল।"

"সে যায়নি। এই বাড়িতেই আছে; কারণ তার চটিজোড়া এখানেই পড়ে আছে। চলে গেলে চটি দু'পাটি এখানে থাকত না।"

"আমি আপনাদের বারবার বলছি, সে ভুল করে আমার চটি পরে চলে গেছে। সেদিন সে খুব আনমনা ছিল। আপনারা এই কথাটা বিশ্বাস করছেন না কেন?"

"একটু অসুবিধে আছে।"

"কী অসুবিধে?"

"প্রমাণ করতে পারবেন না। এই চটিটা প্রমাণ হিসেবে এখানে পড়ে আছে। দ্বিতীয় চটিটা নেই।"

"সেইটাই তো স্বাভাবিক। পরে চলে গেলে আর থাকবে কী করে!"

"যদি বলি চটিটা আছে এবং আপনার পায়েই আছে।"

"কী মুশকিল! এটা আর-একটা।"

"আজ্ঞে না, এটা ওইটাই। আপনার এক জোড়া চটিই ছিল, আর সেইটাই আছে। একই সঙ্গে দু-তিনজোড়া চটি কেনার মতো বেহিসেবি

আপনি নন।"

"খুনের তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে! ভৈরবকে খুন করে আমার কী লাভ?"

"অনেক লাভ, ভৈরববাবু আপনার জীবনের এমন একটা গুপ্ত কথা জানেন, যেটা কোনও ক্রমে ফাঁস হয়ে গেলে আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

"আমার আবার গুপ্তকথা! আমার তো বিলকুল খোলা, গোপন তো কিছুই নেই!"

"বলে গেলুম, অনুসন্ধান করলেই জানতে পারবেন হয়তো। আচ্ছা, এইবার আর-একটা কথায় আসি, সেদিন আপনাদের দাবার আসরে, আপনি আর ভৈরববাবু ছাড়া তৃতীয় আর-একজন ছিলেন।"

"বোধ হয় অদৃশ্য কেউ, কারণ আমরা কেউ তাকে দেখিনি।"

"আপনারা না দেখলেও সেদিন টেবিলে যে অ্যাশট্রেটা ছিল সেটা দেখেছে। ওতে তিনরকম ব্র্যান্ডের সিগারেটের টুকরো পাওয়া গেছে। আপনাদের দু'জনের দু'রকম, তিন নম্বরটা কার? একটু ভেবে দেখবেন। কাজটা একটু কাঁচা হাতে করে ফেলেছেন কমলবাবু। চটি আর অ্যাশট্রেটা যে সাক্ষী হতে পারে, প্রমাণ হতে পারে, খেয়াল করেননি। অবশ্য এ-কথাও ঠিক, খুব পাকা অপরাধীও কোনও না কোনও প্রমাণ রেখে যাবেই যাবে। অনেক কেস তো ঘাঁটলুম। অনেককেই তেপান্তরে পাঠালুম।"

"তেপান্তর নয়, দ্বীপান্তর।"

"ও-ই হল।"

"তা, আমি যদি খুন করেই থাকি, আমাকে অ্যারেস্ট করছেন না কেন?"

"অধৈর্য হবেন না, ঠিক সময়েই হাতবালা পরবেন। আগে ডেডবডি বের করে ফেলি।"

"কোত্থেকে?"

"কেন লজ্জা দিচ্ছেন! সবই তো জানেন আপনি! কাল সকালেই সব আসবে।"

"কী আসবে? ডেডবডি!"

"বডি আসবে কেন? বডি তোলার লোকজন আসবে।"

"কোথা থেকে তুলবে?"

"স্যানেটারি পিট থেকে।"

"অ্যাঁ, সে কী! ভৈরব ওখানে আছে না কি!"

"ও কি আর ইচ্ছে করে আছে, আপনার সুব্যবস্থায় আছে। আচ্ছা, তা হলে এখন যাচ্ছি। কাল সকালে রেডি হয়ে থাকবেন, সোজা থানা, সেখান থেকে লকআপে।"

"যাচ্ছেন যান, কিন্তু ভীষণ জানতে ইচ্ছে করছে, আপনি কে?"

"ও, আমাকে চেনেন না! তা চিনবেন কী করে, এটা যে আপনার প্রথম খুন! আমার নামে অপরাধীদের মুখ শুকিয়ে যায়। আমিই সেই ফেমাস ত্রিনয়ন। অবশ্যই ছদ্মনাম। এই দেখুন, আপনার মুখ শুকোতে শুরু করেছে। ভয় পাবেন না, আমার হাতে যখন কেস পড়েছে মৃত্যু না হোক, যাবজ্জীবন হবেই।"

কোথা থেকে এল এই ত্রিনয়ন! ভৈরবকে নিয়ে নানা কাণ্ড হচ্ছে ঠিকই, থানা-পুলিশও হচ্ছে; কিন্তু ডিটেকটিভ আসে কী করে! ভৈরবের বড় ছেলে শঙ্করের কাণ্ড অবশ্যই। সব ব্যাপারে নাটুকেপনা। সে যাই হোক, মুখে যাই বলি, লোকটা মনে বেজায় ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে। একা এতবড় একটা বাড়িতে থাকি। ত্রিভুবনে আমার কেউ নেই। পরামর্শ, উপদেশ, সাহস কে-ই বা দেবে। আমাকে যে দেখাশোনা করে, হরিদা, আগে খুব সাহসী ছিল, এখন যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। সবেতেই ভয় পায়।

নিজের জন্য নিজেই তদন্তে নামলুম।

প্রথম হল চটি। সত্যিই তো, চটিটা ফেলে ভৈরব খালিপায়ে গেল কোথায়! একটা মিথ্যে কথা আমি সবসময় বলছি, সেটা হল, ভৈরব আমার জুতো পরে গেছে। সে তা যায়নি। আমাদের দু'জনের পায়ের মাপ আলাদা। ভৈরবের পা ভৈরবের মতোই, বিশাল। ত্রিনয়ন এটা খেয়াল করেনি, অথবা করেছে, পরে কিস্তিমাতের চাল দেবে।

দ্বিতীয় হল, তৃতীয় ব্যক্তি। কথাটা ভুল নয়। ভৈরব আসার আগে এসেছিল। ঘন-ঘন সিগারেটও খেয়েছিল। একেবারেই একজন অচেনা লোক। খুব চালিয়াত। খুব দামি নতুন একটা গাড়ি চেপে এসেছিল। ভৈরব আসার আগেই হাওয়া। রহস্যময় একটা লোক।

তিন নম্বর কথা হল, পিট। পিটের মধ্যে আছে ভৈরবের ডেডবডি!

এটা খুব সাঙ্ঘাতিক কথা। ওদিকটা ভারী নির্জন। একটু দূরেই বাউন্ডারি ওয়াল। তারপরেই বহুদিন বন্ধ হয়ে থাকা একটা কারখানা। ভুতুড়ে একটা জায়গা। রাতের দিকে ওখানে এমন সব কাজ হয়, যা ভাল নয়। ওই পিটের মধ্যে গভীর রাতে কেউ কিছু ঢুকিয়ে দিয়ে যেতেও পারে।

এই কথাটা মনে হওয়ামাত্রই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলুম। গলা শুকিয়ে কাঠ। এখন আমার কী করা উচিত। মনে শুরু হল বাদানুবাদ। ভেঙে দু'টুকরো হলুম। দুটো টুকরোয় তর্ক হচ্ছে,

"বাঁচতে চাস তো তুইও নিরুদ্দেশ হয়ে যা।"

"কোথায় যাব?"

"যেখানেই হোক, দূরে কোথাও।"

"ভয়ে পালাব?"

"বুঝছ না কেন? তুমি একটা চক্রান্তের শিকার হতে চলেছ। অন্যের অপরাধের সাজা তোমাকে ভোগ করতে হবে। এটা একটা বিরাট প্লট।"

"ভৈরবকে মেরে কার কী লাভ?"

"বোকা! ভৈরবকে মারা নয়, তোমাকে সরানোটাই চক্রান্তকারীদের উদ্দেশ্য।"

জামাটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আমিও একজনের সাহায্য নেব। বদমাশদের বদমাইশি আমি শেষ করে দেব। বাড়ির বাইরে পা রাখতে গিয়ে মনে হল, আমার ওপর নজর রাখা হয়েছে, কোথায় যাচ্ছি, না যাচ্ছি। সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে এসে আমি প্রীতপালকে ফোন করলুম। আমার খুব বন্ধু। আর্মিতে ছিল।

ব্রিগেডিয়ার। এখন নিজেই একটা এজেন্সি করেছে। সিকিউরিটি ইন্টারন্যাশনাল। খুব নাম।

প্রীতপাল বলল, "কেসটা একটু গড়বড় মনে হচ্ছে। তুই বাড়িতে গেড়ে বসে থাক। বেরোবি না কোথাও। আমি আসছি।"

প্রীতপালের আসল নাম প্রীতিপাল। আর্মিতে থাকার সময় ছোট হয়ে প্রীতপাল।

চান করে, খাওয়াদাওয়া কোনওরকমে শেষ করলুম। একটা বেজে গেল। কিছুই ভাল লাগছে না। আর কতক্ষণই বা! ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে ভাগ্যের চাকা ঘুরছে। এরই মাঝে একবার পিটটার কাছে ঘুরে এলুম। ম্যানহোল কভারটা তো ঠিকই রয়েছে। একটা মানুষকে ঢোকাতে হলে চাড় দিয়ে খুলতে হবে। সেই খোলার তো একটা চিহ্ন থাকবে! সেসব কিছুই নেই। কে আমাকে বোকা বানাতে চাইছে? উদ্দেশ্যটাই বা কী! ভাবতে-ভাবতে একসময় মনে হতে লাগল, সত্যিই আমি খুন করিনি তো! হয়তো তখন একটা ঘোরে ছিলুম। গল্পে পড়েছি কখনও-কখনও দুষ্ট আত্মা স্বাভাবিক মানুষের ওপর ভর করে, তারপর তাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছা মতো যা খুশি তাই করিয়ে নেয়। সেইরকম কিছু হয়নি তো!

ভাবতে-ভাবতে যখন প্রায় পাগলের মতো অবস্থা, তখন গেটের দিক থেকে ভীষণ একটা গোলমালের শব্দ কানে এল, প্রবল বচসা হচ্ছে হরিদার সঙ্গে। একেবারে সামনে না গিয়ে আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখলুম, এক বৃদ্ধ, প্রায় জড়ভরত, তিনি ভেতরে আসতে চাইছেন, হরিদা কিছুতেই ছাড়ছে না। বৃদ্ধ বলছেন, "আমার মেয়ের অসুখ, বাঁচবে না, আমি শুধু একবার তোমার বাবুর সঙ্গে দেখা করব। সাহায্য-টাহায্য কিছুই চাই না, শুধু একটা ঠিকানা চাই। তুমি কেন বাপু এমন করছ! আমি চোর, না গুণ্ডা!"

আমি চেঁচিয়ে বললুম, "হরিদা, আসতে দাও।"

বৃদ্ধ ঠুকঠুক করে বৈঠকখানায় এসে সোফায় বসে পড়লেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "দরজাটা দিয়ে দে।"

আরে! এ যে প্রীতপাল। কী সাঙ্ঘাতিক মেকআপ! গলার স্বরটাও পালটে ফেলেছিল। মুখে একটা পাতলা রবারের মুখোশ সাঁটা ছিল। সেটা খুলে ফেলে বলল, "একেবারেই ধরতে পারিসনি! একশোতে একশো পেলুম।"

"অবশ্যই। গলার স্বরটাও বদলে ফেলেছিস।"

"ট্রেনিং, ভাই, ট্রেনিং। এককাপ রেড টি আপাতত।"

"চল, ওপরে গিয়ে বসি। এ-ঘরটা তেমন নিরাপদ নয়।"

"না, দোতলায় যাব না, কারণ সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দূর থেকে কেউ দেখে ফেলতে পারে। ফোনে যেটুকু বলেছিস তাতে মনে হচ্ছে, সবদিক থেকে তোকে নজরে রাখা হয়েছে।"

"কেন? সেইটাই তো বুঝতে পারছি না।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দে ঝটপট। ওই ভৈরবের সঙ্গে তোর কতদিনের আলাপ!"

"আমার বাল্যবন্ধু।"

"এই বিষয়-সম্পত্তি কার নামে আছে?"

"এইটাতেই একটু গোলমাল আছে।"

"কীরকম?"

"ভৈরবের ছোটবোনকে আমার বাবা ভীষণ ভালবাসতেন। খুব ইচ্ছে ছিল আমার সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলে এই পরিবারে আনার। আমি রাজি হইনি। এই নিয়ে আমার সঙ্গে তিক্ততা। বাবার অসুখের সময় সে দু' হাতে সেবা করেছিল। বাবা একটা উইল করে সব প্রপার্টি তাকে দান করে গেলেন। শর্ত রইল, যতদিন আমি আছি ততদিন আমার ভোগদখলে থাকবে। যদি আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিই, বা মারা যাই, তখন সব চলে যাবে ওর হাতে, বা ওর বংশধরদের হাতে।"

"সেই মেয়ের বিয়ে হয়েছে?"

"না।"

"না কেন?"

"বলতে পারব না!"

"ওই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে?"

"একজন প্রোমোটার। আমাকে বছরখানেক ধরে উত্ত্যক্ত করছে, এটা ছেড়ে দিন, মোটা টাকা দেব। আমি রাজি হইনি। পরে ভৈরবকে দিয়েও প্রেশার দিচ্ছিল। শেষ যেদিন ভৈরব খেলতে-খেলতে উঠে চলে গেল, ভীষণ অন্যমনস্ক, সেদিন ও যেন কিছু একটা বলতে চাইছিল আমাকে।"

প্রীতপাল 'হুম' বলে একটা শব্দ করল। চুমুকে-চুমুকে লাল চা খেল। একটা প্যাড টেনে নিয়ে ডটপেন দিয়ে কীসব আঁকিবুঁকি করল। এদিকে বেলা পড়ে আসছে। হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "পেয়েছি, প্ল্যান ইজ্ ক্লিয়ার।"

"পিটটা একবার খুলে দেখলে হয় না!"

"পাগল হয়েছিস। ওখানে কিস্সু নেই। ভৈরব বেঁচে আছে, তবে আজ রাতেই সে খুন হবে। শুধু তাই নয়, আজকের রাতটাও তোর পক্ষে বিপজ্জনক। আমি বলে যাচ্ছি, কী-কী হবে, ভৈরবের ছোটবোন তোর কাছে আসবে, এসে কান্নাকাটি করতে থাকবে দাদার জন্য। ইতিমধ্যে ভৈরব খুন হয়ে চলে আসছে যথাস্থানে। কাল সকালে সেই ব্যাটা ত্রিনয়ন আসবে তার বাহিনী নিয়ে। ভৈরবকে বাঁচাতে হবে। উই মাস্ট সেভ হিম, আর এই কুচক্রীদের সাজার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"ভৈরব আছে কোথায়?"

"একটু ভাবতে দাও, একটা ওমলেট পাঠাও।"

প্রীতপাল চোখ বুজিয়ে বসে আছে। রাত এল বলে! বাইরেটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। অপরাধ না করেও আমি বসে আছি অপরাধীর মতো। প্রীতপাল হঠাৎ লাফিয়ে উঠল তড়াক করে। আমি আমার মতো করে বলে ফেলেছি, "আচ্ছা, কিছুদিনের জন্যে সরে

পড়লে কেমন হয় ?"

"ইডিয়েট ! তা হলে ভৈরব মরবে এবং তুমিও মরবে। এবং এই সম্পত্তি ওদের দখলে চলে যাবে।"

"তা হলে ?"

"পাঁচিল টপকাতে পারবি ?"

"পাঁচিল ?"

"ইয়েস, পাঁচিল।"

বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। হরিদা বসে রইল অন্ধকারে ভূতের মতো। প্রীতপাল হরিদাকে বলল, "শোনো, যে-কোনও সময় একজন মহিলা আসবে। তুমি বলবে, বাড়ির আলো চলে গেছে, বাবু মিস্ত্রি ডাকতে গেছে। যদি বসতে চায়, বলবে, পরে আসবেন। তুমি খুব সাবধানে থাকবে, গেটের বাইরে যাবে না, যদি কেউ এসে বলে, তোমার বাবুর বিপদ হয়েছে, তা হলেও না।"

আমাদের পোশাক এখন প্রায় মিলিটারিদের মতো। পায়ে স্নিকার শু। বাগানের পেছনের পাঁচিলের ধারে চলে এসেছি। বড়-বড় গাছ। ওপারে সেই ভুতুড়ে কারখানা। অন্ধকার। জনপ্রাণী আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

প্রীতপাল পাঁচিলের মাথায়। তার কাছে সহজ ব্যাপার। আমি কোনওক্রমে উঠলুম। খুব সাবধানে ওপাশে এক লাফ। ঝোপঝাড়ের মধ্যে। সাপ থাকলেও থাকতে পারে। ইঁদুর, ছুঁচো আছেই।

অন্ধকারে হায়েনার মতো এগোচ্ছি সন্তর্পণে। খালি পিপে। ফেলে দেওয়া বয়লার। অকেজো ট্রাক। ভাঙা মোটরগাড়ি। কারখানার শেড। যন্ত্রপাতির ভূত। এগোতে-এগোতে প্রীতপাল হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। ভাঙা একটা ম্যাটাডরের আড়ালে আমরা গুঁড়ি মেরে বসলুম। খুব অস্পষ্ট কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। সামনেই গোডাউন। সেদিক থেকেই আসছে গুঞ্জন। প্রীতপাল রিভলভারটা বের করে হাতে নিল। কানে-কানে বলল, "ক্রাউচ।"

গোডাউনের পেছন দিক। গরাদে বসানো জানলা। পাল্লা নেই। ভেতরে মোমবাতি জ্বলছে কেঁপে-কেঁপে। ক্যাম্পখাটে চাদর-চাপা একজন মানুষ। ষণ্ডামার্কা দুটো লোক মেঝেতে বসে আছে। হিন্দিতে কথা বলছে।

"দশবাজেতক খতম হো যায়েগা।"

"ক্যায়সে ?"

"য্যায়সে হোতা হায় !"

ফিসফিস করে বললুম, "অ্যাকশান।"

"নট নাও। ওয়েট।"

প্রীতপাল ম্যাটাডরের তলায় শুয়ে মোবাইল ফোনে কী আদেশ করল বোঝা গেল না। অন্ধকারে আমিও ঘাপটি মেরে আছি। অনেকটা পরে প্রায় মধ্যরাতে মেন গেট দিয়ে একটা গাড়ি ঢুকল। হেডলাইট, ব্যাকলাইট, ইন্ডিকেটর লাইট সব নেভানো। ভয়ঙ্কর এক দানবের মতো ঢুকছে। এঞ্জিনের চাপা গরগর। গাড়িটা থামল। চারটে লোক নেমে এল। গোডাউনের দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। মোট ছ'জন হল। আমরা মাত্র দু'জন।

প্রীতপাল ঘড়ি দেখল। আমাকে বলল, "তুই ওই জানলায় থাক। ঘাবড়াসনি। তুই এই যন্ত্রটা হাতে রাখ। মাঝে-মাঝে এই বোতামটি টিপবি। এটা সিগন্যাল। আরও একডজন লোক আসছে। সিগন্যালটা তাদের জন্যে।"

সিগারেট কেসের মতো চ্যাপটা একটা যন্ত্র আমার হাতে। টিপের মতো লাল একটা আলো জ্বলছে। প্রীতপাল অন্ধকারে নেকড়ে বাঘের মতো এগিয়ে গেল।

ভেতরে আর-একটা বাতি জ্বলছে। একজন খাটিয়ার চাদরটা সরাতেই চমকে উঠলুম। ভেবেছিলুম ভৈরবকে দেখব। কোথায় ভৈরব ! এ তো ভৈরবের বোন। দু'জনের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে একটা ইঞ্জেকশন ফুঁড়ে দিলে। কণিকা উঠে বসল। যে এতক্ষণ নেতিয়ে পড়ে ছিল সে চনমন করে উঠে বসল।

একজন অন্ধকার থেকে এগিয়ে এল, দলিলের মতো একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, "ভালয় ভালয় সইটা করে দাও, তা না হলে ওই যে তোমার দাদা, খতম হো যায়েগা।"

এইবার ভৈরবকে দেখতে পেলুম। স্ট্রেচারে পড়ে আছে। অর্ধমৃত। প্রীতপালকে দেখতে পাচ্ছি না। ছায়ান্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলেও আর একজনকেও চিনত পেরেছি, সে হল ওই ত্রিনয়ন।

কণিকা উত্তেজিত গলায় বলল, "সই আমি করব না, মেরে ফেলতে হয় মেরে ফেলো।"

"মারব কেন ? তোমাকে সারাজীবন পঙ্গু করে ফেলে রাখব, আর তোমার দাদার ছাল ছাড়াব, একটু-একটু করে মেরে ফেলব, আর যাকে তুমি সবচেয়ে ভালবাস, তার গলায় পরাব ফাঁসির দড়ি।"

দু'জন স্ট্রেচারটা ধরাধরি করে সামনে নিয়ে এসে ধপাস করে মাটিতে নামাল। কোনও দয়ামায়া নেই। ভৈরবকে দেখে কষ্ট হচ্ছে। সেই সুন্দর চেহারা নেই। একটি কঙ্কাল। এত রাগ হচ্ছে, মনে হচ্ছে ঘরে ঢুকে সবক'টাকে মেরে পাটপাট করে দিই।

দলের পাণ্ডা জিজ্ঞেস করল, "ওদিকের খবর কী ?"

"বাড়ি অন্ধকার। পোল থেকে ফিউজ উড়ে গেছে। মেকানিক ডাকতে গেছে।"

"পালায়নি ?"

"না, ওস্তাদ।"

"মরবে। মরতে ওকে হবেই। নাও দিদিমণি, সই করো। কেন অশান্তি করছ !" কণিকা কলমটা ছুড়ে ফেলে দিল। ছ'টা লোক রাগে মাটিতে পা ঠুকল। আর ঠিক সেই সময় আমার হাতের যন্ত্র বিপ-বিপ করে উঠল। হঠাৎ একটা কাপড়ের দলার মতো কী ঝপাস করে বাতি দুটোর ওপর এসে পড়ল। ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। আমার চারপাশ দিয়ে কারা যেন ছুটে চলে গেল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে।

বন্ধু প্রীতপালের কঠিন মিলিটারি গলা শোনা গেল, "যে যেখানে আছ সেইখানে থাক। নড়ার চেষ্টা করলেই মাথার ঘিলু বের করে দেব। তোমরা ঘেরাও।"

লম্বা-লম্বা গোটাকতক টর্চের আলোয় ঘর নীল। সেই আলোয় প্রীতপালের বারোজন লোক যেন বারোটা পাথরে কোঁদা মূর্তি। এতটা হবে, ওই ছ'টা বদমাশ বুঝে উঠতে পারেনি।

প্রীতপালই মোবাইল ফোনে বলছে, "সান্যাল মুভ ইন। ফ্রন্ট গেট। গোডাউন অ্যাট দ্য ব্যাক সাইড।"

পুলিশের গাড়ির হেডলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হল সেই ভুতুড়ে পরিবেশ। একটা নয়, দুটো ভ্যান। ফোর্স নামছে। সান্যাল বলছেন, "ওয়েল ডান প্রীত।"

সবক'টাকে ভ্যানে পুরে গাড়ি বেরিয়ে গেল। অন্ধকারে আকাশের আলোয় আমরা কয়েকজন। কণিকা এগিয়ে এসে আমার বুকে মাথা রেখে কাঁদছে। আমরাও কান্না পাচ্ছে। অকারণে কণিকাকে আমি এতদিন খুব কষ্ট দিয়েছি। আমি একটা অমানুষ বটে ! কণিকা কত রোগা হয়ে গেছে !

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে প্রীতপালের কম্যান্ড, "অনেক পাকামো করেছ, এইবার পিতার ইচ্ছা পূরণ করে দু'জনে এক হও।"

আগে-আগে স্ট্রেচারে চলেছে ভৈরব। পেছনে আমরা। আমার কাঁধে প্রীতপালের হাত। কণিকার কাঁধে আমার হাত।

চলে যাওয়ার আগে প্রীতপাল হেঁকে বলে গেল, "গাধা ! নিমন্ত্রণপত্রটা যেন আমরা পাই। আমাদের ফুল টিম। বরযাত্রী এবং বউভাত, দুটোই।"

ভৈরব ইতিমধ্যে হরিদার হাতের কফি খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়েছে। সে হাসতে-হাসতে বলল, "দেখলি পাঁঠা ! একেই বলে দাবার চাল ! কিস্তিমাত।"

ছবি : দেবাশিস দেব

গোয়েন্দা গল্প

নিখুঁত খুনের কাছাকাছি

হেনরি হোল্ট

কাবের আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে একটা খানদানি চুরুটে আগুন ধরালেন মিস্টার ডেভিড পোরলক। দুনিয়ার যা কিছু ভাল সবেতেই তাঁর আজ দিলখুশ। একটু আগেই নৈশভোজ সেরেছেন মেজাজি কেতায়। সব কাজ এ ভাবেই সারেন তিনি। সুগন্ধী ধোঁয়ার প্রথম রেখা ওপরে ভেসে উঠতেই তিনি মনোযোগ দিলেন

পানপাত্রের সোনালি তরলে। গ্লাস ঠোঁটে ছোঁয়াতে যাবেন, এমন সময় একজন পরিচারক রুপোর ট্রে-তে করে একটা কার্ড বয়ে নিয়ে এল।

"ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টর, নিউ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড," নির্লিপ্ত মুখে কার্ডটা পড়লেন মিস্টার পোরলক, "কী ব্যাপারে এসেছেন?"

"উনি বলেননি, সার।"

"ওঁকে ভিজিটরদের ঘরে বসাও। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।"

পানীয় শেষ করলেন মিস্টার পোরলক, তারপর ধীরেসুস্থে রওনা হলেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড তাঁর কাছে কী জানতে চায়?

"আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, সার," ইনস্পেক্টর সিলভার বললেন, "ব্যাঙ্ক ম্যানেজার মিস্টার চার্লস ক্যাভেন্ডিশের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি।"

"ক্যাভেন্ডিশ? কেন, ওঁর কী হয়েছে?" চটপট কৌতূহলী হয়ে মিস্টার পোরলক জানতে চাইলেন।

"মানে, সত্যি কথা বলতে কী, আমিও ঠিক জানি না। মনে হচ্ছে, তিনি কেমন রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছেন।"

পোরলক ক্রমশ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎই যেন সহজ হলেন।

"রাবিশ!" বললেন তিনি, "ক্যাভেন্ডিশের মতো লোক উধাও হতে পারেন না। কাল রাতেই তো উনি এখানে আমার সঙ্গে ডিনার খেয়েছেন। না, না, সেরকম গোলমেলে কিছু হতেই পারে না।"

"সকলের আশা তাই, কিন্তু কাল রাতে তিনি বাড়ি ফেরেননি। আর তারপর থেকে কেউ ওঁকে দেখেনওনি।"

দিশেহারা দৃষ্টি নিয়ে সি আই ডি অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইলেন পোরলক।

"আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। কাল চলে যাওয়ার সময় মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ তো ঠিকই ছিলেন।"

"তখন ক'টা হবে, সার?"

"এই প্রায় এগারোটা, কি তার ঠিক পরেই। আমি ততটা খেয়াল করে দেখিনি।"

"উনি কি বলেছিলেন কোথায় যাচ্ছেন?"

"না। তবে আমি স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছি বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। সে ছাড়া আর কিছু ভাবার তো কোনও কারণ ছিল না।"

লোহার মতো ধূসর গোঁফে আঙুল ছোঁয়ালেন সিলভার।

"তাঁকে দেখে কি তখন নরমাল মনে হয়েছিল, সার?"

"অবশ্যই। সত্যি কথা বলতে কী, উনি দারুণ খোশমেজাজে ছিলেন। পরের শনিবার দু'জনে মিলে মাছ ধরতে যাওয়ার প্রোগ্রামও করেছিলাম।"

"আপনি আর মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ বোধ হয় পুরনো বন্ধু?"

"হ্যাঁ। পঁচিশ বছর আগে আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি। এই উধাও হওয়ার ব্যাপারটাকে আমি খুব একটা সিরিয়াসলি নিতে পারছি না, ইনস্পেক্টর। দেখবেন, খুব শিগ্‌গিরই উনি সশরীরে এসে হাজির হবেন। অবশ্য যদি না ওঁর কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে।"

"আমরা সব হসপিটালে খোঁজ নিয়েছি। সেখানে ওঁর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।"

"এক মিনিট, উনি যেন বলেছিলেন—হ্যাঁ, উনি আমাকে যেন বললেন, ওঁর স্ত্রী ইস্টবোর্ন না কোথায় যেন গেছেন।"

"মিসেস ক্যাভেন্ডিশ কাল রাতে হঠাৎই ফিরে এসেছেন, সার, আর এসেই ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছেন। আজ ভোর চারটের সময় তিনি আমাদের ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়েছেন। আমরা বহু খোঁজখবর করেছি, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সবে আজ সন্ধেবেলা চিফ ক্যাশিয়ারের হঠাৎ খেয়াল হয় যে, তিনি মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে গতকাল বলতে শুনেছিলেন, উনি নাকি রাতে আপনার সঙ্গে ডিনার সারবেন।"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা শুনে একটু ইয়ে হওয়ারই কথা।" পোরলক মন্তব্য করলেন।

"কাল রাতে ঠিক কী হয়েছিল একটু খুলে বলবেন, সার—যদি আপনার আপত্তি না থাকে।"

"না, না, আপত্তির কী আছে। কাল রাত আটটার সময় ক্লাবে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। ডিনারের পর আমরা একটু বিলিয়ার্ড খেলেছিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমার ফ্ল্যাটে যাই।"

"ফ্ল্যাটে ক'টার সময় পৌঁছেছিলেন, সার?"

"তা দশটা তো হবেই।"

"ওখানে যাওয়ার বিশেষ কোনও কারণ ছিল?"

"হ্যাঁ। আমার কাছে খুব চমৎকার পুরনো নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডি ছিল। আমি চেয়েছিলাম ক্যাভেন্ডিশ ওটা একটু চেখে দেখুন।"

"ও, তার মানে উনি আপনার ফ্ল্যাটে ঘণ্টাখানেকের বেশি ছিলেন?"

"তা হবে।"

"যখন ওঁকে ছেড়ে দেন তখন আপনি কোথায় ছিলেন?"

"আমার ফ্ল্যাটের দরজায়।"

"তার মানে লিফ্‌টে চড়ে তিনি একাই নেমে গিয়েছিলেন?"

"না। আসলে উনি লিফ্‌টে নামেননি। বলছিলেন, ওটার জন্যে অপেক্ষা করতে বিরক্ত লাগছে।"

"আপনি কি আর ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, সার?"

"না। একটু পড়াশোনা করলাম, তারপর মাঝরাত নাগাদ শুতে গেলাম।"

ইনস্পেক্টরের আঙুল আবার চলে গেল গোঁফের দিকে।

"ব্যাপারটা এবার স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে," তিনি বললেন, "আপনিই ওঁকে শেষ দেখেছেন।"

"তাই তো মনে হচ্ছে। যদি না অবশ্য আমাদের বাড়ির রাতের দরোয়ান ওঁকে বেরনোর সময় দেখে থাকে। লোকটা নীচের হলে ওর ছোট্ট অফিসেই সাধারণত বসে থাকে। তবে জানি না, কাল ক্যাভেন্ডিশকে বেরোতে দেখেছে কি না।"

"অনেক ধন্যবাদ, সার। এরকম একটা ব্যাপারে আমাদের তো খোঁজখবর করতেই হবে। তবে আপনি যেমন বললেন, আমরাও চাই খুব শিগ্‌গিরই উনি সশরীরে এসে হাজির হোন।"

"ব্যাপারটা সত্যিই বেশ অদ্ভুত। ব্যাঙ্ক ম্যানেজাররা সাধারণত বেশ শক্ত ধাতের ভরসা করার মতো মানুষ হন। দেখুন, ওঁর হয়তো স্মৃতিভ্রম হয়েছে, পথ হারিয়ে কোনদিকে চলে গেছেন। এখন সত্যিই বড় চিন্তা হচ্ছে।"

আরও একদিন কেটে গেল। খবরের কাগজগুলো ব্যাপারটায় খুব মারাত্মক আগ্রহ না দেখিয়ে কয়েকটা সাবধানী প্যারাগ্রাফ ছাপল, কারণ মানুষ তো রোজই উধাও হয়ে যাচ্ছে। ঠিকই যে, এ-ক্ষেত্রে উধাও-হয়ে-যাওয়া মানুষটি একজন ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, ফলে কিছুটা গুরুত্বপূর্ণ। ওয়্যারলেসে এস. ও. এস. পাঠিয়ে আরও খানিকটা প্রচার পাওয়া গেল। তবে সপ্তাহের শেষে অন্যান্য আরও ঘটনা জনতার নজর কেড়ে নিল। আর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ভদ্রলোক অস্থায়ীভাবে চালকের আসনে বসে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম দিব্যি সামাল দিতে লাগলেন।

সুতরাং, মাসখানেক পর এই উধাও হওয়ার ব্যাপারটা প্রায় সকলেই ভুলে গেল। শুধু ব্যক্তিগতভাবে যাঁরা মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে চিনতেন তাঁরা ভুলতে পারলেন না। আর মিসেস ক্যাভেন্ডিশ ধরে নিলেন যে, রহস্যময় এক বিচিত্র ঢঙে তিনি বিধবা হয়েছেন।

মিস্টার ডেভিড পোরলক রীতিমত আয়েসি

ভদ্রলোক। তিনি ঠিক করলেন এই জুন মাসের কয়েকটা সপ্তাহ পারীতে কাটিতে আসবেন। কারণ এই সময়টাই ওই স্ফূর্তির শহরের সেরা সময়। ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ক্লোকরুমে তাঁর সব জিনিসপত্র জমা দেওয়া হল। তারপর তিনি দু-একটা কাজ সেরে ক্লাবে এলেন লাঞ্চ সারতে। কিন্তু সামনে সাজিয়ে দেওয়া উৎকৃষ্ট মাছের পদের স্বাদ নেওয়ার আগেই ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টর সিলভারের কার্ড তাঁর কাছে হাজির করল একজন পরিচারক।

সামনের খাবারের দিকে একপলক তাকিয়ে ভুরু কোঁচকালেন মিস্টার পোরলক।

"ওঁকে বলো, আমি এক্ষুনি নীচে আসছি।" পরিচারককে এ-কথা বলে ছুরি আর কাঁটাচামচ তুলে নিলেন তিনি। এর পর যখন তিনি নীচে নেমে এলেন, ডিটেকটিভ সিলভার তখনও ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছেন।

"আবার কী ব্যাপার, ইনস্পেক্টর?" অভিজাত মানুষটি আলগা সৌজন্য দেখিয়ে জানতে চাইলেন, "আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারব না, কারণ আজই আমি পারী চলে যাচ্ছি।"

"ওই মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের ব্যাপারটার জন্যেই এসেছি, সার। আমরা এখনও ওটার ফাইল ক্লোজ করতে পারিনি।"

"ওহ্, হ্যাঁ, ঠিকই তো। আপনারা একবার কোনও কিছু কামড়ে ধরলে সহজে ছাড়েন না, তাই না?"

"ছাড়তে চেষ্টা তো করি, কিন্তু না পারলে আর কী করব! এই কেসটার জট আমরা এখনও ছাড়াতে পারিনি।"

"আমার তো মনে হয় ওঁর মেমরি লস হয়েছে।"

"আপনি হয়তো সেটা ভাবতে পারেন, সার—তবে ওঁর ডাক্তার মোটেও সেরকম ভাবেন না।" সিলভার বললেন, "তিনি স্পষ্ট বলেছেন, অ্যামনেসিয়া আর যারই হোক, মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের হওয়ার নয়।"

"তা হলে আমি হাল ছেড়ে দিচ্ছি।" খানিকটা বিমূঢ়ভাবে আনমনা গলায় বললেন পোরলক।

"কিন্তু আমরা কখনও হাল ছাড়ি না।"

"যাকগে, আপনি কী জন্যে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, বলুন। আমি বোধ হয় আপনাকে কয়েক মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না।"

অবিচলিত ইনস্পেক্টর তাঁর লোহা-ধূসর গোঁফে আঙুল চালাতে লাগলেন।

"দুঃখিত, সার, এরকম একটা ব্যাপারে আমরা তাড়াহুড়ো করতে পারি না। আরও দু-একটা পয়েন্ট আছে যেগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার—যদি অবশ্য আপনার আপত্তি না থাকে। মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ উধাও হওয়ার পরদিন আপনি আমাকে যা-যা বলেছিলেন তার সমস্ত নোট এখানে রয়েছে।"

"এ তো জানা কথা, আমার আর কিছু বলার নেই। তখনই যা বলার, সব বলেছি।"

"হতে পারে, সার। কিন্তু তা সত্ত্বেও রুটিনমাফিক কাজ তো আমাদের করতেই হবে। এখানে লেখা আছে দেখছি আপনি মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে নিয়ে আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন রাত দশটায়। আর, তারপর আপনি আর বেরোননি?"

পোরলক ছোট্ট করে হাসলেন।

"হ্যাঁ, কিন্তু এসব তো প্রাচীন ইতিহাস। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—"

"আপনি ক'দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছেন, সার?"

"ওহ্, এক মাস কি বড়জোর ছ' সপ্তাহ। পারীতে গিয়ে কেমন লাগে তার ওপর নির্ভর করছে ক'দিন থাকব।"

"আপনি কী-কী লাগেজ সঙ্গে নিচ্ছেন জানতে পারি কী?"

মিস্টার পোরলক যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। এ-প্রশ্নে খানিকটা যেন অবাক হলেন তিনি।

"জানি না এর সঙ্গে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কী সম্পর্ক, তবে আপনি যদি সত্যিই জানতে চান, তা হলে আমার বলতে কোনও আপত্তি নেই।"

"বললে ভাল হয়, সার।" অবিচলিত সিলভার উত্তর দিলেন।

"দাঁড়ান, মনে করে দেখি। একটা ট্রাঙ্ক, একটা সুটকেস আর একটা অ্যাটাচি কেস। কিন্তু এসব জেনে আপনার কোন উপকারটা হবে সেটা একটু বলবেন?"

"সেরকম কোনও কারণ নেই, সার। তবে ওই যে, একটু আগে আপনি বললেন, কোনও কিছু কামড়ে ধরলে আমরা সহজে ছাড়ি না। একদিন-না-একদিন আমরা জানতে পারবই মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের কী হয়েছে। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না, সব রকম চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।"

"সত্যি, আপনাদের তারিফ করতেই হয়। তবে আমি আর কোনও সাহায্য করতে পারব বলে মনে হয় না। এবার যদি আমাকে মাফ করেন, ইনস্পেক্টর—"

"আপনি আমাকে মাফ করবেন, সার। আরও দু-একটা ব্যাপার আমাদের খতিয়ে দেখা বাকি আছে। আপনি যদি আর-একটু সাহায্য করেন তা হলে আমি খুব জলদি কেসটা গুছিয়ে নিতে পারব। তারপর আপনি এসব ব্যাপার পুরো ভুলে গিয়ে নিশ্চিন্তে যেখানে খুশি যেতে পারেন। নেহাত ফরমালিটি হিসেবে জিজ্ঞেস করছি, আপনার মালপত্রগুলো এখন কোথায় আছে বলবেন?"

"নিশ্চয়ই। ভিক্টোরিয়া স্টেশনের ক্লোকরুমে। কিন্তু এ সব ব্যাপার কি একটু হাস্যকর ঠেকছে না?"

"যেখানে একজন ভদ্রলোকের জীবন-মরণ সমস্যা, সার, সেখানে আমাদের সবকিছুই খতিয়ে দেখতে হবে তা সেটা অন্য কারও চোখে হাস্যকর লাগুক আর নাই লাগুক। আমার প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার মতো কোনও কারণ নিশ্চয়ই আপনার নেই?"

"একেবারেই না। তবে বেকার সময় নষ্ট হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে।"

"আমার সঙ্গে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে যেতেও নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি হবে না?"

"আপনি যেতে চাইলে আমার আর আপত্তির কী আছে!" মিস্টার পোরলক বললেন, "কিন্তু এখনও আমি আপনার উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারছি না।"

"স্রেফ রুটিন ব্যাপার, সার।" বিড়বিড় করে বললেন ইনস্পেক্টর, "পুলিশের কাজের ষোলো আনাই তো প্রায় তাই। আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করলে কোনও-কোনও পাবলিক খাড়া হয়ে বসে, কিন্তু ওসব আমরা গায়ে মাখি না। তবে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যাতে কেউ অনর্থক বেশি উত্তেজিত না হয়। এবার কি তা হলে আমরা রওনা হব, সার?"

পোরলকের কাঁধ সামান্য নড়ল। তারপর তিনি রাজি হলেন।

ভিক্টোরিয়া স্টেশনে পৌঁছে ইনস্পেক্টর বললেন, "এবার সার, আপনার জিনিসগুলো আমি একটু দেখতে চাই। আপনার কাছে নিশ্চয়ই ক্লোকরুম-টিকিট আছে?"

ক্লান্ত হেসে পোরলক টিকিটটা ইনস্পেক্টরকে দিলেন।

"এই নিন। আর জিনিসপত্র খুলে যদি দেখতে চান তা হলে এই নিন চাবির গোছা। জানি না আপনি ঠিক কী খুঁজতে চাইছেন, তবে আমার জামাকাপড়গুলো কম এলোমেলো করলে খুশি হব।"

প্রায় অপরাধী-মুখে সিলভার ট্রাঙ্কের তালা খুললেন। ট্রাঙ্কের ভেতরটা ওপর-ওপর দেখে নিয়ে আবার তালাবন্ধ করে দিলেন।

"ঠিক আছে, সার।" বললেন তিনি, "আপনি আশা করি কিছু মনে করেননি?"

"বিন্দুমাত্র না।" বেশ আন্তরিকভাবেই জবাব

দিলেন মিস্টার পোরলক, "এবারে বলুন তো, আমার ট্রাঙ্কটা খুলে দেখার কারণ কী ?"

"ভেতরে কী আছে দেখার জন্যে, সার।" অমায়িক উত্তর পাওয়া গেল।

"ও। এবার আপনি সন্তুষ্ট তো ?"

"হ্যাঁ, নিজের চোখে দেখা প্রমাণ তো মানতেই হয়।" আলতো করে নিজের গোঁফে টান মারলেন সিলভার, "ভাল কথা, সার, আপনার কি আর কোনও লাগেজ আছে ?"

"আশ্চর্য লোক মশাই আপনি ! এক মাসের জন্যে পারী গেলে আর কত জিনিস সঙ্গে নিতে লাগে !"

"আজ সকালে আপনার ফ্ল্যাট থেকে শুধু এই লাগেজগুলোই আপনি নিয়ে বেরিয়েছেন ?"

"কী বলতে চাইছেন, ইনস্পেক্টর ?"

"আমি শুধু আমার প্রশ্নের উত্তর চেয়েছি, সার।"

"পারীতে আমি শুধু এই লাগেজগুলোই নিয়ে যাচ্ছি।"

"আমি জানতে চেয়েছি, আজ সকালে আপনার ফ্ল্যাট থেকে শুধু এই লাগেজগুলোই আপনি নিয়ে বেরিয়েছেন কি না।"

"নিশ্চয়ই।"

মুহূর্তের জন্য সিলভারের চোখ ঝিকিয়ে উঠল যেন।

"আপনার ঠিক মনে আছে তো ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—"

"এই একটা ট্রাঙ্ক, একটা সুটকেস, আর একটা অ্যাটাচি কেস ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।"

"আরও ভাল করে ভেবে ঠিক-ঠিক জবাব দিলে ভাল হয়, মিস্টার পোরলক।"

"আমার পাঁচরকম কথা বলা অভ্যেস নেই, ইনস্পেক্টর।" অবিচলিত স্বরে উত্তর পাওয়া গেল।

"ও ! তা হলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আপনি ভুলে গেছেন।"

"ভুলে গেছি ? কী ?"

"আমি খবর পেয়েছি যে, আপনি বাড়ি থেকে দুটো ট্রাঙ্ক নিয়ে এই ক্লোকরুমে এসেছেন।"

চিন্তায় মিস্টার পোরলকের চোখ কয়েক মুহূর্তের জন্য ছোট হল। তিনি বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন, ইনস্পেক্টর। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, আপনার এই জিজ্ঞাসাবাদের চোটে আমার সবকিছু কেমন গুলিয়ে গেছে। হ্যাঁ, আরও একটা ট্রাঙ্ক আছে বটে ! ওতে বেশ কিছু দামি জিনিসপত্র আছে—মানে, নানা ট্রোফি, মেডেল এইসব। আমি বাইরে কোথাও গেলে ওগুলো ফ্ল্যাটে রেখে যাই না। ওই ট্রাঙ্কটার কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম—আপনি বললেন তাই মনে পড়ল।"

"বুঝতে পেরেছি, সার। খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ করে আপনি যখন বাইরে যাওয়ার তাড়াহুড়োয় রয়েছেন। ওই ট্রাঙ্কটা কোথায় রেখেছেন ?"

"আমার ব্যাঙ্কের স্ট্রং-রুমে। সবসময় ওখানেই রেখে যাই।"

"ওটা যদি খুলে একপলক দেখি তাতে আপনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না ?"

"একেবারেই না। এই নিন চাবি। ফিরে আসার আগে ওটা আমার দরকার পড়বে না। গুডবাই, ইনস্পেক্টর। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড সত্যিই নাছোড়বান্দা। তবে এ ছাড়া আপনাদের কোনও উপায়ও তো নেই। এবার আমাকে যেতে হবে।"

সিলভার যেন মুহূর্তে আরও খানিকটা সতর্ক হলেন।

"না, সার, এভাবে আমাদের রুটিন চেক আপটা শেষ করা যাবে না। আমার সঙ্গে আপনাকে ব্যাঙ্কে যেতে হবে"

"সে কী অদ্ভুত কথা ! আমার ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।"

"তা হলেও কিছু করার নেই, সার। আপনাকে আমার সঙ্গে ব্যাঙ্কে যেতে হবে।"

পোরলকের মর্যাদাবোধ আবার উঁকি মারল।

"আপনি কি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন না, ইনস্পেক্টর ? আপনার খামখেয়ালিপনার সঙ্গে তাল মেলানোরও একটা সীমা আছে। আমার বেড়াতে যাওয়ার সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে রয়েছে অথচ—"

"কোনও উপায় নেই, সার। আমি শুধু আমার ডিউটি করছি। কারও বেড়াতে যাওয়ার সবকিছু ঠিকঠাক করা আছে বলে ডিউটির তো ক্ষতি করতে পারি না !"

পোরলককে কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিচলিত বলে মনে হল।

অবশেষে তিনি বললেন "ঠিক আছে। এ এক জঘন্য বিরক্তিকর ব্যাপার, কিন্তু আপনি যদি এরকম গোঁ ধরেন তা হলে তো কিছু করার নেই— আমাকে যেতেই হবে।"

"ঠিক ধরেছেন, সার।" উত্তর দিলেন সিলভার, "ট্যাক্সিতে যেতে খুব একটা সময় লাগবে না।"

স্টেশনের বাইরে এসে ওঁরা একটা ট্যাক্সি ধরলেন।

ট্যাক্সিতে ওঠার ঠিক আগে পোরলক বলে উঠলেন, "এক মিনিট। আমাকে একটু সিগারেট কিনতে হবে।"

"আরে, আমারও তো কিনতে হবে।" সিলভার বললেন।

দশ সেকেন্ড পর পোরলক পা বাড়িয়ে ডিটেকটিভকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেই ট্রাউট মাছের মতো ছিটকে পালালেন। কিন্তু সিলভার চটপট টাল সামলে নিয়ে তাঁকে তাড়া করলেন। চোর-পুলিশ খেলা চলল খুব সামান্য সময়, আর তারপর, সংক্ষিপ্ত ধস্তাধস্তির পর একটা ধাতুর বালা শক্ত করে এঁটে দেওয়া হল অভিজাত মানুষটির কবজিতে।

"নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে এটা করলাম।" বললেন সিলভার, "এবার, যদি কিছু মনে না করেন, আমরা ব্যাঙ্কের দিকে রওনা হব।"

যানবাহনের ভিড়ে ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই মিস্টার পোরলক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

"জুন মাসে পারীর গাছের-সার-দেওয়া বড় রাস্তাগুলো বড় সুন্দর দেখায় !" তিনি বললেন। উত্তরে সি.আই.ডি. ইনস্পেক্টর মন্তব্য করলেন, "আমিও সেরকমই শুনেছি। শিগ্‌গিরই আমরা ছুটিতে যাওয়ার কথা ভাবছি, বউকে নিয়ে ওখানে ঘুরে আসব।"

ট্র্যাফিক-বাতির নির্দেশে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

"মনে হচ্ছে, আমার আর কখনও পারীতে যাওয়া হবে না।" আনমনা সুরে পোরলক বললেন।

"ব্যাঙ্কের ওই ট্রাঙ্কে আমি যা ভাবছি তা যদি থাকে তা হলে আর আপনার যাওয়া হচ্ছে না।"

"আপনার কাছে কি একটা সিগারেট হবে ?"

"সরি। আমি সিগারেট খাই না।"

মিস্টার পোরলক অদ্ভুত চোখে তাঁকে দেখলেন।

"আপনি তা হলে গোড়া থেকেই জানতেন ?"

"জোরদার আন্দাজ তো একটা ছিলই।"

"আপনার জবাব নেই, ইনস্পেক্টর। কেউ যে এটা ধরে ফেলবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। একটা খুন করতে পেরেছি ভেবে আমি নিজেই নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছিলাম। আপনি ব্যাপারটা ধরলেন কেমন করে ?"

"স্রেফ রুটিন।" মন্তব্য করলেন সিলভার। "আপনি বড় বিনয়ী। মানতেই হয় আপনার প্রতিভা আছে।"

"প্রতিভা ? ইয়ে, মানে, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে ওসব ব্যাপারকে আমরা খুব একটা পাত্তা দিই না, সার। শৌখিন কায়দা-কানুনের কোনও সময় আমাদের নেই। স্রেফ ঘাম ঝরিয়ে হাল না ছেড়ে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছে যাই।"

"নিশ্চয়ই আমি কোথাও কোনও ভুল

করেছি। আমার কৌতূহলটা একটু মেটাবেন না ?"

"শুনলে আপনি হয়তো খুশি হবেন, সার, আপনি বেশ গুছিয়েই কাজ করছিলেন। ক্যাভেন্ডিশকে আপনি খুন করলেন কেন ? প্রথমে মোটিভ খুঁজে বের করে তারপর পেছন দিকে হেঁটে যাওয়াটাই আমাদের তদন্তের ঢঙ, কিন্তু এক্ষেত্রে"

"মোটিভ ছিল আমার একটা গোপন ব্যাপার ইনস্পেক্টর। ক্যাভেন্ডিশই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি হঠাৎ করে ব্যাপারটার আঁচ পেয়ে যেতে পারতেন, আর তার ফল হিসেবে আমাকে লম্বা সময়ের জন্যে জেলে যেতে হত। উনি যে সত্যি সত্যি ব্যাপারটা সন্দেহ করেছিলেন তা নয়, তবে বিপদের ভয় ছিল। ওঁকে পথ থেকে সরাতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। নেহাত আপনি গোঁ না ধরলে উনি ওই বন্ধ ট্রাঙ্কে বন্দি হয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্যে নিজেরই ব্যাঙ্কের স্ট্রংরুমে পড়ে থাকতেন। স্ট্রংরুমে রেখে যাওয়া জিনিস নিয়ে ব্যাঙ্ক কখনও মাথা ঘামায় না। মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ নিজেই আমাকে এই আইডিয়াটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। মাস ছয়েক পর যখন ব্যাপারটা সবাই প্রায় ভুলে যেত, তখন ট্রাঙ্কটা বের করে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করব ভেবেছিলাম। আমার কাছে প্ল্যানটা নিখুঁত মনে হয়েছিল। আমার ভুলটা কোথায় হয়েছিল বলুন তো ?"

গতানুগতিক গলায় সিলভার বললেন, "সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয় না আপনার কোথাও ভুল হয়েছে— মানে, আপনার ছক অনুযায়ী কোথাও ভুল হয়নি।"

"আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসেন তখনও আমার ব্যবহার খুব স্বাভাবিক ছিল।"

"খুবই স্বাভাবিক। আপনি যে ব্যাপারটায় পার পেয়ে যাননি সেটা নিতান্তই একটা তাজ্জব কাণ্ড। ওই যে, আমি বলছিলাম না, আমরা কিছুতেই হাল ছাড়ি না। তারপর, আজ হোক আর কাল হোক, তুচ্ছ বিচিত্র কোনও সূত্র আমাদের হাতে এসে যায়। তা থেকে শেষ পর্যন্ত হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না, তবুও আমরা সেটার শেষ না দেখে ছাড়ি না।"

"কোন তুচ্ছ বিচিত্র সূত্র আমার সর্বনাশ ডেকে নিয়ে এল, জানতে পারি ?"

"প্রথমে তো আপনি মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে আপনার ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে এক গ্লাস পুরনো নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডি খাওয়ালেন। তারপর, যখন তিনি সেই ব্র্যান্ডি চেখে দেখেছিলেন— মনে রাখবেন, এটা নিতান্তই আমার অনুমান— তখন আপনি তাঁর মাথায় এক ঘা কষিয়ে দিলেন।"

"না, আপনার অনুমানে এতটুকু ভুল নেই।"

"যাই হোক, এটাই আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়েছিল। তারপর আপনি ওঁকে খতম করে ঢুকিয়ে দেন ট্রাঙ্কের মধ্যে। এই ট্রাঙ্কটা আগেও আপনি বহুবার ওই ব্যাঙ্কের স্ট্রং রুমে জমা দিয়েছিলেন। সুতরাং সেখানকার কেরানিরা নেহাত অভ্যাসবশেই ওটা নিয়ে নেবে।"

"কেন নেবে না, বলুন ?"

"অবশ্যই। আপনি তো জানেন আপনাদের ফ্ল্যাট-বাড়িতে একজন রাতের দরোয়ান ডিউটিতে ছিল। সে আপনাকে আর মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছে। সুতরাং আপনার মনে হয়েছিল, মিলিগান— মনে, ওই দরোয়ান— যদি মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দ্যাখে তা হলে আপনি ডবল নিশ্চিন্ত হবেন।"

"বলে যান, শুনেছি।"

"আপনার আর মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের চেহারা অনেকটা একই রকম। আপনাদের হাইট প্রায় সমান, আর মুখেও মিল ছিল কিছুটা। শুধু তফাতের মধ্যে ওঁর গোঁফ ছিল আর আপনার মুখ দাড়ি-গোঁফহীন পরিষ্কার। তা ছাড়া ওঁর চোখে ছিল সোনালি ফ্রেমের চশমা, আপনার ছিল না। আগে থেকে তৈরি করে রাখা একটা নকল গোঁফ আপনি নাকের নীচে বসিয়ে নিলেন, ওঁর চশমাটা চোখে লাগিয়ে নিলেন, আর ভুরুজোড়া ওঁর মতোই ঘন করে নিলেন। আপনি ভেবেছিলেন, লিফ্‌টের কলিং-বেল টিপলে মিলিগান লিফ্‌ট ওপরে নিয়ে আসবে। ওর সঙ্গে লিফ্‌টে করে নামাটা যথেষ্ট ঝুঁকির ব্যাপার হবে। তাই মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের হ্যাট-কোট পরে ওঁর ছদ্মবেশে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আপনি বেরিয়ে এলেন রাস্তায় ?"

"একদম ঠিক বলেছেন।" মিস্টার পোরলক মন্তব্য করলেন, "আমার ধারণা, ছদ্মবেশটা কাজে দিয়েছিল। পরে আমি ক্যাভেন্ডিশের ওভারকোটের পকেটে কয়েকটা পাথরের টুকরো সমেত টুপিটা ঢুকিয়ে দিয়ে টেম্‌স নদীতে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম— ভেবেছিলাম ওটা ডুবে যাবে।"

"হয়তো আপনি ঠিকই ভেবেছিলেন।" সিলভার সায় ছিলেন।

"আমি ভোর চারটের সময় ফ্ল্যাটে ফিরে আসি। জানতাম, তখন ওই রাতের দরোয়ান রোজকার মতো চেয়ারে বসে ঝিমোবে। আমি ঠিক জানি, ও আমাকে তখন দেখতে পায়নি। আর দেখলেও বা কী— আমি প্রায়ই ওরকম দেরি করে ফিরে আসি।"

"না, মিস্টার পোরলক, তখন ফিরে আসার সময় মিলিগান আপনাকে দেখতে পায়নি।"

"তা হলে আমার পা ফসকাল কোথায় এখনও বুঝতে পারছি না।"

"এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।" সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টর মন্তব্য করলেন, "আমিও ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি অনেক পরে। আমরা জানতাম, মিস্টার ক্যাভেন্ডিশকে শেষ জীবিত দেখেছে রাতের ওই দরোয়ান। সেইজন্যই বেশ কয়েকবার ওর সঙ্গে আমি কথা বলেছি। শেষে ও একটা ভারী অদ্ভুত ব্যাপারের কথা বলেছে। এটা ও তেমন জরুরি বলে ভাবেনি। এমনিতে লোকটা খুঁটিয়ে সবকিছু খেয়াল করার লোক নয়। তবে ওর অভ্যেস হল সবসময় লোকের হাতের দিকে দেখা। যেমন, আমার অভ্যেস পায়ের দিকে দেখা। এক-একজনের এক-একরকম অভ্যেস। মিলিগান বলেছে, মিস্টার ক্যাভেন্ডিশ বেরিয়ে যাওয়ার সময় ও ওঁর হাতের দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর মনে হয়েছিল, হাত দুটো যেন অনেকটা আপনার মতো দেখতে—লম্বা, সরু আঙুল—আর্টিস্টদের ধরনের। তাতে আমার মনে হল, ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। খোঁজ নিয়ে জানলাম, মিস্টার ক্যাভেন্ডিশের হাত ছিল চওড়া, বেঢপ। ব্যস, তখনই মনে হল, কিছু একটা হদিস পেয়ে গেছি।"

"সেটা কবে ?"

"কাল বিকেলে। তারপর থেকেই আমরা আপনার ওপরে কড়া নজর রেখেছি। আপনি ডেডবডিটা নিয়ে কী করেছেন তা আমাদের জানার কোনও উপায় ছিল না। ওটা যে আপনি ফ্ল্যাটেই রেখে দিয়েছেন তা ভাবিনি—যদিও আপনার ফ্ল্যাটটা সার্চ করে দেখব বলে ভাবছিলাম। যদি আপনি ট্রাঙ্কগুলো দিনকয়েক আগেও সরিয়ে ফেলতেন, তা হলে আমরা বোধ হয় এখনও গোলকধাঁধায় ঘুরে মরতাম। কিন্তু আমাদের লোক আজ সকালে ওগুলো আপনার ফ্ল্যাট থেকে বের করতে দেখেছে। আর তারপর—তারপর বাকিটা তো ছকবাঁধা রুটিনমাফিক কাজ।"

ওঁদের ট্যাক্সিটা ব্যাঙ্কের কাছে এসে থামল। পোরলককে সঙ্গে নিয়ে ইনস্পেক্টর সিলভার নামলেন ট্যাক্সি থেকে। ওঁদের দেখে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ওঁরা দুজনেই জানেন ওই ট্রাঙ্কের ভেতরে কী পাওয়া যাবে।

অনুবাদ : অনীশ দেব

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

কাফে রয়্যালে গণ্ডগোল

ক্ল্যারেন্স রুক

কর্নেল ম্যাথুরিন অপরাধীদের জগতে মূর্তিমান শয়তান। অন্তত এই নামের আড়ালেই সে ডেট্রয়েটে এক দুঃসাহসিক ব্যাঙ্ক-ডাকাতি করেছিল এবং সেই ডাকাতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্যাঙ্ক-ম্যানেজারের শোচনীয় মৃত্যু। পুলিশ মহলের ধারণা, মেলবোর্নের কয়েকটি নামকরা জালিয়াতির ঘটনার নেপথ্যে রোসিটার নামে যে লোকটির নাম পাওয়া যায়, সে অন্য নামে ম্যাথুরিন স্বয়ং। এ ছাড়া মিডল্যান্ডের এক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডে লাভবান হয়েছিল এই ম্যাথুরিন, আর ঘটনার নাটের গুরু ছিল সে নিজেই। যেন একই সময়ে রহস্যময়ভাবে সব জায়গাতেই সে হাজির।

এহেন ম্যাথুরিন বেশ কয়েক বছর ধরে পুলিশের চোখে খুলো দিয়ে বেড়াচ্ছিল। আর সত্যি কথা বলতে কী, সকলেই জানে ম্যাথুরিন অপরাধীদের মধ্যে সবচেয়ে বেপরোয়া। তাই প্রাণ থাকতে পুলিশের হাতে ধরা দেবে না। অনুচরদের মাধ্যমেই সে কাজ চালাত। অনুচরেরা তার গতিবিধির কথা দূরে থাক, তাকে কেমন দেখতে তাই-ই জানত না। পুলিশের কাছে তার পরিচয় সম্পর্কে যেটুকু তথ্য ছিল, তা অত্যন্ত ঝাপসা।

ম্যাথুরিনকে তার ঘনিষ্ঠ অনুচররা ছাড়া আর দু'জন মাত্র দেখলে হলফ করে চিনতে পারতেন। এঁদের মধ্যে একজন ডেট্রয়েটের সেই হতভাগ্য ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার, যাঁকে ম্যাথুরিন নিজের হাতে তাঁর বাগদত্তার চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করেছিল। দ্বিতীয়জন সেই মহিলা। পরবর্তীকালে তাঁর সাহায্যেই ম্যাথুরিনকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য আমেরিকায় নিয়ে আসা হয় এবং সেখানে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়। সাধারণ দর্শকের কাছে এই গ্রেফতারের ঘটনা ছিল নিতান্তই গতানুগতিক। সম্পূর্ণ কাহিনীটি আমি টুকরো-টুকরোভাবে দু'জনের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। তাঁদের মধ্যে একজন এক ডিটেকটিভ সার্জেন্ট। তাঁর সঙ্গে আমার ওয়েস্টমিনস্টারের কাছে এক সরাইখানায় আলাপ হয়েছিল। দ্বিতীয়জন হলেন ভ্যান স্নুপ নামের এক তরুণী।

সেদিনটা ছিল উজ্জ্বল আর মনোরম। সময় প্রায় দেড়টা। এক্কাগাড়ি চড়ে এক তরুণী রিজেন্ট স্ট্রিট দিয়ে আসছিলেন। পোর্টল্যান্ড স্টেশনের কাছে তাঁর বোর্ডিং হাউস, সেখান থেকেই তিনি ভাড়া করেছিলেন গাড়িটা। ঘোড়া জোরে ছুটলে তাঁর ভয় করে! তাই তরুণীটি গাড়োয়ানকে ধীরে-ধীরে গাড়ি চালাতে বলেছিলেন। অলস চোখে চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন তিনি। তাঁর মুখে ছিল নতুন আসা মানুষের কৌতূহল। এমনিতেই মানুষের

ভিড়ে রিজেন্ট স্ট্রিট সবসময় গমগম করে। রোদ্দুর ঝলমল করছিল সেদিন, সকলকে খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। মহিলারা কেনাকাটা সারছিলেন, দোকানের শো-কেসের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কাজকর্মে ব্যস্ত মানুষজন চলাফেরা করছিলেন এদিক-ওদিক। ফুলওয়ালিরা হাঁকছিল, "মাত্র এক পেনিতে এক গোছা সুন্দর ভায়োলেট, মিষ্টি ভায়োলেট নিয়ে যান।" এক্কাগাড়ির তরুণী সিটে হেলান দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সব দেখছিলেন। ওঁকে ঠিক সুন্দরী বলা চলে না। কারণ, ওঁর সবলীল শরীরের সঙ্গে ঠোঁটের কঠিন রেখা কেমন যেন বেমানান ঠেকছিল। কিন্তু ওঁর চুল এত কালো, যেন অন্ধকার। আর ধূসর নীল চোখের সঙ্গে সাধারণের কোনও তুলনা চলে না।

কাফে রয়্যালের ঠিক বাইরে ছোট্ট জটলা, ক্ষণিকের জন্য পথচারীরা থমকে গেছেন। একটি ব্রুয়াম গাড়ি থেমে গেল, তারপর একটি ভিক্টোরিয়া, আর তার পেছনে একটি হ্যানসম গাড়ি। তরুণী ব্রুয়ামের ভেতরে বসা জোড়ের মাথার পাশ দিয়ে তাকালেন। দেখলেন, সিঁড়ির ধাপে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ পেছনে হেলে গিয়ে যুবতী গাড়ির ছাদের খিড়কি দরজা খুলে ফেললেন। গাড়োয়ানকে বললেন, "রোককে, রোককে। এইখানেই নামব।"

গাড়োয়ান গাড়ি থামাল। তরুণী নেমে পড়লেন, তারপর গাড়োয়ানের হাতে একটি আধক্রাউনের মুদ্রা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "আগে নেমে পড়ার জন্য আশা করি তোমার লোকসান হবে না।"

যুবতীর উচ্চারণে আমেরিকান টানের সামান্য ছোঁয়াচ, গাড়োয়ান মুদ্রাটি পকেটে ভরে 'ধন্যবাদ' জানিয়ে হাসল।

ইতিমধ্যে তরুণীটি ধীরে-ধীরে পেছনে হেঁটে কাফে রয়্যালের দিকে এগিয়ে গেছেন। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজনদের এক ঝলক দেখে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। দু-একজন মানুষ ভুরু কোঁচকাল, কিন্তু তরুণীটি ভ্রূক্ষেপ না করে লাঞ্চ রুমের দিকে পা চালালেন।

লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ একজন মন্তব্য করল, "বাজি ধরো। এ আমেরিকান। এরা যেখানে খুশি যায়, যা খুশি করে।"

তরুণীটি ভেতরে পা রাখতেই দেখলেন, তাঁর সামনে পরিষ্কার দাড়িগোঁফ-কামানো একজন লম্বা লোক। পরনে নিখুঁত চকচকে সিল্কের পোশাক আর ফ্রক কোট, বাটনহোলে ফুল। লোকটি একটি পছন্দসই টেবিলের খোঁজে চারদিকে তাকাল। লোকটি ইতস্তত করছে দেখে তরুণীটিও ইতস্তত করলেন। তারপর দু'জনের জন্য পাতা ছোট্ট একটি টেবিল, ওয়েটার হাত নেড়ে লোকটিকে দেখাতেই তরুণীটি চট করে লোকটির পেছনের টেবিলে বসে পড়লেন।

"মাফ করবেন, ম্যাডাম।" ওয়েটার বলল, "এটা চারজনের টেবিল। আপনি যদি কিছু মনে না করেন...।"

তরুণীটি বললেন, "না। আমি এখানেই বসব," তাঁর চকিত চাউনি আর ওয়েটারের হাতের তালুতে ধাতব কিছুর অনুভূতির ফলে বোঝা গেল যে, এর পর ওঁকে আর কেউ বিরক্ত করবে না।

রেস্টুরেন্টে এত ভিড় যে, আর জায়গা নেই। কেউ একা, কেউ জোড়ায়, কোথাও তিনজন আর কোথাও বা তার চেয়ে বড় দল। একা একটি টেবিলে বসে শান্তভাবে মেনুর পাতা ওলটাতে থাকা তরুণীটির দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি আছড়ে পড়ছিল। কিন্তু মনে হচ্ছিল, তরুণীটির এসবে কোনও খেয়ালই নেই। এক সময়ে খাবারের প্লেট থেকে তরুণীটি চোখ তুললেন। ওঁর নজর স্থির হল, সামনে বসা লম্বা লোকটির পিঠের ওপর। লোকটি খাবারের সঙ্গে আধ বোতল শ্যাম্পেন শেষ করেছিল। এবার সে কফির সঙ্গে সুগন্ধি পানীয়ও আনতে বলল। তরুণীটি এক গ্লাস সোডা খেয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে কপালে ভাঁজ ফেললেন। হঠাৎই তরুণীটি ওয়েটারকে ডাকলেন, "আমাকে একটুকরো কাগজ এনে দাও, সঙ্গে বিলটাও।"

ওয়েটার একটুকরো কাগজ এনে তরুণীটির সামনে রাখল। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করার পর তরুণীটি পেন্সিল দিয়ে কাগজটির ওপর কিছু লিখতে শুরু করলেন। লেখা শেষ করে তিনি কাগজটিকে সযত্নে ভাঁজ করে মানিব্যাগের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর বিল মিটিয়ে, ব্যাগটি কোটের পকেটে ঢুকিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে দাড়িগোঁফ কামানো লোকটি তার বিল মিটিয়ে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। লোকটির পিঠের ওপর লক্ষ স্থির রেখে তরুণীটি দস্তানা পরে নিলেন। একসময়

লোকটি উঠে দাঁড়াল। তরুণীটির টেবিলের পাশ দিয়ে সে যখন যাচ্ছিল, তখন ও দেওয়ালে ঝোলানো আয়নার দিকে তাকিয়ে চুল ঠিক করতে ব্যস্ত ছিল। লোকটি এগোতেই যুবতী তাকে অনুসরণ করলেন। এইভাবে একজন অপরিচিত পুরুষ ও মহিলা একই সঙ্গে কোনও রেস্তরাঁয় ঢুকবে, আবার একসঙ্গে অদ্ভুতভাবে বেরিয়ে যাবে, এ নিয়ে পাশের টেবিলের এক দম্পতি মন্তব্য করল।

কিন্তু বাইরে যা ঘটল তা আরও অদ্ভুত।

দরজার সিঁড়ির ধাপে লোকটি এক মুহূর্তের জন্য থামল, হাতে বাঁশি নিয়ে একজন দরোয়ান একজন পুলিশের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। লোকটিকে দেখে সে ঘুরে দাঁড়াল। "হ্যানসম গাড়ি, সার ?" সে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ," লোকটি বলল।

দরোয়ানটি সবেমাত্র বাঁশিটি ঠোঁটে ছোঁয়াতে যাবে, তার নজর পড়ল তরুণীর ওপর।

"আপনার কি কোনও গাড়ি চাই, ম্যাডাম ?" জিজ্ঞেস করে সে বাঁশিতে ফুঁ দিল।

উত্তরের আশায় দরোয়ান আবার ঘুরে দাঁড়াতেই হতভম্ব হয়ে স্পষ্ট দেখল, দাড়িগোঁফ-কামানো লোকটির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা যুবতী লোকটির কোটের ভেতরে হাত ঢোকালেন, চট করে কিছু একটা বের করে নিয়ে নিজের পকেটে চালান করে দিলেন।

"হ্যাঁ... আমি...।" বলতে-বলতে লোকটি পকেটে হাত দিয়ে দেখে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল।

দরোয়ান মেয়েটির পথ আগলে লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কি কিছু হারিয়েছে সার ?"

এদিক-ওদিক তাকিয়ে লোকটি বলল, "হ্যাঁ, আমার সিগারেট কেসটা পাচ্ছি না।"

পুলিশটি সামনে এগিয়ে এসে বললেন, "ব্যাপারটা কী ?"

দরোয়ান বলল, "আমি স্পষ্ট দেখেছি, এই মহিলা এই ভদ্রলোকের পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন।"

"ও ! ব্যাপারটা তা হলে এই !" মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে পুলিশটি বললেন, "যা ভেবেছি তাই।"

লোকটি বলল, "সোজা পথে এসো। আমি ঝামেলা চাই না। চুপচাপ সিগারেট কেসটা ফেরত দাও, তা হলে এ নিয়ে আর কোনও ঝঞ্ঝাট হবে না।"

"আমি নিইনি। এসব কথা বলার সাহস হয় কী করে আপনার ? আমি আপনার পকেট ছুঁইনি পর্যন্ত।"

লোকটির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

দরোয়ান বলল, "কেন মিথ্যে কথা বলছেন ?"

পুলিশটি বললেন, "ওসব চালাকি ছাড়ো। তোমাকে আমার সঙ্গে থানায় আসতে হবে। সার, আমরা বরং একটা চার চাকার গাড়ি নিই।"

রাস্তার কিছু লোক কৌতূহলী হয়ে জুটে গেল রেস্তরাঁর দরজার সামনে।

একটি চার চাকার গাড়ি ডাকা হল। মেয়েটি উঠে পড়ল। পিছু-পিছু পুলিশ এবং লোকটিও।

"আমি জীবনে এমনভাবে অপমানিত হইনি।" মেয়েটি গজগজ করতে লাগলেন।

এত কাণ্ড সত্ত্বেও মেয়েটি ধীরস্থিরভাবে বসে রইলেন। যেন যে-কোনও পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিনি সবসময় তৈরি। অন্যদিকে পুলিশটি ওঁর ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখলেন, যাতে কোনওরকমে চালাকি করে চুরি-করা জিনিসটাকে সরিয়ে ফেলতে না পারেন।

থানায় গিয়ে নিয়মমাফিক সব কাজ শেষ করা হল। ফরিয়াদির ভূমিকা নিল দাড়িগোঁফ কামানো লোকটি। কিন্তু মেয়েটি সব অভিযোগ জোর গলায় অস্বীকার করলেন।

ইনস্পেক্টর ইন চার্জ ধন্দে পড়ে গেলেন। তিনি বললেন, "বেশ, তা হলে ওকে তল্লাশ করো।"

মেয়েটিকে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে একজন মহিলা ওঁকে তল্লাশ করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

যে মুহূর্তে দরজা বন্ধ হল সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট কেসটি বের করে টেবিলে রাখলেন।

মহিলা পুলিশটি বেশ অবাক হয়ে বললেন, "এই তো ! তা হলে তুমি ফাঁসলে !"

তরুণী দু'হাত তুলে বললেন, "এবার আমার ও-পকেটটা হাতড়ে মানিব্যাগটা বের করুন।"

মহিলাটি ওঁর মানিব্যাগ বের করলেন।

"ব্যাগটা খুলুন, ভেতরে একটা কাগজের টুকরো। ওতে কী লেখা আছে পড়ুন।"

ওয়েটারটির দেওয়া কাগজের টুকরোয় তরুণীটি যা লিখেছিলেন, মহিলাটি নিচুগলায় সেটা বিড়বিড় করে পড়তে লাগলেন, "কোনওরকম ঝামেলাঝঞ্ঝাট না করে লোকটিকে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি ওর পকেট মারব। লোকটি কর্নেল ম্যাথুরিন, ওরফে রোসিটার, ওরফে কোনেল। ওকে ডেট্রয়েট, নিউ ইয়র্ক, মেলবোর্ন, কলম্বো এবং লন্ডনের পুলিশ খুঁজছে। লোকটিকে আচমকা কাবু করার জন্য চারজন লোক ডেকে আনুন। কারণ এ সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক। আমি নিউ ইয়র্কের ডিটেকটিভ বিভাগের এক কর্মী, নোরা ভ্যান স্নুপ।"

তল্লাশ করছিলেন যে-মহিলাটি, কাগজটি পড়ার পর মুখ তুলে তাকাতেই মিস ভ্যান স্নুপ বললেন, "এটি এক্ষুনি তোমার বসকে দেখাও।" মহিলাটি দরজা খুলে বাইরে গিয়ে ফিসফিস করে ইনস্পেক্টরের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তারপর কাগজটা হাতে নিয়ে ইনস্পেক্টরের ঘরে এসে ঢুকলেন।

মিস ভ্যান স্নুপ বললেন, "এখন চটপট কাজ সারুন। আপনার চিন্তার কিছু নেই, আমার পরিচয়পত্র সঙ্গেই আছে।" কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি অন্য একটি পকেটে হাত ঢোকালেন।

ইনস্পেক্টর বললেন, "আপনি কি নিশ্চিত যে, এই লোকটিই ডেট্রয়েটের ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে গুলি করেছিল ?"

"হা ভগবান। আপনি কী বলছেন ! আমি নিজের চোখে একে উইল স্টিভেন্সকে গুলি করতে দেখেছি। আমি তো একে খুঁজে বের করার জন্যই পুলিশে চাকরি নিয়েছি।"

তরুণী মেঝেতে উত্তেজিত হয়ে পা ঠুকলেন। অগত্যা, ইনস্পেক্টর বেরিয়ে গেলেন। দু-চার মিনিট ভ্যান স্নুপ কান পেতে শুনলেন। তারপর একটা চাপা চিৎকার ওঁর কানে এল। তার দু' মিনিট পরে ইনস্পেক্টর আবার এসে ঘরে ঢুকলেন।

"আপনি ঠিকই ধরেছেন। লোকটিকে শনাক্ত করার মতো প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু এর আগে আপনি কেন ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেননি ?"

"আমি ওকে নিজে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলাম। উইল ! ও ! উইল !" ফুঁপিয়ে উঠলেন মিস ভ্যান স্নুপ।

মিস ভ্যান স্নুপ একটা বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে টেবিলের ওপর মাথা রেখে কেঁদে উঠলেন। আধঘণ্টা পরে থানা থেকে বেরিয়ে পোস্ট অফিসের দিকে হাঁটা দিলেন। সেখান থেকে টেলিগ্রাম করে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন নিউ ইয়র্কের ডিটেকটিভ বিভাগের বড়কর্তার কাছে।

ক্ল্যারেন্স রুক ছিলেন লন্ডননিবাসী আমেরিকান লেখক। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই, 'হুলিগান নাইটস', প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। লন্ডনের অপরাধজগতের নানা ঘটনার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল এই বইটি। ১৯১৫ সালে ক্ল্যারেন্স রুক মারা যান।

অনুবাদ : অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

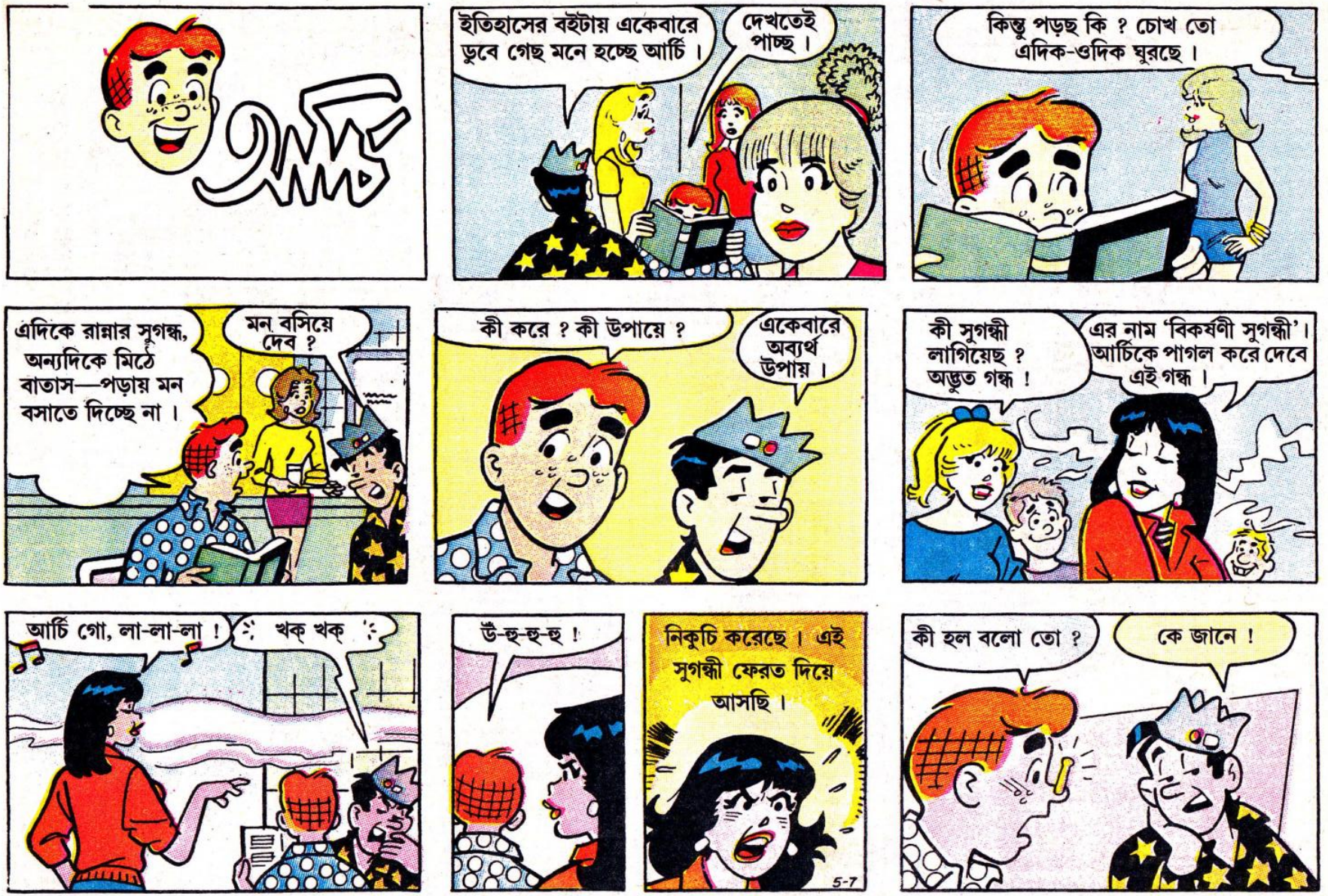
আর্চি
ইতিহাসের বইটায় একেবারে ডুবে গেছ মনে হচ্ছে আর্চি।
দেখতেই পাচ্ছ।
কিন্তু পড়ছ কি ? চোখ তো এদিক-ওদিক ঘুরছে।
এদিকে রান্নার সুগন্ধ, অন্যদিকে মিঠে বাতাস—পড়ায় মন বসাতে দিচ্ছে না।
মন বসিয়ে দেব ?
কী করে ? কী উপায়ে ?
একেবারে অব্যর্থ উপায়।
কী সুগন্ধী লাগিয়েছ ? অদ্ভুত গন্ধ !
এর নাম 'বিকর্ষণী সুগন্ধী'। আর্চিকে পাগল করে দেবে এই গন্ধ।
আর্চি গো, লা-লা-লা !
খক্ খক্
উঁ-হু-হু-হু !
নিকুচি করেছে। এই সুগন্ধী ফেরত দিয়ে আসছি।
5-7
কী হল বলো তো ?
কে জানে !

কিট্টুর রোমহর্ষক কীর্তি

হিমানীশ গোস্বামী

আদারাপাড়া লেনে সুপ্রিয়াপিসির বাড়িতে আজ প্রায় উৎসবের আবহাওয়া। সুপ্রিয়াপিসি নাকি এমন চিনে খাদ্য নিজে তৈরি করেছেন, যেটি নাকি কিট্টুর বন্ধু অভিভারক ঝাড়ুদার এবং পাচক শেয়ালমামার রান্নার চেয়ে একশো একুশ গুণ ভাল ! এই খাদ্য খাওয়ার জন্য তিনি কিট্টুকে এবং 'শেয়ালমামা'কে রাত্রে নেমন্তন্ন করেছেন। সারাদিন ধরে তিনি আর নিয়তিমাসি রান্নাবান্না করেছেন। উপলক্ষ আরও একটা ছিল, সেটা হল কোনও এক ক্যাসেট কোম্পানি মিহিরের দুটি কবিতায় সুর দিয়ে সেই ক্যাসেট বাজারে ছেড়েছে। অবশ্য কেবল মিহির নয়, সঙ্গে আরও তিনজন কবিরও দুটি করে কবিতাকে গান করা হয়েছে। এই বাবদ মিহির নাকি নগদ পাঁচশো টাকা পেয়েছে। সুপ্রিয়াপিসি কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করেন না। তিনি টেপ শুনে বলেছেন, এর জন্য কেউ একটি পয়সাও দিতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মিহিরই টাকা দিয়ে ক্যাসেট করেছে। টাকা ফেললে কলকাতায় সব করা যায় !

যাই হোক, এই বাবদ মিহির আরও দু'জনকে নেমন্তন্ন করেছিল, এবং খাওয়াদাওয়া চলেছিল রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। সুপ্রিয়াপিসির রান্না খেয়ে বাঘাকাকাও নাকি খুব তারিফ করেছেন। বলেছেন, এত চমৎকার রান্না, ঠিক যেন কলকাতার কোনও বিখ্যাত চিনে দোকানের রান্না। এই গোলমালের মধ্যে কিট্টুর পিসেমশাই শান্তিরঞ্জনবাবু একবার মাত্র দু'মিনিটের জন্য এসে এক প্লেট খাদ্য, একটা কাঁটা আর একটা চামচ নিয়ে সোজা ওপরে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর এইরকম গোলমাল হইহুল্লোড় একদম পছন্দ হয় না। শুধু ওপরে যাওয়ার সময় কিট্টুর কানে কানে বলে গিয়েছিলেন, যত দেরিই হোক না কেন, বাড়ি ফেরার আগে কিট্টু যেন একা তাঁর সঙ্গে দেখা করে। একটা জরুরি দরকার আছে।

সকলে চলে যাওয়ার পর কিট্টু বাঘাকাকাকে বলল, "তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

সুপ্রিয়াপিসি কিট্টুকে বললেন, "তোর পিসে সারাদিন গুম হয়ে রয়েছেন, কারও সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলছেন না। চিরকালই উনি ওইরকম, যেন কারও সঙ্গে কথা বললে

মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়! তা তোর ভাগ্যি ভাল, তোর সঙ্গে কথা বলতে চান। বোধ হয় ঐতিহাসিক কোনও তথ্য ভুল বলে তিনি প্রমাণ করে ফেলেছেন। হয়তো শুনবি সিপাইরা নাকি মোটেই বিদ্রোহ করেনি, ব্রিটিশরা সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা লিখে গেছে, কিংবা ওইরকমই আজগুবি কিছু।"

কিট্টু ওপরে যেতেই শান্তিরঞ্জনবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। তিনি বললেন, "একটা ব্যাপার ঘটে গেছে বলে মনে হচ্ছে কিট্টুবাবু! তোমার মনে পড়ছে আমার এক দক্ষিণ ভারতীয় বন্ধু কে. ভি. রামকৃষ্ণ নারায়ণস্বামী আমাদের এই বাড়িতে দু'দিন ছিলেন? বয়স অনেক হলেও দেহের আর মনের শক্তি ছিল তাঁর প্রভূত পরিমাণেই। মনে পড়ছে?"

"হ্যাঁ পিসেমশাই!" কিট্টু বলল, "মনে পড়ছে ভাল করেই। উনি জনজীবনে সুস্থতা আনার জন্য আন্দোলন করছিলেন, বলেছিলেন তিনি নিজেই।"

"ঠিক!" বললেন শান্তিরঞ্জনবাবু। তারপর গলাটা বেশ আস্তে করে বললেন, "তিনি দিন পনেরো আগে আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ভীষণ উত্তেজিতভাবে তিনি বলেছিলেন, তিনি একটি র‍্যাকেটের সন্ধান পেয়েছেন। মানে কিছু ঠক আর জোচ্চোর নাকি এই অঞ্চলের লোকদের ঠকাচ্ছে লক্ষ-লক্ষ টাকা! যাই হোক, দরকার হলে আমি ওঁকে সাহায্য করতে পারি কিনা জানতে চাইলে আমি বলি, নিশ্চয়ই পারব। আমি তাঁকে বলি তোমার কথা। তা নারায়ণস্বামী খুব খুশি হয়ে বললেন, তিনি দু-তিনদিনের মধ্যেই এসে ফের দেখা করবেন। তিনি বললেন, আপাতত আলিপুর রোডের শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসে উঠেছেন। কিন্তু তিনি তিনদিন পরে এলেন না। আমি আর খোঁজখবর কিছু করিনি, কেননা নারায়ণস্বামী লোকটিই ছিলেন একটু খেয়ালি। ওঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, কিন্তু আজ সকালে খবরের কাগজে ওঁর ছবি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি। নারায়ণস্বামীকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে গঙ্গায় শ্রীরামপুরের ঘাটের কাছে। পুলিশ ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। পুলিশ অবশ্য জানে না এঁর পরিচয়। আমার মনে হয় ইনিই নারায়ণস্বামী। তুমি দ্যাখো তো কিট্টু, তোমারও তাই মনে হয় কি না?"

কিট্টু ছবিটিকে মনোযোগ দিয়ে দেখল। বলল, "হ্যাঁ, এটা তাঁর ছবিই বলে মনে হয়, যদিও মুখটা অনেক ফোলা আর বিকৃত। আপনি কি পুলিশকে জানিয়েছেন কিছু?"

শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, "ভেবেছিলাম ফোন করব একটা, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি একটু ভয়ই পেয়ে গেলাম। কী থেকে কী হয় কে জানে ভেবে কিছুই করিনি। ভেবেছিলাম আজ তো তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছেই, তখন তোমার সঙ্গেই পরামর্শ করে যা হোক কিছু করা যাবে। তুমি কী বলো?"

কিট্টু বলল, "শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসে একবার খবর নিলে কিছুটা বোধ হয় হদিস পাওয়া যাবে। ওঁর বাড়িতেও একটা ফোন করে দেখলে হয়। ওঁর বাড়ির ঠিকানা তো আপনার জানা আছে।"

শান্তিরঞ্জন বললেন, "ছিল। একটা পুরনো ডায়েরিতে লেখা ছিল, সে-ডায়েরিটা এই ঘরেই কোথাও হারিয়ে আছে, পাচ্ছি না।"

কিট্টু দেখল বড় ঘরটির প্রায় সর্বত্রই বই, না হয় নানা কাগজপত্রে ভরা। ওর মধ্যে একটা বিশেষ ডায়েরি খুঁজে পাওয়া সহজ নয়।

কিট্টু বলল, "শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসেই ওঁর ঠিকানা পাওয়া যাবে। গেস্ট হাউসে থাকতে গেলে প্রথমেই বড় খাতায় ওসব লিখতে হয়।"

শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, "আজ রাত হয়ে গেছে, কাল তা হলে একটু খোঁজখবর করো। ছবি দেখে তো মনে হচ্ছে ওটি নারায়ণস্বামীরই ছবি। তা ছাড়া ওঁর হদিস নেই, আসবেন বলেও এলেন না, এদিকে ওঁর মতো দেখতে একজনের মৃতদেহ!"

কিট্টু বেরিয়ে যাচ্ছিল, সুপ্রিয়াপিসি আটকালেন, "ওরে কিট্টু, খুব যে চোরের মতো সরে পড়ছিস, বলি ব্যাপার কী? তোর পিসে তো কারও সঙ্গে কথা বলে না, হঠাৎ তোর সঙ্গে আধঘণ্টা ধরে দরজা বন্ধ করে কী বলল রে?"

কিট্টু বলল, "এমন কিছু নয় পিসি। সামান্য দু-চারটে কথা।"

সুপ্রিয়াপিসির তাতে সন্দেহ গেল না। বললেন, "যত বড় হচ্ছিস তত মিথ্যে কথা বলতে শিখেছিস! তোর মতো বয়সে আমরা একটা মিথ্যে কথাও বলতাম না রে কিট্টু।"

কিট্টু বলল, "তার মানে পরে মিথ্যে কথা বলা ধরেছ!" বলে দরজা খুলে হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেল।

বাঘাকাকাকে সব কথা বলে কিট্টু সকালেই বেরিয়ে গেল আলিপুর রোডের শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসের উদ্দেশে, ফোন না করেই। কিট্টু দেখল

(এর পরে ৩৮ পাতায়)

ডানা ? ডানার আবার কী হল ?
ডানার কী হল ?.... কিছু না! শুধু আলগা হয়ে গেছে !
বলাকা ? সত্যি ? কোথায় ?
"আলগা হয়ে গেছে !" হা ! হা ! হা ! ও ! হো ! হো ! আ হা হা
কিছু মনে করবেন না । যে বিমানে আমরা উড়ছি, তার ডানা যদি মাঝ-আকাশে খসে যায়, তা হলে সেটা এত মজার ব্যাপার হয় কী করে ?
কী কাণ্ড! আমি ওই বলাকাটিকে দেখতেই পাইনি.... তবে আধুনিক বিমান এত দ্রুত ওড়ে !
বিমানের বিপদের আশঙ্কা নেই ক্যাপ্টেন । যাকে বলে দোলনা ডানা, সেটাই কাজ করছে ।
বেশ মজার! 'দোলনা ডানা' আবার কী ?
ডানাগুলো আটকানো আছে সামনের দিকে । ওগুলো সামনের দিকে নাড়ালে ওঠানামার ক্ষেত্রে বেশি সুবিধে হয় । শব্দের গতিতে উড়তে হলে ওগুলোকে মাঝামাঝি রাখেন পাইলট । সুপারসনিক ফ্লাইটে ওগুলোকে তিনি পিছিয়ে আনেন : এখন ঠিক যা হচ্ছে...
কিন্তু এবার আমরা খেলায় ফিরে যাই । আমার পরের চাল দেখুন, ক্যাপ্টেন। জি১-জি২-জি৩ ।
দশ হাজার টাইফুন! আমার যুদ্ধজাহাজে সরাসরি তিনটে আঘাত। আপনার ভাগ্য সত্যিই ভাল !
এটা স্রেফ দক্ষতা, ক্যাপ্টেন। দক্ষতা ও যুক্তি...এবার আপনার দান ।
স্পল্ডিং এত উত্তেজিত কেন ?
ও বারবার ঘড়িও দেখছে কেন... অদ্ভুত !
ই-১ ই-২ ই-৩
ও দেখছি উঠে দাঁড়াল...কেন ?
তিনটেই জলে গেল !
পাইলটের কেবিনে যাচ্ছি মিঃ ক্যারিদাস... সব ঠিকঠাক চলছে কিনা দেখতে ।
আমাকে বিরক্ত করছ কেন, স্পল্ডিং ? দেখছ না, আমি ব্যস্ত ।
এবার আমি গোলা দাগব, ক্যাপ্টেন ।
আমাদের বন্ধু স্পল্ডিংকে বিশ্বাস করা যায় বলে মনে হচ্ছে না ।

ফ্লাইট ৭১৪

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(৩৫ পাতার পর)

তিনতলা চমৎকার একটা বাড়ি, বছরদশেক হবে বাড়িটির বয়স। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন গেস্ট হাউস। সামনে একটুখানি বাগানও আছে। পাশে একটা চওড়া গলি, গেস্ট হাউসের সঙ্গে লাগানো কয়েকটি গ্যারাজ। কিট্টু রিসেপশনে ঢুকে গেল। সেখানে দেখল টাই-পরা এক যুবক বসে-বসে ঢুলছে। কিট্টু যেতেই যুবকটি সোজা হয়ে বসে বলল, "মর্নিং সার !"

কিট্টু যথাযথ শুভেচ্ছা বিনিময় করে বলল, "এখানে নারায়ণস্বামী বলে একজন দিন পনেরো আগে এসেছিলেন। তিনি কি এখনও আছেন ?"

যুবকটি বলল, "দেখি, খাতা দেখে বলতে হবে। এখানে পঁয়তাল্লিশটি ঘর আছে, সকলের খবর রাখি না তো।" খাতা দেখে যুবকটি বলল, "তিনি ছিলেন দু'রাত। তারপর তিনি ফিরে আসেননি। পাঁচদিনের অগ্রিম টাকা জমাও দিয়েছিলেন। তাঁর জিনিসপত্র তাঁর ঘর থেকে বের করে স্টোরে রেখে দেওয়া হয়েছে। আপনি কি তাঁর আত্মীয় ? তা হলে প্রমাণ দিয়ে জিনিসগুলো নিয়ে যান। প্রতিদিন দশ টাকা করে চার্জ করা হয় জিনিস ফেলে রাখলে...।"

কিট্টু বলল, "ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা দরকার ছিল। মাদ্রাজ থেকেই তো উনি এসেছিলেন ? আমার পিসেমশাইয়ের বন্ধু উনি।"

"ঠিকানা দিতে আপত্তি নেই," যুবকটি বলল, "এগারোর বাইশ, পোয়েজ গার্ডেন্‌স, চেন্নাই।"

"চেন্নাই ! সে আবার কোথায় ?"

"কিছুদিন আগেও যার নাম ছিল মাদ্রাজ।"

"ও। থ্যাঙ্ক ইউ," কিট্টু বলল। তারপর একটু ভেবে বলল, "আচ্ছা, নারায়ণস্বামীর ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র কি এখানেই পড়ে থাকবে ?"

যুবকটি বলল, "জিনিসপত্র সামান্যই। দুটো বলপয়েন্ট পেন, একটা নাম লেখা লেখার প্যাড, ছোট্ট একটা হালকা আধুনিক সুটকেস, তাতে কিছু জামাকাপড়, টেবিলে রাখা ছিল একটা শেভিংসেট, ছোট দুটো তোয়ালে, চানের ঘরের চটি, ব্যস ! তবু চিঠি লেখা হয়েছে ওঁর ঠিকানায়, সেও তো সাতদিন হয়ে গেল, উত্তর আসেনি। আপনি এইসব খোঁজখবর করছেন কেন জানতে পারি কি ?"

কিট্টু বলল, "আমি একজন শখের গোয়েন্দা। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে নারায়ণস্বামী জীবিত নেই।"

"সে কী মশাই, বলেন কী !" যুবকটি বলল, "কে খুন করল ?"

"খুন !" কিট্টু বলল, "আপনি জানলেন কেমন করে তিনি খুন হয়েছেন ? আমি তো কেবল বলেছি জীবিত নেই !"

যুবকটি একটু আমতা-আমতা করতে লাগল। কিট্টুর তাতে বেশ আমোদ হল। কিট্টু বলল, "ওঁর ডায়েরিটায়েরি কিছু ছিল কি জিনিসপত্রের মধ্যে ?"

"না।"

"কোনও লেখা ? চিঠি বা ক্যাশমেমো—"

"লেখার প্যাডের ওপর কয়েকটা টেলিফোনের নম্বর লেখা ছিল মনে হচ্ছে।"

"প্যাডটা কি আমাকে দেখাতে পারেন, নম্বরগুলো একটু টুকে নিতাম।"

"আমি বিপদে পড়ব না তো ?" যুবকটি প্রশ্ন করল।

"কথাটা আর কেউ জানলে তবেই বিপদের কথা আসে, তাই না ?" যুবকটি একটি আলমারির চাবি খুলে ফেলে তা থেকে একটা ছোট্ট প্যাড বের করল। তাতে চারটে নম্বর লেখা ছিল, নম্বরের আগে 'জি এস', 'এইচ এইচ', 'আর কে আর' এবং 'পি পি'।

টুকে নিয়ে কিট্টু বলল, "থ্যাঙ্কস। এটা কাউকে বলার দরকার নেই।" তারপর কিছু অদ্ভুত কথা লেখা ছিল, '১৬৫-এল ৯০০০ টা. ৮% ২৩০ এল ১৬,০০০ টা. ১১% সিটিভি ২৪০০০ ১২% ভিসিপি ১১,০০০, ১০%' এইরকম আরও কিছু। নারায়ণস্বামী ফ্রিজ, কালার টিভি, ভিসিপি-র দাম নোট করেছিলেন, অদ্ভুত তো ? আবার পাশে-পাশে শতকরার অঙ্কও। তিনি কি সেই চেন্নাই থেকে কলকাতায় এসেছিলেন এইসব কিনতে ?

কিট্টু তার কার্ডটি যুবককে দিয়ে শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউস থেকে বের হল। কিছু দূরে কয়েকটা ট্যাক্সি থেমে ছিল, কিট্টু একটিতে চড়ে বলল, "পার্ক সার্কাস।" ঘড়িতে তখন আটটা বেজে কুড়ি।

ন'টার মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে কিট্টু বাঘাকাকাকে বলল সব কথা। বাঘাকাকা বললেন, "আগে একটু সুস্থ হয়ে নাও, ব্রেকফাস্ট করে নাও, তারপর ভাবা যাবে।"

কিট্টু চানটান করে বেশ সতেজ হয়ে ফিরে এসে কফির সঙ্গে চিজ-ওমলেট খেতে-খেতে দুটো খবরের কাগজ মোটামুটি দেখল, কিন্তু তেমন কিছু খবর তার চোখে পড়ল না। তবে দুটো টিভির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, একটি দোকানের নাম 'জেনারেল স্টোর্স', লেনিন সরণির ঠিকানা, অন্য একটি বিজ্ঞাপনে ছিল 'কে. কে. এম্পোরিয়াম'। কিট্টু দেখল, জেনারেল স্টোর্সের টেলিফোন নম্বরের সঙ্গে নারায়ণস্বামীর লেখা একটি নম্বর মিলে যাচ্ছে, যার আগে জি এস লেখা ছিল ! কিট্টু চট করে কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে মুখ ধুয়ে ওই নম্বরে ডায়াল করল। টেলিফোন বেজেই চলল, কেউ ধরল না। তখন তার খেয়াল হল, দোকানগুলো বোধ হয় দশটার আগে খুলবে না।

বাঘাকাকা বললেন, "শোনো কিট্টুবাবু, ওই নম্বরগুলো যে কিসের, কোন দোকানের, সেটা আন্দাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে না। ওটার খোঁজখবর পরে করলেও চলবে। এখন একবার শ্রীরামপুরে গেলে বোধ হয় কিছু বোঝা যেতে পারে, যদি অবশ্য তোমার টাকা খরচ করার ইচ্ছে থাকে। একটা কথা জানো তো, এই তদন্তের ভার কেউ তোমাকে দেয়নি ?"

"কথাটা ঠিক নয়, পিসেমশাই তো তদন্তের ভার দিয়েছেন !"

বাঘাকাকা হেসে বললেন, "তা বটে ! তা হলে এক কাজ করতে হয়। শ্রীরামপুর যেতে হলে একটা গাড়ি ভাড়া করে এখনই রওনা হওয়া ভাল।"

"তুমি যাবে নাকি বাঘাকাকা ?"

"হ্যাঁ কিট্টুবাবু। আমারও মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব সহজ নয় ! আমার কী মনে হচ্ছে জানো ?"

"কী ?"

"নারায়ণস্বামী ফ্রিজ, টিভি, ভিসিপি, এইসবের ব্যবসা করার জন্য বহু টাকা সঙ্গে এনেছিলেন, কোনও দুষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ওই টাকা হস্তগত করে তাঁকে খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে।"

কিট্টু বলল, "তা হলে তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! কিন্তু চেন্নাইয়ে কি এইসব জিনিস পাওয়া যায় না ? আর এসব জিনিস কি সব নগদেই বিক্রি হয় ?"

বাঘাকাকার কপালের রেখা কুঞ্চিত হল। তিনি বললেন, "তা বটে !"

॥ ২ ॥

কিট্টুদের বাড়ির সামনের দোকান 'সুরসাথী'র এখন উন্নতি হয়েছে। কাপড়জামা ইস্ত্রি করতে-করতে সে নিজের চেষ্টায় আর উৎসাহে একটা পুরনো গাড়ি কিনেছে, সেটা সে ভাড়া দেয়। ওই গাড়িটিকে মাঝে-মাঝে কিট্টু ভাড়াও নেয়। কিট্টু গাড়ি চালানো জানে, কিন্তু চালাতে ভয় পায় কলকাতা শহরে। বাঘাকাকার অবশ্য গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আছে, গাড়ি তিনিই চালান।

পার্ক সার্কাস থেকে গাড়ি ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে গিয়ে ভি আই পি রোড ধরে কিছুটা গিয়ে লেকটাউনের ভেতর দিয়ে যশোর রোড দিয়ে টালা পার্ক পেরিয়ে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে যেতে-যেতে ডানলপ ব্রিজের কাছে বাঁ দিকে ঘুরবার সময় দেখা গেল, সেদিকে ট্রাফিক জ্যাম। বিবেকানন্দ সেতু মেরামত হওয়ার জন্য রোজই নাকি এই অসুবিধে হচ্ছে। অতএব

সোজা গাড়ি চালিয়ে ব্যারাকপুর, সেখানে একটি গ্যারাজে গাড়িটিকে রেখে নৌকোয় করে গঙ্গা পার হওয়ার আগে চোখে পড়ল ছোট-ছোট অনেক পোস্টার। 'শতকরা ৭০ পর্যন্ত ছাড়ে বিভিন্ন কোম্পানির ফ্রিজ, টিভি, রেডিও, ভিসিপি, ভিসিআর বিক্রয়'। ব্যারাকপুরের একটা ঠিকানাও তাতে দেওয়া ছিল। খেয়া পার হওয়ার সময় বাঘাকাকা দু-একজনের সঙ্গে কী সব কথা বললেন। কিট্টু দেখছিল গঙ্গার অপরূপ দৃশ্য! মাঝে-মাঝে শুশুক ভুস্ করে জলের ওপরে ছিটকে উঠছে আবার ভুস করে ডুবে যাচ্ছে। অদ্ভুত লাগল কিট্টুর।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই গঙ্গা পার হয়ে নামতে যাচ্ছে যখন কিট্টু, বাঘাকাকা কিট্টুর হাত ধরে বললেন, "আমরা নামছি না কিট্টুবাবু।"

কিট্টু তো অবাক! কিট্টু বলল, "নামছি না মানে কী বাঘাকাকা?"

"নামছি না মানে নামছি না! রহস্যটা কী বাঘাকাকা?"

"রহস্য হচ্ছে আমরা ব্যারাকপুরে ফিরে যাচ্ছি। সেখানে হঠাৎ খুলে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা ফ্রিজ টিভি ভিসিআর ভিসিপি-র দোকানের কাছাকাছি একটু ঘুরঘুর করতে চাই!"

"ঘুরঘুর করতে চাই আবার কী ভাষা?"

"ওই হল একরকম ভাষা। বুঝতে পারলেই হল!"

"কিন্তু কী ব্যাপার বাঘাকাকা?"

"ব্যাপার তো সাঙ্ঘাতিক। শস্তার মোহ! শস্তার মোহ মানুষকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। ব্যারাকপুরে একটা সরকারি খালি জায়গায় তাঁবু ফেলে ঘটা করে একটি কোম্পানি দোকান খুলল, কী ব্যাপার, না তারা শস্তায়, অবিশ্বাস্য শস্তায়, শতকরা ৫০ থেকে ৭০ ছাড়ে নতুন টিভি, ফ্রিজ, রেডিও সব বিক্রি করবে বলে প্রচার করল। প্রথমদিকে লোকে বিশেষ পাত্তা দিল না। দু-একজন বোকাসোকা লোক রেডিও, সাদাকালো টিভি এসবের জন্য অর্ধেক দাম জমা দিল। শর্ত হল, আগে দাম জমা দিতে হবে। পরে জিনিসপত্র দেওয়া হবে। সন্দেহ যাদের ছিল, তারা পরে দেখল, বাঃ, ভারী মজা তো। যে যেরকম জিনিসের অর্ডার দিয়েছিল, সে সে-রকম জিনিস পেতে শুরু করল। সত্যি-সত্যি নতুন আর চমৎকার সব জিনিসপত্র। ওই দেখে প্রথমে ডজনে-ডজনে লোক টাকা জমা দিতে লাগল, আর দশ দিন পর জিনিসপত্র পেতেও লাগল। শেষে এমন হল যে, দোকানে পাঁচজন লোক ক্রমাগত টাকা নিতে-নিতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘণ্টায় লাখ টাকার ওপর অর্ডার আসতে লাগল। আসবে না? এত কম টাকায় কত জিনিস! কিন্তু শেষ দশদিনে প্রায় দু'কোটি টাকা সংগ্রহ করে একদিন রাত্রে ওঁরা সব ফুড়ুত!"

"ফুড়ুত?" কিট্টু বলল।

"ফুড়ুত!" বাঘাকাকা বললেন। প্রথম দশদিন দ্বিতীয় দশদিনে তাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে ঠিক, কিন্তু শেষ দশ দিনে যা পেয়েছে তাতে তাদের হাতে এসে গেছে খরচটরচ বাদ দিয়েও আনুমানিক এক কোটি ষাট লাখ টাকা! মন্দ কী!"

"সর্বনাশ!" বলল কিট্টু।

বাঘাকাকা বললেন, "এ রকম ব্যাপার দেখেই যেখানে লোকের পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল তারা তা না করে ব্যাঙ্ক থেকে কষ্টে অর্জন করা টাকা এনে তাদের উপহার দিল, এই হচ্ছে মানুষের বোকামি, বা ট্র্যাজেডি কিট্টুবাবু!"

কিট্টু বলল, "এখন আমরা কী করব?"

বাঘাকাকা বললেন, "আমরা অকুস্থলে যাব। সেখানকার লোকজনদের কাছে জিজ্ঞেস করব। আমার মনে হয় নারায়ণস্বামীর হত্যার সঙ্গে এই ব্যাপারের একটি সম্পর্ক আছে। আমার ধারণা কী জানো?"

"কী?"

"এই দল—মানে ঠকবাজের দলটি দক্ষিণ ভারতের। নারায়ণস্বামী এদের চিনতেন। তিনি যেভাবেই হোক খবর পান দলটি পশ্চিমবাংলায় এসেছে লোক ঠকাতে। তিনি অত্যন্ত সৎ মানুষ, তিনি নিজের টাকা খরচ করে কলকাতায় আসেন। মানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজে লেগে যান। তিনি বিভিন্ন টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি কোম্পানিকে প্রশ্ন করেন টেলিফোনে, দোকানদাররা সর্বোচ্চ কত কমিশন পেতে পারেন। কোনও প্রস্তুতকারকই কোনও টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদিতে শতকরা ৫০ ভাগ, বা তার বেশি কমিশন দিতে পারে না। এটা অবশ্য অজানা নয় কারও কাছেই, কিন্তু বোকারামের দল যারা ঠকতে চায় তাদের কাছে এ-প্রশ্ন দেখা দেয় না। নারায়ণস্বামী নিজেও এটা ভাল করেই জানতেন। আমার মনে হয় তিনি ওইসব দোকানকে ফোন করে জানতে চেষ্টা করছিলেন হঠাৎ কোনও দোকানকে তারা প্রচুর পরিমাণে টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি সরবরাহ করেছিল কি না। আমার এও অনুমান, তিনি হয় টেলিফোনে খবর পান, নয়তো নিজে ওইসব দোকানে গিয়ে জানবার চেষ্টা করেন কোথায় তারা ওইসব জিনিস সরবরাহ করেছে! তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে নারায়ণস্বামী ব্যারাকপুরে নিজে গিয়ে বিপদে পড়েন। তাঁকে ঠকবাজেরা চিনতে পারে এবং তাঁকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেয়।"

কিট্টু বলল, "এর মধ্যে শ্রীবসন্ত গেস্ট হাউসের ব্যবহারও বেশ সন্দেহজনক।"

"কেন?"

"তাদের একজন বোর্ডার ফিরলেন না, এটা কি পুলিশকে জানানো প্রয়োজন বা কর্তব্য ছিল না? এটা কি সন্দেহজনক ব্যাপার নয়!"

বাঘাকাকা বললেন, "কথাটা ঠিকই। কিন্তু এটা অন্যায় হলেও ওরা নারায়ণস্বামীর হত্যার সঙ্গে বোধ হয় জড়িত নয়।"

ব্যারাকপুরের ঘাটে নেমে আদালতের কাছাকাছি একটা মিষ্টির দোকানে কিছু খেয়ে সেখান থেকে কিট্টু শান্তিরঞ্জন পিসেমশাইকে ফোন করে বলল, শান্তিরঞ্জন যেন অবিলম্বে চেন্নাইয়ের পুলিশকে খবর দেওয়ার জন্য কলকাতা পুলিশকে অনুরোধ করেন।

খোঁজ নিয়ে কিট্টুরা জানতে পারল ওই অঞ্চলের বহু হাজার ব্যক্তি সর্বস্বান্ত না হলেও প্রচুর ধাক্কা খেয়েছেন। কেউ-কেউ দুটো-তিনটে ফ্রিজ, টিভি, ওয়াশিং মেশিনের অর্ডার দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার পুলিশও ছিলেন বেশ কিছু। লোকগুলিকে প্রথমে সন্দেহ হলেও পরে সে-সন্দেহ চলে গিয়েছিল। হ্যাঁ, লোকগুলোর দু-তিনজন দক্ষিণ ভারতের মানুষ। তাদের নাম কেউ জানে না, সঙ্গে যারা ছিল তারা কেউ বাঙালি নয়, তাদের অন্য কোনও রাজ্য থেকে আনা হয়েছিল বলে মনে হয়।"

পুলিশকে প্রশ্ন করে জানা গেল না তেমন কিছুই। লোকগুলো কে, কোথা থেকে এল, কোথায় গেল, কোনও খবরই তাদের দফতরে পাওয়া গেল না। একজন বললেন তাঁরা অন্ধকারে। যে-রাতে ওরা সদলবলে পালাল, সে-রাতে দমদম এয়ারপোর্টে বড়-বড় চারটে সুটকেস নিয়ে কয়েকজন বিমানে উঠেছিল কি না সেটাও পুলিশ বলতে পারল না, অথচ লোকজনকে জিজ্ঞেস করে কিট্টুরা জানতে পেরেছিল যেদিন সকালে তারা বেপাত্তা হয়েছে দেখা গেল তার আগের রাত্রে দুটো ট্যাক্সিতে চারটে বড়-বড় ট্রাঙ্ক তোলা হয়েছিল। এদিকে এই ঠগবাজদের কীর্তিকলাপের সঙ্গে যে একটা খুনও জড়িত, সেটাও পুলিশ জানে না, আন্দাজও করেনি, কেননা নারায়ণস্বামীর মৃতদেহ পাওয়া গেছে শ্রীরামপুরের কাছের গঙ্গায়!

কিট্টুরা সারাদিনই ব্যারাকপুরে কাটিয়ে দিল। লোকদের কাছে কথা বলে জানা গেল, ঠগদের একজনের নাম মূর্তি, আর-একজনের নাম কুপু। এ-দুটিই দক্ষিণ ভারতীয় নাম। কিট্টু এবং বাঘাকাকা গাড়িতে করে সন্ধের সময় দমদম বিমানবন্দরে গিয়ে অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে চেন্নাইয়ের সেই রাত্তিরের ফ্লাইটের সমস্ত

(এর পরে ৪২ পাতায়)

টিনটিনের অমর স্রষ্টা হার্জের গোখরো উপত্যকা

গোখরো উপত্যকা

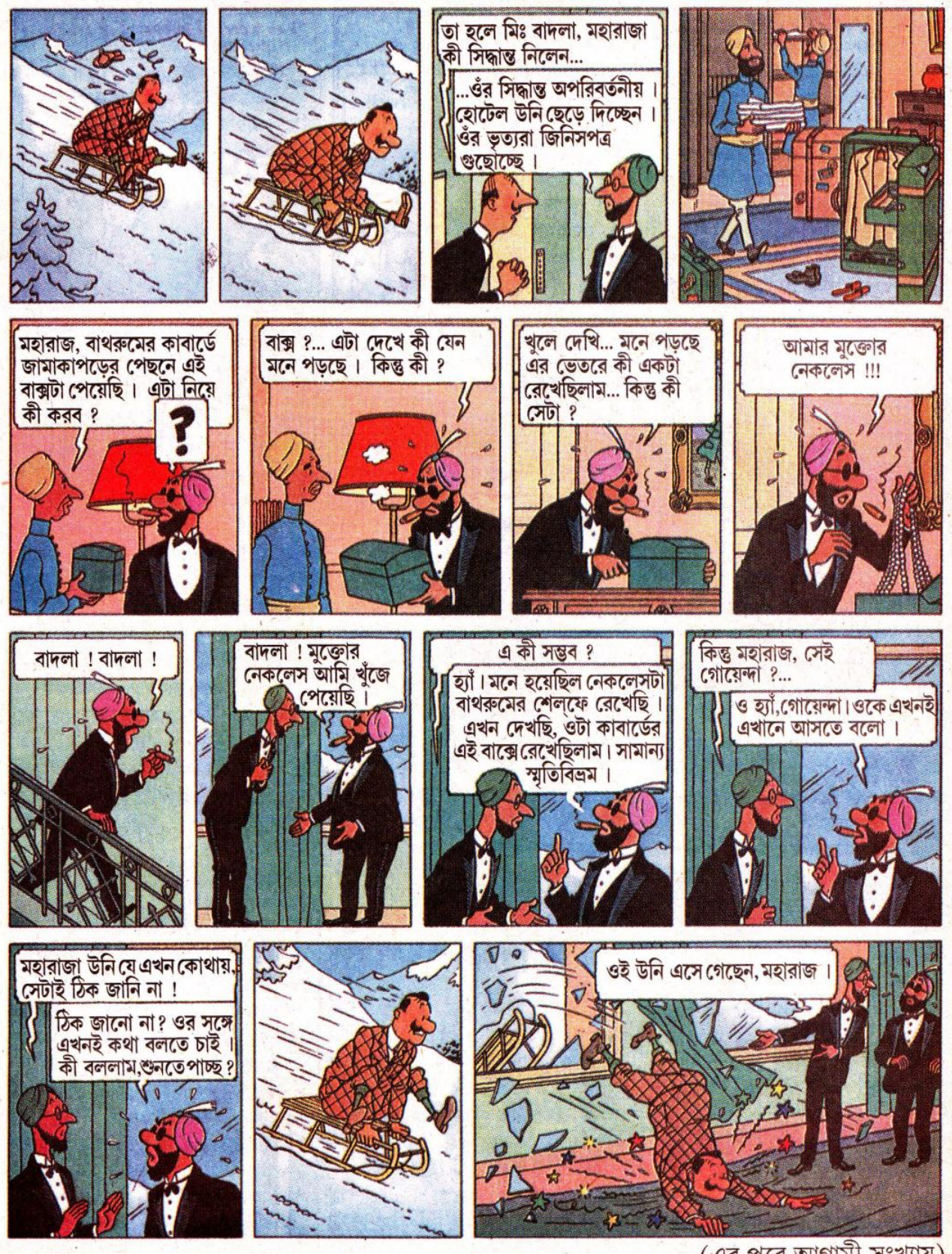

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(৩৯ পাতার পর)

যাত্রী-তালিকা পড়বার সুযোগ পেল। তাতে কৃষ্ণমূর্তি আর কুপুস্বামীর নাম পাওয়া গেল। সঙ্গে ঠিকানাও। বাঘাকাকা বললেন, "নাম আর ঠিকানা দুটোই বানানো হতে পারে।"

কিট্টু বিমানবন্দর থেকেই শান্তিরঞ্জনপিসের কাছে সব জানিয়ে দিল। শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, "চেন্নাইয়ের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।"

কিট্টু ওই বিশেষ রাত্তিরের বিমানের ফ্লাইট নম্বর আর দু'জন যাত্রীর নাম পিসেমশাইকে জানিয়ে দিল। পিসেমশাই বললেন, "এই খবর এক্ষুনি পুলিশকে জানিয়ে দিচ্ছি।"

কিট্টু বাঘাকাকাকে বলল, "কী অদ্ভুত ব্যাপার, আর কী অদ্ভুত যোগাযোগ! পিসেমশাই যদি নারায়ণস্বামীর বন্ধু না হতেন, কিংবা তিনি যদি পিসেমশাইয়ের সঙ্গে এবারে দেখা না করতেন তা হলে ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ত নাকি?"

বাঘাকাকা বললেন, "আরও একটা কথা। খবরের কাগজে নারায়ণস্বামীর ছবি যদি ছাপা না হত আর সেই ছবি যদি শান্তিরঞ্জন পিসেমশাইয়ের চোখে না পড়ত, তা হলেও ব্যাপারটা অন্ধকারেই থাকত! পুলিশ খুবই অপদার্থ, কিন্তু তবু এই কর্মটি যে তারা করেছে সেটাও সুলক্ষণ! আসলে কী হয় জানো, সবই দায়িত্ব এড়ানোর খেলা। একটি মৃতদেহ জলে ভাসল, সেটা কোথা থেকে এল কেউ খোঁজ করল না, কোথায় পাওয়া গেল সেটাই বড় হয়ে দেখা দিল। নারায়ণস্বামীকে নিশ্চয় খুন করা হয়েছে ব্যারাকপুরেই, কিন্তু গঙ্গার জলের স্রোতে সেটি চলে গেছে ব্যারাকপুরের উলটো দিকে শ্রীরামপুর। সেখানকার পুলিশ তদন্ত করেছে, একটা ফাইল বানিয়েছে আর সেটিকে আলমারিতে রেখে দিয়েছে। এ নিয়ে বিশেষভাবে তদ্বির বা তদন্ত করেনি।"

রাত প্রায় দশটার সময় ক্লান্ত হয়ে বাঘাকাকা আর কিট্টু বাড়িতে পৌঁছনোমাত্র টেলিফোনের আওয়াজ। কিট্টু টেলিফোন ধরেই বলল, "কে, পিসেমশাই? জরুরি দরকার—এক্ষুনি যেতে হবে? যাচ্ছি।" তারপর "কী হল কে জানে," বলে কিট্টু যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থাতেই বেরিয়ে গেল। পিসেমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েই কিট্টু দেখতে পেল, মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় এক ভদ্রলোক বসে আছেন খাবার টেবিলে। খাওয়াদাওয়ার পর গল্পগুজব করছেন। পিসেমশাই বললেন, "কিট্টু চিনতে পারছ?"

কিট্টু বলল, "না!"

পিসেমশাই বললেন, "না চিনবারই কথা। খড়্গপুরে এক আত্মীয়বাড়িতে যাওয়ার সময় রিকশার সঙ্গে একটা জিপের সঙ্ঘর্ষে আহত হয়ে দশ-বারোদিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় রেল হাসপাতালে ছিলেন। ইনিই হলেন নারায়ণস্বামী, আমার বন্ধু। ইনি খুন হননি। খবরের কাগজে যাঁর ছবি বেরিয়েছে তিনি অন্য লোক।" কথাটা পিসেমশাই ইংরেজিতেই বললেন।

নারায়ণস্বামী ক্ষীণ হেসে বললেন, "খুন হইনি বটে, তবে তার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম! স্মৃতিটাও প্রায় চলে গিয়েছিল, পরশু রাত থেকে *প্রায় সুস্থ হয়ে প্রথমেই চলে এলাম তোমার* আঙ্কল মৈত্রের কাছে। আমার একটা টাকা নেই। আমার পকেট থেকে পাঁচশো টাকার ওপর খোয়া গেছে। কাগজপত্র, চেকবই ব্যাঙ্ক কার্ড এ-সবই আমি আহত হওয়ায় কেউ সরিয়েছে! যাকগে, বেঁচে গিয়েছি এই ঢের!"

কিট্টু তো হতভম্ব! সেটি খুব উপভোগ করলেন শান্তিরঞ্জনবাবু! তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য শান্তিরঞ্জনবাবু বললেন, "ঘাবড়ে যেয়ো না কিট্টু। তোমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি। ব্যারাকপুরের ঠগিরা ধরা পড়েছে! এইমাত্র আমার বন্ধু তোমাদের পূর্বপরিচিত পুলিশকর্তা ঘোষসাহেব ফোন করে জানিয়ে দিলেন চেন্নাইয়ে পালের গোদারা ধরা পড়েছে, পাওয়া গেছে দেড় কোটি টাকার ওপর। মনে হচ্ছে কিছু পুরস্কার তুমি আর বাঘাকাকা পাবে!"

কিট্টু মুখ গোমড়া করেই রইল। তার মনে হল এইরকম হঠাৎ একটা সিদ্ধান্ত করে সে ভুলই করেছিল। খবরের কাগজের ছবি দেখে কি মানুষকে অত স্পষ্টভাবে চেনা যায়? তার রাগ হল শান্তিরঞ্জন পিসেমশাইয়ের ওপর! কিন্তু নারায়ণস্বামীও কম নন। তিনি তাঁর প্যাডের ওপর সব টিভি আর ফ্রিজের দাম, শতকরা ছাড় এসব তা হলে কেন লিখলেন? কিট্টু বলল, "আচ্ছা, মিস্টার নারায়ণস্বামী, আপনি আপনার প্যাডের ওপর সব টিভি ফ্রিজের দোকানের টেলিফোন নম্বর লিখেছিলেন কেন?"

"আমি! না তো!" নারায়ণস্বামী বললেন। "আমি লিখিনি ওসব।"

"তবে?"

"আরে আমার এক ভাইপোর আবদার রাখতে এটা নিয়ে এসেছিলাম। ও সাংবাদিক। ওর ধারণা, একই কোম্পানির একই জিনিস কলকাতায় শস্তায় পাওয়া যায়। আমাকে ও নিজেই ওইসব টেলিফোন নম্বর লিখে দিয়েছিল, তার পাশে লিখে দিয়েছিল ওখানকার দাম আর ওখানে কত কমিশন পাওয়া যায়।"

"আপনি খোঁজ করেননি?"

"না! খোঁজ করবার সময়ই তো পেলাম না। খড়্গপুরে আমার বন্ধু দাশগুপ্তের বাড়িতে যাওয়ার সময় হল দুর্ঘটনা। প্রায় দু'সপ্তাহ হাসপাতালে থেকে ওঁর খোঁজ করলাম, তা উনি তো বদলি হয়ে গেছেন আসানসোলে! ফিরে এলাম তাই।"

"তা আপনি নাকি কী অন্যায় সব ব্যাপার ঠেকাতে কলকাতায় এসেছিলেন?"

নারায়ণস্বামী হেসে বললেন, "ওটা ঠিক কথা নয়। ওটা বানিয়ে বলেছিলাম মিস্টার মৈত্রকে!"

"ব্যারাকপুরের ঠগিদের সঙ্গে আপনার কোনও *ব্যাপার ছিল না?*"

"সে আবার কী?"

কিট্টু হাই তুলল। বলল, "থাক ওসব কথা। বড় ঘুম পাচ্ছে, বাড়ি যাই।"

এই সময় হঠাৎ সুপ্রিয়াপিসি এসে বললেন, "কিট্টু তোকে বড় শুকনো দেখাচ্ছে রে! বোধ হয় খাওয়াদাওয়া হয়নি? তা হলে বসে যা, আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি। চিনে খাবার—এবারে ফ্রায়েড চিলি প্রন।"

"নাঃ, ভাল লাগছে না।" কিট্টু বলল, "যাই, বাড়ি যাই। বাঘাকাকা অপেক্ষা করে আছেন। ওঁকে একটা সংবাদ দিতে হবে।"

"দুঃসংবাদ তো? আমি সব শুনেছি। তা ওই দুঃসংবাদ পরে দিলেও ক্ষতি নেই।"

খেয়েদেয়ে মনটা একটু ভাল হল কিট্টুর। সে বলল, "পিসি,একটা কথা বাঘাকাকা তোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন, অবশ্য যদি জানাতে আপত্তি না থাকে!"

"না, না, কী আর এমন কথা হবে যা জানাতে আমার আপত্তি থাকতে পারে?"

"তা হলে বলো তো পিসি, তোমার ওই সুন্দর চিনে খাদ্য তৈরির গোপন রেসিপিটা কী? বাঘাকাকা আর ভুলতে পারছেন না।"

"না, ওটা আমি বলব না।" সুপ্রিয়াপিসি বললেন, "যারা রান্না করে এটা তাদের গোপন রাখার অধিকার আছে কিট্টু! কিছু মনে করিস না।"

কিট্টু বলল, "আচ্ছা পিসি।" বলে চলে যাচ্ছিল।

সুপ্রিয়াপিসির কীরকম দুঃখ হল। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, গোপন রহস্যটা বলছি। বইমেলা থেকে একটা চমৎকার বই কিনেছিলাম বুঝলি, 'চিনা মেনুসংহিতা' সেটার নাম। অনেক রেসিপি আছে ওটাতে, চমৎকার বই, চমৎকার লেখা, লেখকের নাম ফটিকচাঁদ শর্মা!"

কিট্টু হাহা করে হেসে উঠল। বাঘাকাকারই লেখা বই! হাসবারই কথা। কিন্তু সেটা সুপ্রিয়াপিসিকে বলল না। নিজের মনেই হাসতে লাগল। ঠিক করল, কথাটা সে আপাতত বাঘাকাকাকেও বলবে না!

ছবি : দেবাশিস দেব

গোয়েন্দা গল্প

স্বীকারোক্তি

প্যাট্রিসিয়া ম্যাকগের

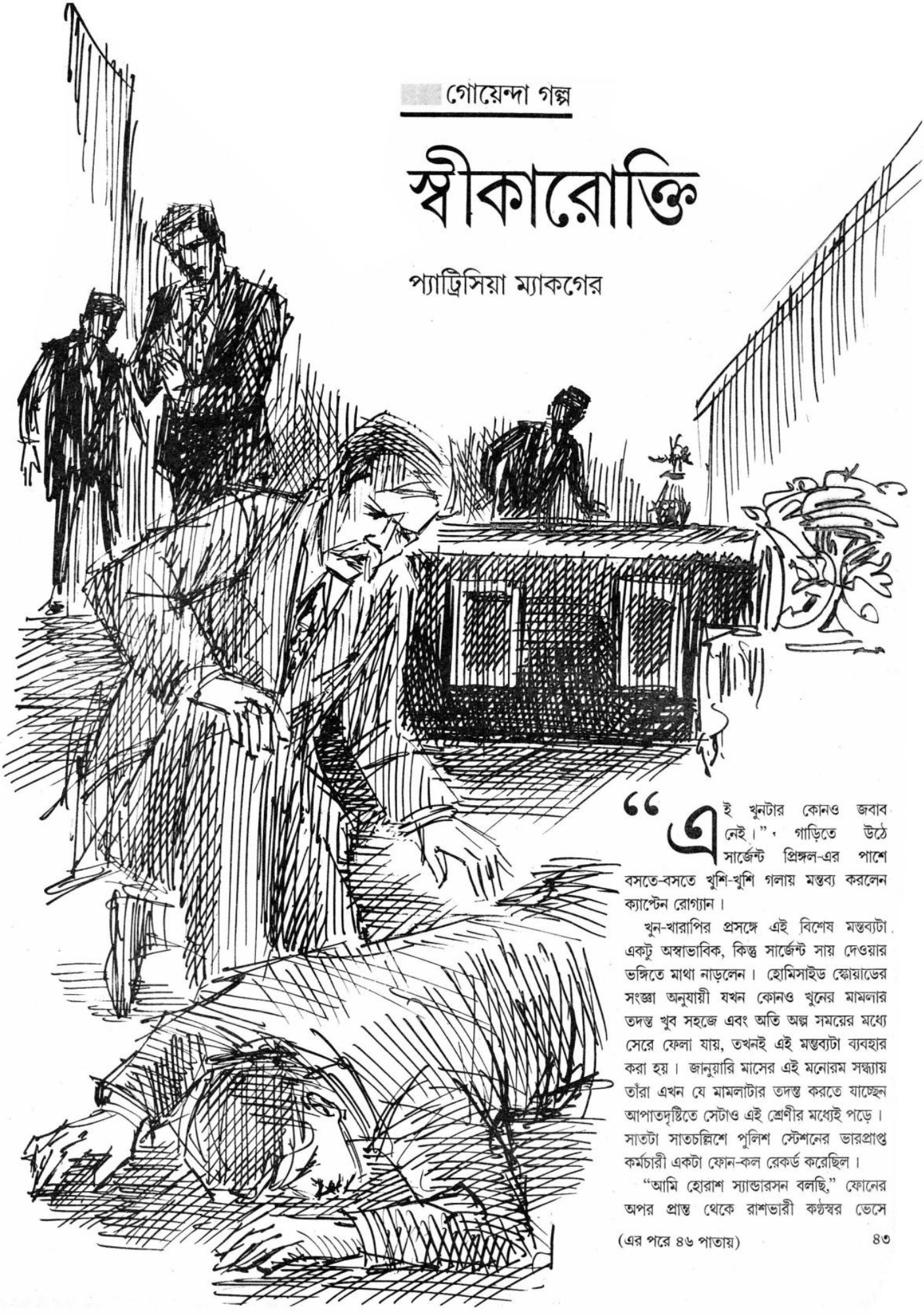

"এই খুনটার কোনও জবাব নেই।" গাড়িতে উঠে সার্জেন্ট প্রিঙ্গল-এর পাশে বসতে-বসতে খুশি-খুশি গলায় মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন রোগ্যান।

খুন-খারাপির প্রসঙ্গে এই বিশেষ মন্তব্যটা একটু অস্বাভাবিক, কিন্তু সার্জেন্ট সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। হোমিসাইড স্কোয়াডের সংজ্ঞা অনুযায়ী যখন কোনও খুনের মামলার তদন্ত খুব সহজে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেরে ফেলা যায়, তখনই এই মন্তব্যটা ব্যবহার করা হয়। জানুয়ারি মাসের এই মনোরম সন্ধ্যায় তাঁরা এখন যে মামলাটার তদন্ত করতে যাচ্ছেন আপাতদৃষ্টিতে সেটাও এই শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। সাতটা সাতচল্লিশে পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী একটা ফোন-কল রেকর্ড করেছিল।

"আমি হোরাশ স্যান্ডারসন বলছি," ফোনের অপর প্রান্ত থেকে রাশভারী কণ্ঠস্বর ভেসে

(এর পরে ৪৬ পাতায়)

গলদেশ পরিক্রমায় অ্যাসটেরিক্স

গল্প গোসিনি
ছবি ইউদেরজো

গলদেশ পরিক্রমায় অ্যাসটেরিক্স

কপিরাইট : দারগো এডিটর

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

৪৩ পাতার পর)

এল। "একটা খুনের ব্যাপারে আমি রিপোর্ট করতে চাই। আমার অফিসের মধ্যেই আমি একজনকে গুলি করে মেরেছি।"

তাই বাকি কাজটুকু হচ্ছে অকুস্থল পরিদর্শন করা, অপরাধীর স্বীকারোক্তি নেওয়া এবং তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা। সেইজন্যই ক্যাপ্টেন মন্তব্য করেছিলেন, "এটা খুবই ছিমছাম আর পরিপাটি।"

"স্যান্ডারসন," সন্তর্পণে একটা বাঁক পেরিয়ে আসতে-আসতে স্মৃতিচারণ করতে লাগলেন প্রিঙ্গল, "আমি কি আগে কখনও নামটা কোথাও শুনিনি?"

"তোমার শোনা উচিত।" রোগ্যান জানালেন। "তবে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ভদ্রলোক যদি কখনও তোমাকে নাস্তানাবুদ না করে থাকেন, তা হলে সেটা তোমার এক মস্তবড় সৌভাগ্য বলে জানবে।"

"ওহো... হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তিনিই তো সেই ধুরন্ধর আইনজীবী, বিত্তবান আসামিদের পক্ষ নিয়ে যিনি সবসময় মামলা লড়েন। যদিও তাঁর কোনও মামলার সাক্ষী হিসেবে আমাকে কখনও আদালতে হাজির থাকতে হয়নি, কিন্তু আমার সহকর্মীদের অনেককেই এই দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়েছে। তাদের মুখে শুনেছি সাক্ষীদের শরীর থেকে ঘাম বের করে আনার জন্যে তাঁর নাকি আলাদা কলাকৌশল রপ্ত করা আছে।"

'খুবই খাঁটি কথা বলেছ!' পুরনো স্মৃতি মনে পড়ায় আপনা থেকেই রোগ্যানের ঠোঁটের ফাঁকে একটা বাঁকা রেখা ফুটে উঠল। "জেরায়-জেরায় তিনি তোমাকে এমনভাবে জেরবার করে ছাড়বেন যে, তখন তোমার নিজের নামের বানানটাও ঠিকমতো মনে করতে পারবে কি না সন্দেহ। কিন্তু এবার চাকা ঘুরে গেছে। আমি এখন মিঃ হোরাশ স্যান্ডারসনকে আসামির কাঠগড়ায় দেখতে চাই।"

"নিয়তি কী অদ্ভুত, তাই না! মক্কেলদের জন্যে এতদিন ধরে এত জবরদস্ত লড়াই চালিয়ে নিজের বেলায় তিনি এত সহজে আত্মসমর্পণ করলেন!"

"তা হলে বুঝতে হবে তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ একেবারে অকাট্য।" সন্তুষ্ট চিত্তে ঘাড় নাড়লেন রোগ্যান। "অপরাধ সংক্রান্ত যাবতীয় আইনকানুন সবই তাঁর নখদর্পণে। আত্মরক্ষার জন্যে তিনি যদি আইনের মধ্যে সামান্য কোনও ফাঁকফোকর খুঁজে পেতেন, তবে এভাবে নিজের মুখে নিজের অপরাধ স্বীকার করতেন না।"

"ভদ্রলোক হয়তো বলবেন যে, আত্মরক্ষার তাগিদে তিনি এ-কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন।" সার্জেন্ট মন্তব্য করলেন।

"কিন্তু ফোনে তিনি শুধুমাত্র খুনের কথাই বলেছেন। কথাটার আক্ষরিক অর্থ সম্পর্কেও তিনি পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল। আত্মরক্ষার জন্যে নিতান্ত নাচার হয়ে কাউকে প্রাণে মারাটা যে খুন বলে গণ্য করা হয় না, এটা নিশ্চয়ই তাঁর না জানার কথা নয়।"

"আচ্ছা, সাময়িক উন্মত্ততার দোহাই দিয়েও তো নিজেকে তিনি নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে পারেন!"

"হ্যাঁ, তা তিনি পারেন," রোগ্যানও স্বীকার করলেন কথাটা। "অবশ্য তাতে আমাদের বর্তমান কর্মসূচির কোনও হেরফের ঘটবে না। এখন আমরা প্রকৃত ঘটনাটা যাচাই করে নিতে চাই। তারপর তিনি যদি এই খুনের ব্যাপারে মানসিক অস্থিরতার অজুহাত দিতে চান, তবে সেটা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, আমাদের নয়। ল্যাবরেটরির কর্মীরা তাদের কাজকর্মে খুব বেশি ঢিলেমি না করলে রাত দশটার আগেই আমরা অফিসে ফিরে এসে তারিয়ে-তারিখে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে পারব।"

পুলিশ স্টেশন থেকে স্যান্ডারসনের আইন-অফিসের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। বাড়ির সামনেই গাড়ি পার্ক করলেন প্রিঙ্গল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে লিফ্‌টে চড়ে পাঁচতলায় হাজির হলেন। একটামাত্র ঘরের মধ্যে থেকেই আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। তার দরজার গায়ে অ্যাটর্নি অফিসের নাম খোদাই করা, 'স্যান্ডারসন-স্যান্ডারসন-অ্যান্ড স্যান্ডারসন'। রোগ্যান এগিয়ে গিয়ে বন্ধ দরজার গায়ে আলতো টোকা দিলেন। দরজা খুললেন লম্বা-চওড়া দশাসই চেহারার এক পুরুষ। তাঁর বয়স ষাটের কাছাকাছি। ভদ্রলোকের স্বাস্থ্য, চালচলন আর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে, কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাবড়-তাবড় সাক্ষীদেরও তিনি একবারে নাজেহাল করে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা ধরেন।

"আপনারা খুব তাড়াতাড়িই এসে পড়েছেন দেখছি!" সহজ গলায় তিনি বললেন। বিশেষ করে তাঁর নজর গিয়ে পড়ল রোগ্যানের ওপর। "আমার বিশ্বাস, আপনিই নিশ্চয় ক্যাপ্টেন রোগ্যান?" একটু থেমে অতীতের কোনও স্মৃতি যেন মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি, "হ্যাঁ...হ্যাঁ, হাচিনসকে হত্যার অভিযোগে পুলিশ অফিসার হিসেবে আপনি তো একজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, তাই না? কিন্তু আক্ষেপের কথা হচ্ছে, আপনি ভুল লোককে ধরেছিলেন। সার আপনার শাগরেদরা...," মাঝপথে থেমে গিয়ে এবার তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রিঙ্গলের দিকে ফিরে তাকালেন, "আগে কখনও আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না!"

"ইনি হচ্ছেন সার্জেন্ট প্রিঙ্গল।" রোগ্যানের গলার সুরে একরাশ তিক্ততা ঝরে পড়ল। হাচিনসকে খুনের দায়ে তিনি যাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন, সে-ই যে আসল অপরাধী তাতে তাঁর মনে লেশমাত্র সন্দেহ ছিল না। অথচ মহামান্য আদালতের নির্দেশে লোকটা বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। এই পুরনো স্মৃতিটা বিষাক্ত ফোঁড়ার মতো এখনও তাঁকে যন্ত্রণা দেয়। "আপনাকে জানানো আমার আইনগত কর্তব্য, যে-কোনও প্রশ্নের জবাব দেওয়া বা না-দেওয়া..."

"ওসব আইনের গীত এখন থামান!" হাত নেড়ে বাধা দিলেন স্যান্ডারসন। "ইতিমধ্যে আমি আমার আইনজীবীর পরামর্শ নিয়েছি, এবং আমার অধিকারের সীমানা সম্পর্কেও আমাকে ভালভাবে সমঝে দেওয়া হয়েছে। দয়া করে যদি আমার সঙ্গে পাশের ঘরে আসেন, তবে মৃতদেহটা আমি আপনাদের দেখাতে পারি। ব্যাপারটা কীভাবে ঘটল তাও তখন খুলে বলব।"

খুবই ঠাণ্ডা মাথার মক্কেল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোগ্যান মনে-মনে ভদ্রলোকের প্রশংসা না করে পারলেন না। তাঁর মাথার অর্ধেকটা এখন দড়ির ফাঁসে আটকে গেছে। তবুও আদালতের মতো এখানেও সমান দাপটে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করে চলেছেন।

বৈঠকখানা পেরিয়ে গিয়ে স্যান্ডারসন পেছন দিকের একটা ঘরের দরজা খুললেন। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন তিনি। তারপর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে আর দু'জনকে ভেতরের দৃশ্যটা দেখার সুযোগ করে দিলেন। ঘরটা পরামর্শ-কক্ষের মতো। মেঝের ওপর সবুজ রঙের গালচে পাতা। একধারে একটা মানুষের শরীর উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

রোগ্যান পড়ে-থাকা শরীরটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসলেন। তার বাঁ হাতটা টেনে নিয়ে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করলেন। তবে নাড়ির স্পন্দন যে অনেক আগেই থেমে গেছে, সে-বিষয়েও তিনি পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন। মাথার পেছন দিকের চুলে রক্ত লেগে জট পাকিয়ে গেছে। গুলিটা ওই পথ দিয়েই সরাসরি মগজে গিয়ে ঢুকেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গেই বেচারি মারা গেছে।

"আমরা পৌঁছবার আগেই লোকটা মারা গেছে," প্রিঙ্গলকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "টেকনিক্যাল ইউনিটকে খবর দাও। সেইসঙ্গে

মর্গের একটা গাড়িও পাঠাতে বলো।"

"কোণের দিকে ডেস্কের ওপর একটা ফোন আছে, সার্জেন্ট।" অযাচিতভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন স্যান্ডারসন, "ইচ্ছেমতো আপনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন।"

রোগ্যান এবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নীচে পড়ে-থাকা মৃতদেহটার দিকে পুনরায় ফিরে তাকালেন। শরীরটা সামনের দিকে উপুড় হয়ে পড়েছে, কিন্তু মুখটা একপাশে ফেরানো। কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হল রোগ্যানের।

"আপনি ওকে চেনেন নাকি, ক্যাপ্টেন?" জানতে চাইলেন স্যান্ডারসন। "ওর নাম হচ্ছে—অর্থাৎ ছিল—শেট ট্যাঙ্কার্সলে।"

নামটা কানে যাওয়ামাত্র রোগ্যানের মাথার ভেতরের বিশেষ একটা বন্ধ দরজা খুলে গেল। ঠগবাজি এবং এই জাতীয় আরও অনেক অপকর্মের কারবারি। এমন একটা লোকের মৃত্যুতে সমাজের বিশেষ কোনও ক্ষতির কারণ নেই। মামলাটা তাই আরও বেশি করে পছন্দ হল তাঁর।

"আপনি নিজে ওকে গুলি করেছেন?" প্রশ্ন করলেন রোগ্যান।

"হ্যাঁ, এই রিভলভারটা দিয়ে।" ঘরের মধ্যে পালিশ-করা লম্বা টেবিলটা প্রায় দুয়ের-তিন অংশ জায়গা জুড়ে ছিল। মৃতদেহটার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে স্যান্ডারসন টেবিলের এক কোণে রাখা আগ্নেয়াস্ত্রটার দিকে ইঙ্গিত করলেন। "অবশ্য এর লাইসেন্সও আছে আমার নামে। আমার মামলা-মকদ্দমা কুখ্যাত অভিযুক্ত অপরাধীদের নিয়ে। তাই ভালমন্দ হরেকরকম লোকের সংস্পর্শে আসতে হয় আমাকে। সেই জন্যে সবসময় আমি এটা লোড-করা অবস্থায় ডেস্কে রেখে দিই।"

ভদ্রলোক কি খুনের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এখন থেকেই রাস্তা তৈরি করছেন? মনে-মনে চিন্তা করলেন রোগ্যান। তবে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। গুলিটা করা হয়েছে পেছন দিক থেকে। মৃতদেহের অবস্থান দেখে বোঝা যাচ্ছে ট্যাঙ্কার্সলে তখন অফিস-ঘর থেকে বাইরে বেরোবার জন্য পা বাড়িয়েছিল।

প্রিঙ্গল এতক্ষণ ফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। রিসিভার নামিয়ে রাখতে-রাখতে বললেন, "ওরা ইতিমধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে, ক্যাপ্টেন।"

"ভাল! ...তা হলে মিঃ স্যান্ডারসন, এবার আপনার কাহিনীটা শোনা যাক।"

"আমি তো এতক্ষণ ধরে বলব বলেই অপেক্ষা করে আছি।" মৃদু হেসে ভরসা দিলেন তিনি, "তবে আমার আইনজীবীরাও নিশ্চয় এখানে হাজির থাকবে।"

পরামর্শ-কক্ষের লাগোয়া তিনটে ব্যক্তিগত অফিস-ঘর। প্রত্যেক ঘরের দরজায় একটা করে নেম-প্লেট লাগানো। হোরাশ টি. স্যান্ডারসন, সিনিয়ার। হোরাশ টি. স্যান্ডারসন, জুনিয়ার। এবং পল এ. স্যান্ডারসন। আইনজীবী ভদ্রলোক মাঝের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সেটা তাঁর নিজের অফিস-ঘর। ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে মুখ বাড়ালেন তিনি। "এবারে তোমরা এ-ঘরে এসো। তোমাদের দু'জনকেই আমার দরকার আছে।"

"এই দু'জন আমার ছেলে, আর এরাই হচ্ছে আমার আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা।" বাবার কথামতো দুই ছেলে পরামর্শ-কক্ষে হাজির হওয়ার পর সিনিয়ার স্যান্ডারসন রোগ্যান এবং প্রিঙ্গলের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছোট ছেলে পলকে অবিকল তার বাবার ছোটখাটো সংস্করণ বলা যায়। বড় ছেলে জুনিয়ার স্যান্ডারসন একটু মোটাসোটা চেহারার, চোখ দুটো সরু-সরু, ঠোঁট দুটো পাতলা। যুবকটিকে দেখলেই বোঝা যায় তার বাবা বা ছোট ভাইয়ের মতো দুর্জয় সাহস বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তার নেই। সম্ভবত ছেলেটা তার মামার বাড়ির ধাত পেয়েছে, মনে-মনে রোগ্যান ভাবলেন, এই আইন-ব্যবসা যদি বংশ পরম্পরায় বজায় থাকে তবে তা এই ছোট ছেলে পলের সুবাদেই থাকবে।

"আপনারা সবাই বসুন।" মৃতদেহটা থেকে সবচেয়ে দূরে একটা চেয়ার টেনে বসতে-বসতে স্যান্ডারসন বললেন। তাঁর দু'পাশের দুটো খালি চেয়ার দুই ছেলে দখল করল। সার্জেন্ট প্রিঙ্গল বসলেন দরজার কাছ-বরাবর ডেস্কের সামনে। রোগ্যান বসলেন না, তিনি একটা খালি চেয়ারে ভর দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন যাতে দরকারমতো অতি সহজেই এদিক-ওদিক যেতে পারেন।

"কোনওরকম ভনিতা না করে সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক।" স্যান্ডারসন এমন ভঙ্গিতে কথা শুরু করলেন, যেন তিনি নিজের দুষ্কর্মের স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন না, কোম্পানির বোর্ড মিটিঙে ভাষণ দিচ্ছেন। "আজ বিকেলে সানি অর্থাৎ আমার বড় ছেলে জুনিয়ার হোরাশ আমাকে বলল, ওকে নাকি ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে হচ্ছে। ওর সই করা এমন একটা প্রমাণপত্র ট্যাঙ্কার্সলের হাতে গিয়ে পড়েছে যে, সেটা জানাজানি হয়ে গেলে আইনজীবী সমাজ থেকে ওকে বহিষ্কৃত করা হবে। সেই প্রমাণপত্রের বিনিময়ে ট্যাঙ্কার্সলে ওর কাছ থেকে পঁচিশ হাজার ডলার দাবি করেছিল। ঠিক ছিল আজ অফিস ছুটির পর ও এখানে এসে সানির কাছ থেকে টাকাটা সংগ্রহ করবে।

"সানি নিজে থেকে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে মাত্র পনেরো হাজার ডলার জোগাড় করতে পেরেছিল। নিরুপায় হয়ে বাকি দশ হাজারের জন্যে আমার কাছে হাজির হল। আমি সানিকে বললাম, এমন একজন শয়তানকে এক কপর্দকও দেওয়া উচিত হবে না। বরং আমি নিজেই তার মোকাবিলা করব। তাই সাড়ে পাঁচটার পর অন্য দিনের মতো আমার দুই ছেলে অফিস থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ট্যাঙ্কার্সলে যখন হাজির হল তখন আমি একাই অফিসে ছিলাম।

"আমি ওকে বললাম, এখনই হোক বা পরেই হোক, কোনওরকম টাকাকড়ি তাকে দেওয়া হবে না। এবং সে যদি ওই প্রমাণপত্রটা ভালয়-ভালয় আমার হাতে না তুলে দেয়, তা হলে ব্ল্যাকমেলের অভিযোগে যাতে তাকে এখনই গ্রেপ্তার করা হয় তার ব্যবস্থাও আমি করব। আমি যে শুধুমাত্র মিথ্যে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চেয়েছিলাম, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমার সে-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ট্যাঙ্কার্সলে খুব ভালভাবেই জানত যে, ওই প্রমাণপত্রটা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়লে কেবল আমার ছেলেরই নয়, আমাদের এই যৌথ আইন-ব্যবসার গায়েও কলঙ্কের দাগ লাগবে। তাই আমার কথা শুনে ও খুব গালাগাল দিতে শুরু করল। বলল, আগামীকাল দুপুরে আবার ও আসবে। ইতিমধ্যে যদি আমার মনোভাবের কোনও পরিবর্তন না ঘটে, এবং পুরো টাকাটা যদি ওকে না দেওয়া হয়, তা হলে এই প্রমাণপত্রটা ও বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেবে।

"অতএব আপনারাই বলুন, আমার পক্ষে আর কী করণীয় ছিল? আমি ওই হতভাগ্য প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যার হাতে আমাদের পারিবারিক মান-সম্মান, আমার ছেলের ভবিষ্যৎ, আমার এত যত্নে তৈরি-করা আইন-ব্যবসায়ী হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের সুনাম, সবকিছু নির্ভর করছে।" কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর স্বরগ্রামও উত্তরোত্তর চড়তে শুরু করল। তাঁর এই নাটকীয় কথা বলার ধরন আদালতে উপস্থিত জুরিদের সম্মোহিত করে রাখে। "হঠাৎ আমার মাথার মধ্যে যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল।"

একটু থেমে দম নিলেন স্যান্ডারসন। রোগ্যান এবং সার্জেন্ট চকিতে নিজেদের দৃষ্টি বিনিময় করলেন। ভদ্রলোক কি শেষপর্যন্ত সাময়িক উন্মত্ততার দোহাই দিতে যাচ্ছেন!

"ও আমার অফিস থেকে বেরিয়ে গেল। টেবিলের টানা থেকে রিভলভারটা হাতে নিয়ে

(এর পরে ৫০ পাতায়)

অরণ্যদেব লি ফক

যারা পরে শুরু করেছে : দশ বছর আগে...

এখানে থাকো। আমি যাচ্ছি বাবাবুর কাছে...

সবই সত্য।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি অরণ্যদেবের কথা। অদ্ভুত সব কাহিনী...

মিস পামার, আপনি ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিয়ে কি ওঁকেই করবেন ?

সেরকমই ইচ্ছে।

জঙ্গলের দুই 'সন্তানের' কাহিনী...

খুলিচিহ্ন... এ কী !

হুররে।

বাবাবুর সেনাদের অত্যাচারে লোকরা সন্ত্রস্ত। অন্য কারণে ভীত বাবাবুও...

এটা এখানে এল কী করে, আশ্চর্য !

আমি শিবিরে যাচ্ছি। সেনারা আমাকে ঘিরে থাকো।

দাম

?!

উঠে দাঁড়াও!

আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

যার মুণ্ডু চেয়েছিলে, তার কাছে।

গোষ্ঠীপতিবৃন্দ, এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাদের। ডাঃ লুয়াগা হলেন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। আর জেনারেল বাবাবু ক্ষমতা দখল করেছে বেআইনিভাবে। বলো, কে হবে বাঙ্গালার শাসক ?

নির্বাচিত ? সেটা কী ?

1/1

অরণ্যের দুই 'সন্তান' অবশেষে মুখোমুখি...

দু'জনে লড়ুক। যে বাঁচবে সেই হবে শাসক।

হাহা !

এটা কেমন বিচার হল !

অরণ্যদেব লি ফক

মৃত্যু পর্যন্ত লড়াই। যে জিতবে সেই হবে শাসক।
নির্বাচনের এটাই পদ্ধতি। তোমাকে ছিঁড়ে ফেলব লুয়াগা।
ন্যায্য বিচার হল না এটা। লুয়াগা শান্ত ডাক্তার আর বাবাবু মারকুটে গুণ্ডা।

তুমিই তো লামান্ডা লুয়াগা, যে সাগর পেরিয়ে বাইরে গিয়েছিল?
হ্যাঁ।
তবে লড়াই হোক।

দশ বছর আগে : দুই অরণ্য-সন্তান মুখোমুখি...
এবার আমার হাতে তোমার মরণ, ডাক্তার।
তোমার বুকনি দিয়েই মারতে চাও?
দাম
লুয়াগার বজ্রমুষ্টির আঘাত বাবাবুর চোয়ালে...

ওকে শেষ করে দাও একেবারে।
না, আমি ডাক্তার। খুনি নই।

অসাধারণ ডাঃ লুয়াগা। বক্সিং শেখা ছিল নাকি?
ইউরোপে শিখেছিলাম। ওলিম্পিকে লাইট হেভিওয়েটে সোনা পেয়েছিলাম।
অরণ্যদেব, আমরা জানতাম লুয়াগা...
...চ্যাম্পিয়ান বক্সার।

অবশেষে বাঙ্গালার বৈধ শাসক হিসেবে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট লুয়াগা...
একদিন দেখে নেব।
লু য়া গা
লু য়া গা
আর বাবাবুর স্থান হল কারাগারে।

এখন : দশ বছর পরে আবার...
সব ঠিকঠাক জেনারেল। আজ রাতেই।
এবার দেখে নেব লুয়াগাকে।
1/8
ক্রমশ

(৪৭ পাতার পর)

আমি ওকে অনুসরণ করে এখানে এলাম, এবং পেছন দিক থেকে ওর মাথা লক্ষ্য করে গুলি চালালাম। তারপর ফোন করলাম বাড়িতে। ফোন ধরেছিল পল। আমি পলকে বললাম ওদের দু'জনকেই আমার জরুরি দরকার। ওরা যেন এক তিল সময় নষ্ট না করে গাড়ি নিয়ে অফিসে চলে আসে। ওরা আসার পর আমি ওদের পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম। 'আমার আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা হিসেবে ওরা আমাকে উপদেশ দিল, আমি যেন পুলিশকে ডেকে সমস্ত ব্যাপারটা অকপটে জানিয়ে দিই। ওদের নির্দেশমতো তাই আমি করেছি।"

"আর ট্যাঙ্কার্সলের কাছে যে প্রমাণপত্র ছিল সেটা কোথায়?" জানতে চাইলেন রোগ্যান।

"মৃতদেহের পকেট থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে আমি সেটা টুকরো-টুকরো করে সেই ছেঁড়া টুকরোগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। তারপর ছাইগুলো কুড়িয়ে বেসিনে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিই। এখন আর তার কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সাক্ষ্যপ্রমাণ লোপের জন্যে আমি আপনাদের ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আশা করি আমার উদ্দেশ্যটা আপনারা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন। সাধারণের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখতে গিয়ে এতবড় একটা খুনের ঝুঁকিও আমাকে নিতে হয়েছে।"

রোগ্যান কোনও জবাব দেওয়ার আগেই বাইরের দরজার গায়ে জোরে-জোরে টোকা পড়ল। বোঝা গেল টেকনিক্যাল ইউনিটের লোকেরা সব এসে পড়েছেন। প্রিঙ্গল তাঁদের সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে এলেন। রোগ্যানের নির্দেশে তাঁরা ক্যামেরা এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে রুটিনমাফিক কাজ শুরু করে দিলেন। ক্যাপ্টেন আবার ফিরে গেলেন স্যান্ডারসনের কাছে।

"আপনার এই অকপট স্বীকারোক্তির আমি প্রশংসা করি।" সিনিয়ার স্যান্ডারসনকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন।

"সাধ্যমতো আমি আপনার কাজটাকে সহজ করে দিতে চাই, ক্যাপ্টেন।" অমায়িক হওয়ার ভান করলেন ভদ্রলোক। "তা ছাড়া আমার সামনে অন্য কোনও রাস্তাও আর খোলা নেই। মৃতদেহটা আমার অফিসঘরের মধ্যে পড়ে আছে। যে বুলেট হতভাগ্যের মৃত্যু ঘটিয়েছে সেটাও আমার রিভলভারের। এমনকী এখানে আসার আগে ট্যাঙ্কার্সলে হয়তো কারও কাছে বলে থাকতে পারে যে, সানির সঙ্গে তার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। এত কিছু অস্বীকার করে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা যে পণ্ডশ্রম মাত্র, তা আমি জানি।"

"তা হলে পরবর্তী কর্তব্য হচ্ছে আপনি আমাদের সঙ্গে পুলিশের সদর দপ্তরে চলুন। সেখানে আমরা আপনার বিবৃতিটা যথাযথভাবে টাইপ করে নেব। সেই টাইপ-করা কাগজের ওপর আপনি একটা সই করবেন।"

"এসব আমার জানা আছে।" স্যান্ডারসন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। "এবং আপনারাও যে সবরকম আইন মেনে কাজ করবেন, সে-বিষয়েও আমি নিশ্চিত।" তারপর নিজের ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বাকিটা শেষ করলেন, "আজ রাতে পুলিশ আমাদের সঙ্গে বর্বর আচরণ করেছে, তেমন কোনও অভিযোগ আমরা নিশ্চয় আনতে পারি না। ... পারি কি?"

"না... না, নিশ্চয় না!" দু' জনের মুখপাত্র হয়ে পলই জবাব দিল। রোগ্যানের দিকেও একঝলক তাকিয়ে দেখল সে। ওর বাবার মতো ওর গলাতেও বিদ্রূপের সুর ঝিলিক দিয়ে উঠল, "আমাদের মক্কেল স্বেচ্ছায় তাঁর বিবৃতি দিয়েছেন, এবং সে বিবৃতিটা সর্বাংশেই প্রায় সত্যি বলা চলে।"

"প্রায়... ?" রোগ্যান এতক্ষণ মনে-মনে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিলেন, সেটা যেন কোথায় একটা ধাক্কা খেল।

কবিতা

দাওয়াই

নির্মল বসাক

হয় যদি তোমাদের হাঁচি কাশি হাঁপানি
কখনো খেয়ো না ভাই চিনা আর জাপানি
ওষুধের দোকানের ঝাঁঝটাঝ নিয়ো না
তার চেয়ে ভাল ফল বাজালেই পিয়ানো
মাঝে-মাঝে চেখে যাও গ্লাসভরা চা-পানি
তার সাথে অনুপান ঝালমুড়ি মিয়ানো!

প্রিয়নাথ ঘটকের ফটকের বাঁ পাশে
ডানকান বেঁকে গিয়ে বাঁ হাতেই কাঁপ আসে
শিয়ালদহের ডানে একগলি ছাড়িয়ে
পশ্চিমে মুখ করে পাঁচবার দাঁড়িয়ে
বাঁ দিকে না দিগ্‌ভ্রম হয় যদি তখনো
সাথে নিয়ে ঢুকো তবে এক কেজি মাখনও!

অবিনাশ কবিরাজ রাজকবি আছিল
এড়ায় না চোখ তার একতিল আঁচিলও
ঘরে ঢুকে হাতে তার পাবে এক পুরিয়া
থাবা মেরে ফেলে দাও, যাক গুঁড়ো উড়িয়া
মেঝে থেকে চেটে খাও থেমে যাবে দাপানি
অবিনাশ হাসে দ্যাখো মাখনেতে মাখানো।

ছবি : দেবাশিস দেব

"ড্যাডের বিবৃতির মধ্যে মারাত্মক একটা ত্রুটি থেকে গেছে।" নিজের কথার খেই ধরে পল বলল, "এই ব্ল্যাকমেলের ব্যাপারে সানি ড্যাডকে কিছু বলেনি। বলেছিল আমাকে।"

"তাই বুঝি? তারপর আপনি আপনার বাবাকে কথাটা জানান?"

"অবশ্যই না। দাদার সঙ্গে পরামর্শ করে আমরা একমত হলাম যে, কথাটা তৃতীয় আর কাউকে জানানো উচিত হবে না। তাই আমি ড্যাডকে বললাম, আমার কিছু কাজ বাকি আছে, তিনি যেন অফিসের পর সানিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান। পরবর্তী ঘটনাবলী ড্যাড যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেইরকমই ঘটেছিল, তবে ড্যাড নয়, ট্যাক্কার্সলের জন্যে আমিই অপেক্ষা করেছিলাম। এবং গুলিটাও আমি করি।"

"আপনি... মানে...," বাকিটা শেষ না করেই মাঝপথে থেমে গেলেন রোগ্যান।

"দেখুন ক্যাপ্টেন, আমার ছেলে কিন্তু উলটো কথা বলছে।" সিনিয়ার স্যান্ডারসন নিজের চেয়ারে নড়েচড়ে বসলেন। "এখন আপনি কার কথা সত্যি বলে বিশ্বাস করবেন?"

"আপনার বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেই উত্তরটা পেয়ে যাব।" রোগ্যান এবার জুনিয়ার হোরাশের দিকে ফিরে তাকালেন। "ব্ল্যাকমেলের কথাটা আপনি কাকে জানিয়েছিলেন, বাবাকে না ছোট ভাইকে? কার সঙ্গে আপনি আজ বাড়ি ফেরেন?"

সানি মুখ নামিয়ে একদৃষ্টে পালিশ-করা টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইল। ওর গলার স্বরও খুব মৃদু। আড়ষ্ট ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রতিটি শব্দ যেন বেশ কষ্ট করে বাইরে ঠেলে দিচ্ছে।

"কাউকেই আমি জানাইনি," বিড়বিড় করে ও বলল, "আর বাড়িতেও আমি যাইনি। আমি বলেছিলাম আমার কয়েকটি দরকারি কাজ বাকি থেকে গেছে। তাই ড্যাড যেন আমাকে রেখে পলের সঙ্গে বাড়ি ফিরে যান। ট্যাক্কার্সলে আসার পর ওকে বললাম যে আমি মাত্র পনেরো হাজার ডলার জোগাড় করতে পেরেছি। ও তাতে রাজি হল না। ওর ধারণা আমাকে এই অবমাননার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে ড্যাড নিশ্চয় বাকি দশ হাজার দিয়ে দেবেন। আমি ওকে পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, এ-কথাটা আমি ড্যাডের কাছে গোপন রাখতে চাই। শুনে ও আমাকে উপহাস করল। বলল, আগামীকাল দুপুর বারোটার সময় ও আবার আসবে। ইতিমধ্যে আমি যেন পুরো পঁচিশ হাজার জোগাড় করে রাখি। নইলে, ড্যাড আগে আপনাকে যা বলেছেন সেইমতো সমস্ত কাগজপত্র ও বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেবে বলে হুমকি দিল। সেটা ঘটতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই ও যখন চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল, আমি ওকে গুলি করলাম।"

"রিভলভারটা পেলেন কোত্থেকে?"

"ড্যাডের ড্রয়ার থেকে। তিনি এটা কোথায় রাখেন আমি জানতাম।"

"দাঁড়ান... দাঁড়ান, আগে আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে নিতে দিন। ট্যাক্কার্সলে আপনার অফিস থেকে বেরোলেন, আপনি দৌড়ে গিয়ে আপনার বাবার ঘরে ঢুকলেন, টানা থেকে রিভলভারটা বের করলেন, তারপর..."

"না...না," মাঝপথে বাধা দিলেন সানি। "ট্যাক্কার্সলের সঙ্গে কথা বলার সময় আমি ড্যাডের ঘরেই ছিলাম। টাকাটা আমি তাঁর ঘরের সিন্দুকেই রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে যদি পনেরো হাজারে রফা করা যায়, তা হলে সঙ্গে-সঙ্গে টাকাটা ওকে দিয়ে দেব।"

"আর আপনি?" রোগ্যান এবার ছোট ভাইয়ের দিকে তাকালেন। "আপনার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎটা কোথায় হয়েছিল?"

"আমি এখানে সকলের চেয়ে ছোট," শান্ত গলায় জবাব দিল পল। "আমার অফিস-ঘরটাও খুব ছোট। তা ছাড়া আমার টেবিলের ওপর কাগজপত্র সব এলোমেলো অবস্থায় ছড়ানো থাকে। তাই ড্যাড যখন থাকেন না, তখন আমি আমার মক্কেলদের ড্যাডের ঘরে নিয়ে যাই।"

চারদিক থেকে বেশ আঁটঘাট বেঁধেই পরিকল্পনাটা ফাঁদা হয়েছে, বিষণ্ণ মনে চিন্তা করলেন রোগ্যান। ট্যাক্কার্সলের আঙুলের ছাপ কেবলমাত্র সিনিয়ার স্যান্ডারসনের অফিস-ঘরেই পাওয়া যাবে, তিনজনের কাহিনীই সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

"আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সম্পর্কটা খুব গাঢ়।" স্যান্ডারসন ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, "আমি আমার দুই ছেলেকে বললাম, আমিই আসলে অপরাধী। ওরা যেন এ-ব্যাপারে কোনওভাবে নাক না গলায়। কিন্তু আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের স্বভাব-চরিত্র তো আপনি বেশ ভালই জানেন, বড়দের কোনও শ্রদ্ধাভক্তি করে না।"

"আপনাদের মধ্যে কোনও একজন ট্যাক্কার্সলেকে খুন করেছেন।" স্বগতোক্তির সুরে রোগ্যান বললেন, "তারপর সেই লোক অন্য দু'জনকে অফিসে আসার জন্যে খবর পাঠান। শেষে তিনজনে মিলে যুক্তি করে পুরো ব্যাপারটাকে এমনভাবে তালগোল পাকিয়ে তোলেন।"

"এটা একেবারে খাঁটি কথা বলছেন!" স্মিত হাসলেন স্যান্ডারসন। "তা হলে দেখা যাচ্ছে দুটো স্বীকারোক্তি অবশিষ্ট পড়ে রইল। খুবই গোলমেলে ব্যাপার, তাই না? আমাদের মধ্যে কোনও একজনকে যদি অপরাধী হিসেবে গ্রেপ্তার করেন, তবে আর দু'জন বলবে তারাই আসল খুনি। আদালতে আমাদের কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আনাই আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না, দোষী প্রতিপন্ন করা তো অনেক দূরের কথা।"

"এ-নিয়ে যেন বাজি ধরতে যাবেন না, মিঃ স্যান্ডারসন," রোগ্যান কাঁধ ঝাঁকালেন, "আপনি এই মিথ্যে স্বীকারোক্তি দিয়ে আপনার এবং আমার দু'জনেরই সময় নষ্ট করলেন।"

"শুধুমাত্র দুটো স্বীকারোক্তি মিথ্যে," পল বিড়বিড় করল, "কিন্তু কোনও একজন তো সত্যি কথাই বলছে।"

রোগ্যান পলের কথায় কান দিলেন না। বললেন, "প্রথমে আমরা ধরে নেব আপনারা প্রত্যেকেই এই খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, এবং সেটা ধরে নিয়েই আমরা আমাদের নিজেদের মতো করে তদন্তের কাজ চালিয়ে যাব। এমন অনেক মামলারই আমরা সমাধান করেছি, যেখানে কেউ আগ বাড়িয়ে নিজেকে অপরাধী বলে স্বীকারোক্তি দিতে আসেনি।" অবশেষে কথার সুরে একটু ব্যঙ্গের ঝাঁজ না মিশিয়ে থাকতে পারলেন না, "অনেক সময় মক্কেলদের মধ্যে থেকেও কাউকে-কাউকে আমরা প্রকৃত অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত করি।"

"অবশ্যই আপনি তা করেন।" স্যান্ডারসনও আন্তরিকভাবে কথাটা স্বীকার করলেন। "আমাদের এই শহরে পুলিশ বিভাগ সত্যিই খুব দক্ষ। আমি খুব আগ্রহ নিয়েই আপনাদের কাজকর্ম লক্ষ করব।" তাঁর দু'চোখের দৃষ্টি এবার রোগ্যানকে পেরিয়ে আরও পেছন দিকে চলে গেল। মর্গের কর্মচারীরা মৃতদেহের ওপর একটা সাদা চাদর চাপা দিয়েছে। এটা হচ্ছে মৃতদেহটা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতিপর্ব। "কোনও তদন্তের শুরুটা সচরাচর আমার দেখার সৌভাগ্য হয় না। তবে আমার খুবই আশঙ্কা হচ্ছে, এখান থেকে যে-সমস্ত তথ্যপ্রমাণ আপনি সংগ্রহ করবেন, আখেরে সেটা আপনার কোনও কাজে আসবে না। এই যেমন আঙুলের ছাপের কথাই ধরুন না কেন! বিশেষ করে খুনের মামলার পক্ষে এটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা আমি জানি। কিন্তু আপনার জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে আমরা সবাই এত বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম যে, এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারিনি। ছটফট করে ঘুরে বেড়াতে-বেড়াতে কখনও ডেস্কের টানা খুলেছি, কখনও দরজার পাল্লা ধরে টেনেছি, অর্থাৎ

তিনজনের আঙুলের ছাপই ঘরের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।"

"অপরপক্ষে বলা যায়," রোগ্যান ব্যাখ্যা করে বললেন, "এই খুনটা যিনি করেছেন, ট্যাঙ্কার্সলে এখানে হাজির হওয়ার পর থেকে তিনি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপের বিবরণ আর দু'জনকে জানিয়েছেন। তখন সেই দু'জনও এই খুনির ভূমিকায় নিখুঁতভাবে অভিনয় করে যান, এবং ঘটনা ঘটার সময় প্রকৃত অপরাধী যেসব জিনিস স্পর্শ করেছিলেন তাঁরাও বেছে-বেছে সেই সমস্ত জায়গায় নিজেদের আঙুলের ছাপ রেখে দেন। আপনারা তিনজনেই যে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

"সেটা তো খুবই স্বাভাবিক!" স্যান্ডারসন চোখে-মুখে অনুশোচনার ছাপ ফুটিয়ে তুললেন, তবে তা যে ভাঁড়ামির নামান্তর মাত্র বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। "সত্যি বলতে কী, এর চেয়ে আরও বেশি নিন্দনীয় কাজও আমরা করেছি। ছাদের নীচের দিকে দেওয়ালের গায়ে আমি আপনাকে একটা ছিদ্র দেখিয়েছিলাম, রিভলভারের গুলির ফলে যার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের মধ্যে যে দু'জন নিরপরাধ তারাও ওই জায়াগাটা তাক করে দুটো গুলি ছুড়েছে। এটা যদি দেওয়ালের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক, তবে পরীক্ষায় প্রমাণিত হবে তিনজনের প্রত্যেকেই সম্প্রতি এই রিভলভারটা ব্যবহার করেছে।"

এই বুড়ো বাস্তুঘুঘুটা সবকিছু বেশ জমিয়ে উপভোগ করছে, ব্যাজার মুখে চিন্তা করলেন রোগ্যান। সাধারণত যখন তাঁর মক্কেলরা কোনও বড়রকমের গন্ডগোল পাকিয়ে বসে, এবং অকুস্থলে পুলিশ গিয়ে যাবতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে ফেলে, তখনই জট ছাড়াতে এই ধুরন্ধর আইনজীবীর ডাক পড়ে। কিন্তু এই প্রথম পুলিশের আগেই তিনি অকুস্থলে হাজির হওয়ার সুযোগ পেলেন, আর এমনভাবে মঞ্চটাকে সাজিয়ে রাখলেন যাতে তিনি যা দেখাতে চান পুলিশ শুধুমাত্র সেইটুকুই দেখতে পায়। যে-কোনও একজন পুলিশ কর্মচারীর চেয়ে তিনি অনেক বেশি খুনের মামলার তদারকি করেছেন। পুলিশ কোন পথে কীভাবে এগোবে সবই তিনি অনুমান করতে পারেন। সেইসঙ্গে এমন কিছুও ভেবে রাখতে পারেন, যেটা পুলিশের ধারণার অতীত।

"আপনি কি চিন্তিত, ক্যাপ্টেন?" সিনিয়ার স্যান্ডারসনের গলায় সূক্ষ্ম বিদ্রূপের খোঁচা।

"আমি এখন কাজের সময়সূচিটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।" কথা বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে রোগ্যান সিনিয়ার স্যান্ডারসন এবং তাঁর বড় ছেলের মাঝখানে টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। "আপনি বললেন আপনার দুই ছেলে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় অফিস ছেড়ে বেরিয়েছিল।" ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকালেন তিনি। "এখান থেকে বাড়ি পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগে?"

"সাধারণত মিনিট পঁচিশ।"

"আর আপনি ফোন করেছিলেন ক'টার সময়?"

"ছ'টা পনেরোয়। ট্যাঙ্কার্সলের সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশি সময় লাগেনি।"

"তা হলে ধরা যেতে পারে ছ'টা চল্লিশে দু'জনে আবার অফিসে ফিরে আসেন, তাই না?"

"মিনিট পাঁচেক এদিক-ওদিক হতে পারে।"

"অতএব নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করার জন্যে আপনারা পুরো একঘণ্টা সময় পেয়েছিলেন। তারপর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সেইমতো মঞ্চও সাজিয়েছেন। আমি আপনার সঙ্গে একমত হতে বাধ্য, মিঃ স্যান্ডারসন যে, এখান থেকে এমন কোনও প্রামাণিক তথ্য আমরা খুঁজে পাব না যার সাহায্যে প্রকৃত হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা সম্ভব।" স্যান্ডারসনের ঠোঁটের ফাঁকে পরিতৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য অল্প সময় দিলেন রোগ্যান, তারপর বললেন, "কিন্তু আপনারা কোন দু'জন বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন সেটা খুঁজে বের করা অপেক্ষাকৃত অনেক সহজ।"

চকিতে জুনিয়ার হোরাশের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, এবং মাথাটা ঝুঁকিয়ে নিজের মুখটা একবারে জুনিয়ারের মুখের সামনে নিয়ে গেলেন। "আমাকে বলুন, সানি," প্রায় গর্জন করে উঠলেন রোগ্যান, "কে আজ গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন?"

"সাধারণত ড্যাড-ই...," আমতা-আমতা করে মাঝপথে থেমে গেল জুনিয়ার। বুকভরে শ্বাস নিল একবার। "মানে... আমি বলতে চাই, আজ বিকেলে গাড়িটা কে ড্রাইভ করেছিল আমার জানা নেই। কারণ আমি আজ বাড়ি ফিরে যাইনি। আগেই তো আপনাকে জানিয়েছি, আমি অফিসেই থেকে গিয়েছিলাম। আমি... আমি..." বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় জুনিয়ার স্যান্ডারসন বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

"ছেলেটাকে ওভাবে পীড়ন করবেন না।" শান্ত গলায় স্যান্ডারসন বললেন, "ওর যা কিছু বলার ও তো আগেই আপনাকে বলেছে।"

"কিন্তু এখন উনি এক ভিন্ন কাহিনী শোনাতে যাচ্ছিলেন। উনি বলতে যাচ্ছিলেন যে, আপনিই চালকের আসনে বসেছিলেন। আর আপনার পাশে বসেছিলেন আপনার বড় ছেলে সানি।"

"আসলে তো তাই ঘটেছে।" সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল পল। "এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আগাগোড়া আমি সত্যি কথাই বলে আসছি।"

"অর্থহীন কথা বলবেন না, ক্যাপ্টেন!" সিনিয়ারের গলায় ধমকের সুর। "সানি বলতে যাচ্ছিল যে আমিই সাধারণত গাড়ি ড্রাইভ করি। আর সেটাই সত্যি। আমরা যখন তিনজনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরি, তখন গাড়িটা চালাই আমি নিজে। কিন্তু আজ বিকেলে আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম না। তাই আমার বিশ্বাস, পলই চালকের আসনে বসেছিল। সেইরকমই হওয়ার কথা। কি, ঠিক বলিনি সানি?"

"হ্যাঁ... হ্যাঁ, গাড়ি চালাতে আমার আদৌ ভাল লাগে না।"

এবং পুলিশকে টোপ দিয়ে ফাঁদে ফেলার খেলাটাও তোমার বিশেষ পছন্দ নয়, মনে-মনে রোগ্যান ভাবলেন। সিনিয়ার স্যান্ডারসন আর পল সবরকম ঝড়ঝাপটার সঙ্গে লড়াই করেও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সানিকে দেখে মনে হচ্ছে ও বুঝি এখনই ভেঙে পড়বে। ওর ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহ হয় ও-ই প্রকৃত অপরাধী। তবে নিছক সন্দেহের ওপর নির্ভর করে রোগ্যান এক পাও এগোতে পারবেন না। ওকে যে নিজের অপরাধের জন্য ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে হয়েছে তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। তাই আজ সন্ধের এই ঘটনার জন্য মুখ্যত ও-ই দায়ী, এমনকী, গুলিটা যদি অন্য কেউ করে থাকে, তা হলেও।

রোগ্যান দু'পা এগিয়ে গিয়ে প্রিঙ্গলের সঙ্গে নিচু সুরে কিছু পরামর্শ করলেন, তারপর আবার স্যান্ডারসনের কাছে ফিরে এলেন।

"নতুন কোনও প্রশ্ন কি আপনার মাথায় এল, ক্যাপ্টেন?" জানতে চাইলেন সিনিয়ার।

"সেই একই প্রশ্ন," জাবাব দিলেন রোগ্যান। "আপনাদের তিনজনের মধ্যে আসল খুনি কে? তবে এর উত্তরের জন্যে আমরা এখন এমন সব জায়গায় খোঁজখবর শুরু করব, যেখানকার তথ্যপ্রমাণে ভেজাল মেশাবার সুযোগ এখনও আপনারা করে উঠতে পারেননি। যেমন আপনার বাড়ি এবং আপনার গাড়ি।"

"আপনার চিন্তাভাবনার মধ্যে সারবস্তুর অভাব নেই," সপ্রশংস গলায় রোগ্যান বললেন, "যখন আপনি দোষী ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারছেন না, তখন কোন দু'জন নির্দোষ, প্রথমে তাদের খুঁজে বের করে নিতে চাইছেন। এই বিল্ডিংয়ের নীচেই গ্যারাজের মধ্যে গাড়িটা পার্ক করা

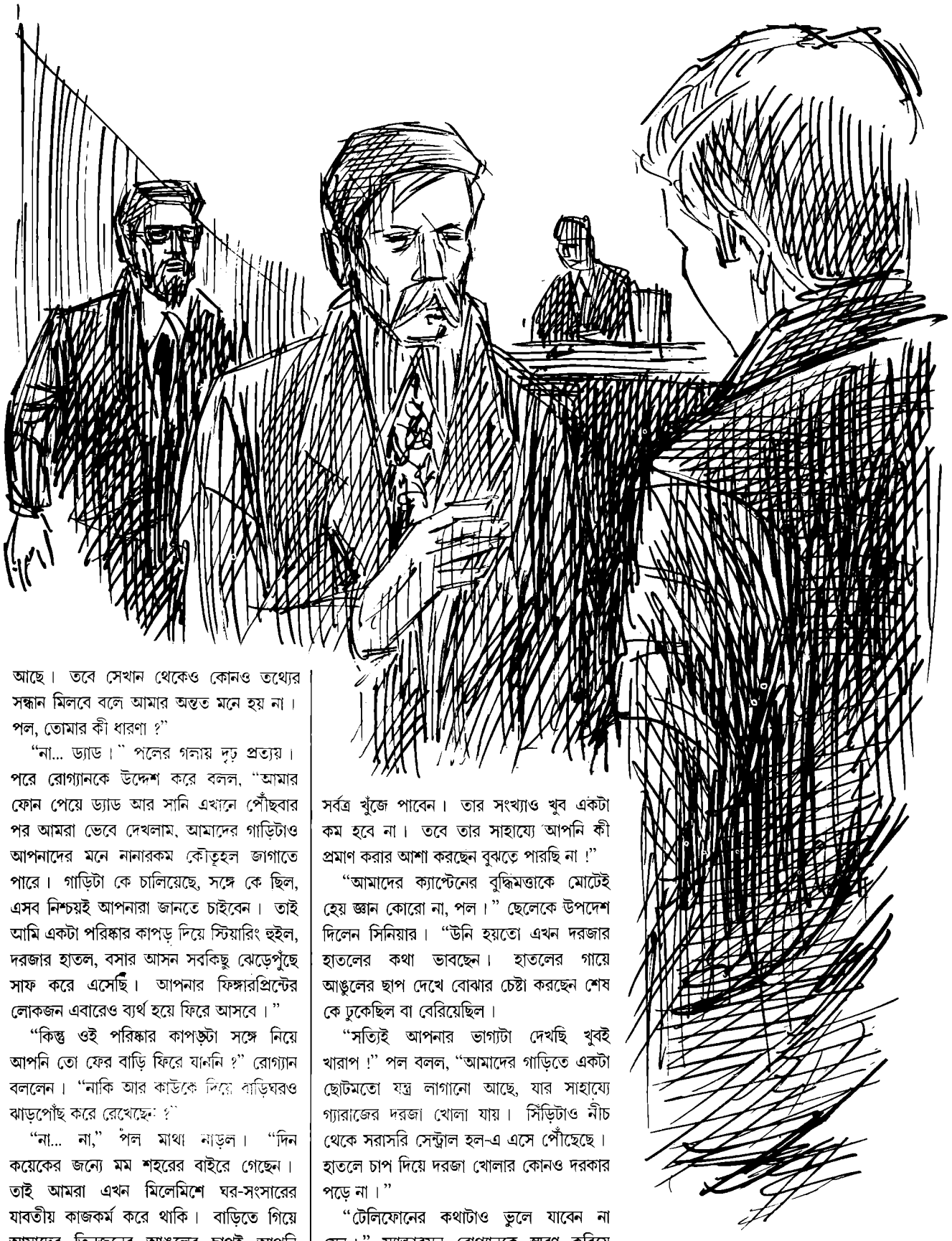

আছে। তবে সেখান থেকেও কোনও তথ্যের সন্ধান মিলবে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। পল, তোমার কী ধারণা ?"

"না... ড্যাড।" পলের গলায় দৃঢ় প্রত্যয়। পরে রোগ্যানকে উদ্দেশ করে বলল, "আমার ফোন পেয়ে ড্যাড আর সানি এখানে পৌঁছবার পর আমরা ভেবে দেখলাম, আমাদের গাড়িটাও আপনাদের মনে নানারকম কৌতূহল জাগাতে পারে। গাড়িটা কে চালিয়েছে, সঙ্গে কে ছিল, এসব নিশ্চয়ই আপনারা জানতে চাইবেন। তাই আমি একটা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে স্টিয়ারিং হুইল, দরজার হাতল, বসার আসন সবকিছু ঝেড়েপুঁছে সাফ করে এসেছি। আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্টের লোকজন এবারেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে।"

"কিন্তু ওই পরিষ্কার কাপড়টা সঙ্গে নিয়ে আপনি তো ফের বাড়ি ফিরে যাননি ?" রোগ্যান বললেন। "নাকি আর কাউকে দিয়ে বাড়িঘরও ঝাড়পোঁছ করে রেখেছেন ?"

"না... না," পল মাথা নাড়ল। "দিন কয়েকের জন্যে মম শহরের বাইরে গেছেন। তাই আমরা এখন মিলেমিশে ঘর-সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকি। বাড়িতে গিয়ে আমাদের তিনজনের আঙুলের ছাপই আপনি সর্বত্র খুঁজে পাবেন। তার সংখ্যাও খুব একটা কম হবে না। তবে তার সাহায্যে আপনি কী প্রমাণ করার আশা করছেন বুঝতে পারছি না !"

"আমাদের ক্যাপ্টেনের বুদ্ধিমত্তাকে মোটেই হেয় জ্ঞান কোরো না, পল।" ছেলেকে উপদেশ দিলেন সিনিয়ার। "উনি হয়তো এখন দরজার হাতলের কথা ভাবছেন। হাতলের গায়ে আঙুলের ছাপ দেখে বোঝার চেষ্টা করছেন শেষ কে ঢুকেছিল বা বেরিয়েছিল।

"সত্যিই আপনার ভাগ্যটা দেখছি খুবই খারাপ !" পল বলল, "আমাদের গাড়িতে একটা ছোটমতো যন্ত্র লাগানো আছে, যার সাহায্যে গ্যারাজের দরজা খোলা যায়। সিঁড়িটাও নীচ থেকে সরাসরি সেন্ট্রাল হল-এ এসে পৌঁছেছে। হাতলে চাপ দিয়ে দরজা খোলার কোনও দরকার পড়ে না।"

"টেলিফোনের কথাটাও ভুলে যাবেন না যেন।" স্যান্ডারসন রোগ্যানকে স্মরণ করিয়ে

দিলেন। "আমি জানিয়েছি পলই আমার ফোন ধরেছিল। তা যদি সত্যি হয় তবে ওর আঙুলের ছাপই সকলের ওপরে থাকবে। কিন্তু ও যদি নিজের ঘর থেকে ফোনটা রিসিভ করে, তা হলে বিশেষ কিছু প্রমাণ করা শক্ত। কেননা ওর ঘরের ফোনে ওর আঙুলের ছাপ থাকাটাই স্বাভাবিক।"

"সার," পল বলল, "ড্যাড যদি তাঁর শোওয়ার ঘর থেকে আমার ফোনটা ধরে থাকেন, সে ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।"

"এবারে সানি, বৃত্তটা আপনি সম্পূর্ণ করুন।" নিরাসক্ত গলায় রোগ্যান বললেন। "আপনি যখন বাড়িতে প্রথম ফোন করেন তখন প্রথমে কার সাড়া পেয়েছিলেন?"

"পলের। তবে আমি ওকে বলেছিলাম, ও যেন লাইনটা ড্যাডকে দেয়। আমি ড্যাডের সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষীর সম্ভাবনার কথাটা ভুলে যাচ্ছেন না?" বাধা দিয়ে স্যান্ডারসন বললেন।

"আশা করি আপনি নিজেও তা ভুলে যাননি?" রোগ্যান জবাব দিলেন।

"ছেলেরা আমাকে নিশ্চিতভাবে জানিয়েছে যে, যখন ওরা অফিস থেকে বেরিয়ে যায় তখন লিফ্‌টে বা নীচের গ্যারাজে কেউ ছিল না। এবং ওরা যখন আবার এখানে ফিরে আসে তখনও সারা বিল্ডিংটা বিলকুল ফাঁকা ছিল। এ-বিষয়ে যদি আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হতাম তবে এমন একটা পথ কখনও বেছে নিতাম না।"

"কিন্তু পথঘাট তো আর জনশূন্য ছিল না।" রোগ্যান তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন কথাটা। "আপনি কখনওই পুরোপুরি জোর দিয়ে বলতে পারেন না যে মাঝ রাস্তায় কেউ আপনাকে চিনে ফেলেনি, কেউ সাক্ষী দিতে আসবে না যে, সে আপনাকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেনি।"

"না... না, তা কেন হবে! অনেকেই গাড়িটা দেখে থাকবে।" স্যান্ডারসন মাথা নেড়ে রোগ্যানের কথায় সায় দিলেন। "কিন্তু তখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। শহর জুড়ে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ওই অবস্থায় চলন্ত গাড়ির মধ্যে কেউ আমাকে নিশ্চিতভাবে চিনে ফেলবে, এটা কখনও সম্ভব হতে পারে না। বিশেষত আমাদের তিনজনের চেহারার মধ্যে সাদৃশ্য যখন এত প্রকট তখন তো আলাদা করে কাউকে চেনা খুবই দুঃসাধ্য।"

অতএব, মনে-মনে রোগ্যান নিজেকে বললেন, 'এখন আমাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আর কোনও পথ নেই। স্যান্ডারসন তাঁর প্রতিটি চালই আগে থেকে নিখুঁতভাবে ছকে রেখেছেন। এমনকী, আমি কী ভাবব সেটা আমার আগেই তিনি ভেবে রেখে দেন।'

তিনজনকে টেবিলের চারপাশে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে দিয়ে রোগ্যান ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। স্যান্ডারসন যখন পুলিশ কর্মচারীর মানসিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে এত বেশি ওয়াকিবহাল, তখন আমি পুলিশি ভাবনাচিন্তা মন থেকে সরিয়ে দিয়ে অপরাধীর মনের মধ্যে প্রবেশের পথ খুঁজব। কোথাও-না-কোথাও একটা ভুল সে নিশ্চয় করে থাকবে।

তিনি এবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দিকে ফিরে তাকালেন। সিনিয়ার স্যান্ডারসন আর পল নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কথাবার্তায় ব্যস্ত। সানি উদ্বিগ্ন চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। কাকে এখন সানি বেশি ভয় পাচ্ছে, মনে-মনে চিন্তা করলেন রোগ্যান, ওর বাবাকে, না আমাকে? খুনের দায়ে ওকে অভিযুক্ত করা হতে পারে ভেবেই কি সানি ভয়ে কাঁপছে? না কি ওর বাবার শেখানো মিথ্যেটাকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখা সম্ভব নয় বলেই শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। জুনিয়ার ক্রমশই তার সহনশক্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁছচ্ছে। আমি যদি ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ একা কথা বলতে পারতাম তবে ওর প্রতিরোধের বাঁধ ভেঙে যেত। কিন্তু অন্য দু'জন সেটা কিছুতেই ঘটতে দেবে না।

রোগ্যান পায়ে-পায়ে হোরাশ জুনিয়ারের অফিস-ঘরে ঢুকে ডেস্কের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। ডেস্কের ওপরটা একবারে পরিষ্কার। হয় হোরাশ জুনিয়ার অসম্ভব কাজের লোক, কোনও কাগজপত্রই টেবিলের ওপর ফেলে-ছড়িয়ে রাখে না, আর নয়তো কোনও কাজই ওকে করতে দেওয়া হয় না। ডেস্কের টানাগুলোও বিলকুল ফাঁকা। তাই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই সত্যি বলে মনে হয়। সার্জেন্ট প্রিঙ্গল ভেতরে এসে জানালেন, পল যা বলেছিল সেটাই ঠিক। গাড়ির মধ্যে থেকে সামান্য কোনও সূত্রের হদিসও পাওয়া যায়নি।

"খুবই কঠিন মামলা, ক্যাপ্টেন!" সমবেদনার সুরে সার্জেন্ট বললেন। "আপনি কি বিশেষ কাউকে সম্ভাব্য খুনি বলে মনে করছেন?"

"আমার ধারণা এটা সানির কাজ।" জবাব দিলেন রোগ্যান। "ওর বাবা আর ছোটভাই দু'জনেই খুব ধুরন্ধর আর পাঁকাল মাছের মতোই পিচ্ছিল। যে-কোনও মিথ্যেকে ওরা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে। ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসার সবরকম উপায়ই ওদের জানা। ওদের দু'জনের মধ্যে কেউ যদি ট্যাঙ্কার্সলেকে খুন করে থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই এমন কোনও পালাবার পথ ভেবে রাখবে না, যাতে চাপের মুখে সানি ভেঙে পড়লেই তার সব পথ বন্ধ হয়ে যায়। সানি যদি খুনি হয় তবে এই তিনরকমের স্বীকারোক্তির মধ্যে ওকে তারা নির্ভেজাল সত্যি ছাড়া আর কিছু বলার অনুমতি দেবে না। সেক্ষেত্রে আমাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরই ওর জানা, কেবলমাত্র অন্য দু'জনকেই বেশি করে উপস্থিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে।"

"ছেলেটাকে দেখে খুবই নার্ভাস প্রকৃতির মনে হয়।" প্রিঙ্গল জানালেন, "খুবই দুঃখের ব্যাপার যে, ওকে আপনি একটু আড়ালে ডেকে জেরা করার সুযোগ পেলেন না।"

"সে সুযোগও হয়তো আমি পেয়ে যেতে পারি। আমি এখন শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করার কথা ভাবছি।"

"ট্রাফিক স্কোয়াডের লোকেরা নেশাগ্রস্ত ড্রাইভারদের জন্যে যে ধরনের পরীক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে আপনি কি তার কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ।" রোগ্যান মাথা ঝাঁকালেন। "তুমি কি খুব তাড়াতাড়ি এখানে একটা মেশিন আনার ব্যবস্থা করতে পারো?"

"এখনই?" প্রিঙ্গলকে একটু বিভ্রান্ত দেখাল। তবে তিনি এ-সম্পর্কে আর কোনও প্রশ্ন করলেন না। প্রিঙ্গল যখন ফোন করতে ব্যস্ত ছিলেন তখন রোগ্যান এগিয়ে গিয়ে সিনিয়ার স্যান্ডারসনের অফিস-ঘরে ঢুকলেন। সেখান থেকে ফিঙ্গার প্রিন্টের লোকেরা এত ভূরি-ভূরি আঙুলের ছাপের নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন যে, তার সাহায্যে এই হত্যা-রহস্যের কোনও সূত্রই উদ্ধার করা গেল না। সেখান থেকে বেরিয়ে পলের ঘরে উঁকি দিলেন রোগ্যান। ছেলেটা ঠিকই বলেছিল, ওর ঘরটাই সবচেয়ে ছোট। টেবিলের ওপর সব কাগজপত্র এলোমেলো অবস্থায় পড়ে আছে। সার্জেন্ট যখন ঘোষণা করলেন যে অভীষ্ট মেশিন সঙ্গে নিয়ে এক অফিসার হাজির হয়েছেন, রোগ্যান তখন সকলকে ডেকে নিয়ে গিয়ে আবার সেই টেবিলের কাছে পৌঁছলেন।

"মনে হচ্ছে খুব বেশিদূর এগোতে পারেননি, ক্যাপ্টেন?" স্যান্ডারসনের ঠোঁটের ফাঁকে বাঁকা হাসির রেখা।

"যে দু'জন মিথ্যে বলছেন, আমি এখনও আমার তালিকা থেকে সেই দু'জনকে ছেঁটে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।" রোগ্যান জানালেন, "আমরা খবর পেয়েছি, ফোনটা আমার মিনিট কুড়ি আগে দু'জনে বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর ফোনে খবর পেয়ে আবার এখানে এসে হাজির হন। এখন প্রশ্ন, ওই কুড়ি মিনিট তাঁরা কীভাবে কাটিয়েছিলেন?"

"খুবই সাড়াজাগানো প্রশ্ন!" মাথা নেড়ে স্বীকার করলেন স্যান্ডারসন। "কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত

বাড়ি ফেরার কথা যখন কেউ-ই আমরা স্বীকার করছি না, তখন এ-প্রশ্নের কোনও উত্তরও আপনি পাবেন না।"

"সেক্ষেত্রে ব্যাপারটা আমাকে অনুমান করে নিতে হবে। একজন সফল আইনজীবী দিনভর কঠোর পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে কী করেন? আমার বিশ্বাস, তিনি একপাত্র পানীয় নিয়ে বসেন। কি, ঠিক বলছি না?"

"একবারে নির্ভেজাল খাঁটি কথা বলেছেন।" স্যান্ডারসন সায় দিলেন। "আমার নিজের পছন্দের পানীয় হচ্ছে ড্রাই ম্যার্টিনি। কিন্তু এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না বর্তমান প্রসঙ্গের সঙ্গে তার যোগসূত্রটা কী?"

"আমি একটা ছোট্ট পরীক্ষা করতে যাচ্ছি। আশা করি আপনারা সকলেই আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আমরা এখানে এমন একটা মেশিন এনে হাজির করেছি যার সাহায্যে বুঝতে পারা যায় রক্তের মধ্যে শতকরা কত ভাগ অ্যালকোহল রয়েছে। যদি আপনারা তিনজনেই এই নলে মুখ দিয়ে হাওয়া ছাড়েন এবং বুঝতে পারা যায় তার মধ্যে দু'জন সম্প্রতি পানীয় গ্রহণ করেছেন, ...তা হলে আপনারা নিশ্চয়ই আমার বক্তব্য ঠিকমতো বুঝতে পারছেন?"

"আপনি বলতে চান, দু'জনে যখন নিজের-নিজের ঘরে বসে পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল, তখন তৃতীয়জন এই খুনের কাজে লিপ্ত ছিল? সত্যিই আপনার উদ্ভাবনী শক্তির তারিফ না করে পারা যায় না।" প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে স্যান্ডারসন মাথা নাড়লেন। "এই জিনিসটা আমি আগে কখনও দেখিনি। তবে এটা কীভাবে কাজ করে, জানার খুব ইচ্ছে আছে।"

বাক্সের মতো যন্ত্রটাকে অফিসের টেবিলের ওপর রেখে যন্ত্রের গায়ে লাগানো একটা ডায়াল ঘোরালেন। তারপর ভেতর থেকে একটা সরু টিউব বের করে স্যান্ডারসনের হাতে দিলেন।

"আপনি শুধু নলে মুখ দিয়ে জোরে ফুঁ দিন।" নির্দেশ দিলেন রোগ্যান। "ডায়ালের কাঁটা দেখে আমরা বুঝতে পারব আপনি অ্যালকোহল জাতীয় কোনও পানীয় গ্রহণ করেছেন কি না।"

রোগ্যানের নির্দেশমতো স্যান্ডারসন নলে মুখ দিয়ে জোরে ফুঁ দিলেন। ডায়ালের কাঁটাটা শূন্যের ঘরেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অফিসার এবার নলটা পলের হাতে দিলেন। তার শ্বাস-প্রশ্বাসেও অ্যালকোহলের কোনও হদিস পাওয়া গেল না।

"সম্ভবত আপনার এ-মতলবটাও ফলপ্রসূ হল না!" ঠাট্টার সুরে স্যান্ডারসন বললেন। যন্ত্রটা এখন তাঁর বড় ছেলে সানির কাছে হাজির করা হয়েছে। "আপনার যুক্তির মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক থেকে গেছে, ক্যাপ্টেন। আমরা সভ্যসমাজের বাসিন্দা। ডিনারের আগে পানীয় গ্রহণ করাটা আমাদের কাছে একটা পারিবারিক অনুষ্ঠানের মতো। আমরা সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে সেই অনুষ্ঠান পালন করি। গাড়ি থেকে নেমেই সোজা বারের দিকে ছুটি না।" তিনি এবার তাঁর বড় ছেলের দিকে ফিরে তাকালেন। ভ্রূকুটিভরা দৃষ্টিতে সানি মেশিনটার দিকে তাকিয়ে ছিল। "নলে ফুঁ দাও, সানি। ভয় নেই, ওটা তোমাকে কামড়াবে না।"

"এটা একটা অর্থহীন ব্যাপার।" ব্যাজার মুখে সানি বলল।

"কথা শোনো, সানি।" আদেশ দিলেন বাবা। "ক্যাপ্টেনকে তাঁর কাজ শেষ করতে দাও।"

অফিসার টিউবটা সানির মুখের কাছে এগিয়ে ধরলেন। তার ভ্রূজোড়া আরও বেশি করে কুঁচকে গেল। তবে বাবার নির্দেশমতো টিউবে ফুঁ দিল সে। ডায়ালের কাঁটাটা বাঁ দিকে ঘুরে গেল।

"অ্যালকোহলের পরিমাণ দশমিক শূন্য আট।" ডায়ালের দিকে ঝুঁকে পড়ে অফিসার জানালেন, "ভদ্রলোকের শরীরের ওজন অনুযায়ী বোঝা যাচ্ছে তিনি প্রায় আউন্স চারেক পানীয় গ্রহণ করেছেন।"

"কী বললেন?" চেঁচিয়ে উঠলেন স্যান্ডারসন। "তা হতে পারে না। সানি তো এখনও পর্যন্ত..." হঠাৎই মাঝপথে থমকে গেলেন তিনি। যেন দু-ঠোঁটে কুলুপ এঁটে দিলেন।

"থামলেন কেন, বলে যান।" রোগ্যানের গলায় ব্যঙ্গের খোঁচা। "বাক্যটা শেষ করুন। সানি এখনও পর্যন্ত বাড়িতেই ফেরেনি, এই কথাই তো আপনি বলতে গিয়েছিলেন? আসল ঘটনাও ঠিক তাই। জুনিয়ার স্যান্ডারসন আজ অফিসের শেষে বাড়ি ফিরে যাননি। আপনারা কেউ আজ পানীয় গ্রহণ করেননি, এ-বিষয়ে যদি আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত না হতেন, তা হলে এত সহজে পরীক্ষা দিতে রাজি হতেন না। যে সম্ভাবনাটা আদৌ আপনার মাথায় আসেনি তা হচ্ছে, অফিসের শেষে আপনারা দু'জনে বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর আপনার ছেলে আজ রাতে তাঁর নিজের গতিবিধির যে বিবরণ আপনাকে দিয়েছেন, তার মধ্যে কিছু কাটছাঁট করা ছিল। সম্ভবত যেসব জিনিস আপনি পছন্দ করেন না, সেগুলো আপনাকে না জানানোর অভ্যেস তাঁর আছে।"

"আপনি কীসের ইঙ্গিত করছেন কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না!" অপ্রসন্ন গলায় স্যান্ডারসন বললেন। "আপনার মেশিনে নিশ্চয় কোথাও গণ্ডগোল আছে।"

"সেটা পরে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।" রোগ্যানের কণ্ঠস্বর অবিচলিত। সারাক্ষণই আপনি আমাদের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন, মিঃ স্যান্ডারসন। কিন্তু জুনিয়ার স্যান্ডারসনের মতিগতি সম্পর্কে পুরোদস্তুর ওয়াকিবহাল না থাকাটাই আপনার পক্ষে রীতিমত ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্যাঙ্কার্সলেকে খুন করা এবং আপনাদের এখানে উপস্থিত হওয়া, এর মধ্যে পঁচিশ মিনিট সময় তিনি হাতে পেয়েছিলেন। অফিসে তিনি একা, সামনে একটা মৃতদেহ—মাথার ওপর ঝুলে থাকা খুনের অভিযোগ—আর সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ, আপনার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে। আপনার নিশ্চয় অনুমান করা উচিত ছিল, এমন নিদারুণ অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে স্নায়ুকে সতেজ রাখার জন্য তাঁর কিছুটা নির্জলা পানীয়ের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তা হলে পানীয়ের যে বোতলটা তিনি তাঁর ডেস্কে লুকিয়ে রেখেছেন, সেটা আপনি খুঁজে পেতেন, এবং আপনাদের তিনজনের স্বীকারোক্তির সঙ্গেও সেটা ঠিক জায়গামতো জুড়ে দিতে পারতেন। ...এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, সানি, বাবার কাছে সত্য গোপন করার ফলটা মোটেই ভাল হয়নি!"

"আপনি... আপনি কেন আমাকে....", সানি রোগ্যানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

"এই থাম, ...বোকার হদ্দ কোথাকার!" জোরে ধমকে উঠলেন সিনিয়ার। "চুপচাপ চেয়ারে বসে থাকবি। এখন আর একটা কথাও বলবি না।"

"তুমিই তো আমাকে নলে ফুঁ দিতে বললে!" রাগত ভঙ্গিতে বাবার দিকে ফিরে তাকাল সানি। "আমি মোটেই তা চাইনি। কিন্তু নিজেকে তুমি মস্তবড় চালাক মনে করলে। তোমাকে ফোন করাটাই আমার উচিত হয়নি। পনেরো হাজার ডলার সঙ্গে নিয়ে মেক্সিকো পালিয়ে গেলেই সবচেয়ে ভাল ছিল। আমি গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিলাম তোমার এই অদ্ভুতুড়ে পরিকল্পনা আসলে কোনও কাজে আসবে না।"

"প্রায় এসেছিল বলা যায়," প্রশান্ত গলায় রোগ্যান বললেন। "এখন আপনি আর পল কি আপনাদের দেওয়া স্বীকারোক্তি ফিরিয়ে নেবেন?" স্যান্ডারসনকে প্রশ্ন করলেন তিনি। "না কি অপরাধীর সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবেন?"

অনুবাদ : অসিত মৈত্র

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

ডাঃ রেক্স মর্গান

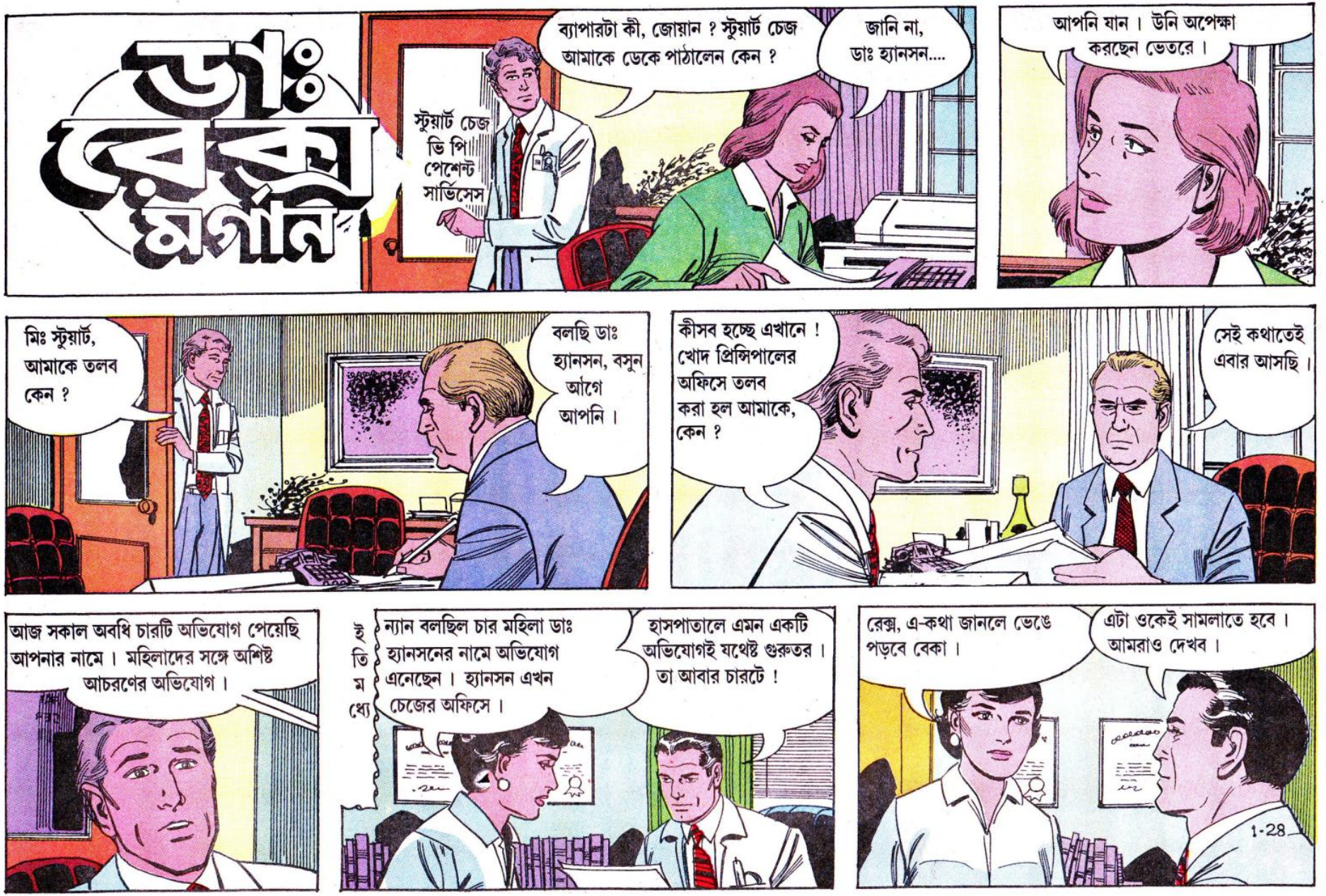
স্টুয়ার্ট চেজ
ভি পি
পেশেন্ট
সার্ভিসেস
ব্যাপারটা কী, জোয়ান ? স্টুয়ার্ট চেজ আমাকে ডেকে পাঠালেন কেন ?
জানি না, ডাঃ হ্যানসন....
আপনি যান। উনি অপেক্ষা করছেন ভেতরে।
মিঃ স্টুয়ার্ট, আমাকে তলব কেন ?
বলছি ডাঃ হ্যানসন, বসুন আগে আপনি।
কীসব হচ্ছে এখানে ! খোদ প্রিন্সিপালের অফিসে তলব করা হল আমাকে, কেন ?
সেই কথাতেই এবার আসছি।
আজ সকাল অবধি চারটি অভিযোগ পেয়েছি আপনার নামে। মহিলাদের সঙ্গে অশিষ্ট আচরণের অভিযোগ।
ইতিমধ্যে
ন্যান বলছিল চার মহিলা ডাঃ হ্যানসনের নামে অভিযোগ এনেছেন। হ্যানসন এখন চেজের অফিসে।
হাসপাতালে এমন একটি অভিযোগই যথেষ্ট গুরুতর। তা আবার চারটে !
রেক্স, এ-কথা জানলে ভেঙে পড়বে বেকা।
এটা ওকেই সামলাতে হবে। আমরাও দেখব।
1-28

ডাঃ রেকা মর্গান

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

গোয়েন্দা গল্প

রহস্য রজনীগন্ধার

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ভোরে ওঠা আমার বরাবরের অভ্যাস। কিন্তু ইদানীং রাত সাড়ে তিনটে কি চারটে বাজতে-না-বাজতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। সেই যে ঘুম ভাঙে, হাজার এপাশ-ওপাশ করলেও আর ঘুম আসে না। আমি তখন শয্যাত্যাগ করে কখনও ছাদে যাই, কখনও-বা বাগানে পায়চারি করি। এই সময় আমার খুব চা খেতে ইচ্ছে করে। আমার সবরকমের কাজকর্ম করে দেওয়ার জন্য রাখহরি আছে। কিন্তু সে বেচারা তখন এমন অকাতরে ঘুমোয় যে, ওকে ডাকতেও আমার মায়া হয়। ছেলেমানুষ তো! আমি তাই নিজেই এক কাপ চা করে খাই।

আজ ঘুম ভাঙল শেষ রাতে। তিনটেয়। কেন এমন হল? অথচ খুব একটা বেশি রাতেও ঘুমোইনি। যাই হোক, ঘুম থেকে উঠে মুখে-চোখে জল দিয়ে চায়ের একটু ব্যবস্থা করে যখন জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছি, তখনই বাইরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই মনে হল, ঘুম যখন ভাঙেই আর উঠতেও যখন হয় তখন এইভাবে বদ্ধ ঘরের মধ্যে আটকে না থেকে একটু মর্নিং ওয়াক করে নিলে কেমন হয়? মনে হওয়ামাত্রই আমার শারীরচর্চার সঙ্গে আর একটা নতুন মাত্রা যোগ করে দিলাম।

ডেকে তুললাম রাখহরিকে।

ওকে দরজায় খিল দিতে বলে আমি বাইরে বেরোলাম। এখনও চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। চৈত্রের প্রথম। তবুও মনে হচ্ছে, যেন মধ্যরাত। পাখিরা সবে জাগছে। দু-একজন সাইকেল আরোহী টিং-টিং করে ঘন্টি বাজিয়ে কোথায় যেন গেল। যে যেখানেই যাক, আমি আমার পথচলা শুরু করলাম।

মৌড়িগ্রাম এখন আর আগের মতো গ্রাম নেই। দ্বিতীয় হুগলি সেতু হয়ে যাওয়ার ফলে নিত্যনতুনভাবে তার চেহারা পালটাচ্ছে। আমি দ্রুত পা চালিয়ে রথতলার দিকে চললাম। হাঁটাটা একটু রপ্ত হয়ে গেলে আরও দূরে খটির বাজার কিংবা প্রশস্তর দিকে চলে যাব। প্রশস্তর মূর্তি মহল্লা-বিখ্যাত।

মৌড়ি রথতলার কাছাকাছি যখন এসেছি তখন হঠাৎই একটা বাড়ির দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম গেঞ্জি ও শর্টস পরা এক যুবক একজনের বাড়ির দোতলা থেকে কিছু একটা বেয়ে নীচে লাফিয়েই অন্ধকারে মিশে গেল। যুবকটির গায়ের রং কালো, বেঁটেখাটো চেহারা। ও যে চোর এবং চুরি করতে এসেছিল তা বোঝাই গেল।

আমি ধীরে-ধীরে সেই বাড়িটার দিকে এগোলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম ওপরের ঘরের বারান্দার দিকের দরজাটা খোলা। বোধ হয় গরমের জন্য। আর বারান্দার সঙ্গে লোহার হুকে আটকানো একটা নাইলনের ফিতে বাইরের দিকে ঝুলছে। চোর পালাবার সময় এটা না নিয়েই চলে গেছে। বাড়ির দরজায় নেমপ্লেট দেখেই চমকে উঠলাম আমি। আরে, এ যে প্রোফেসর এম.এল. বোসের বাড়ি! ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। কিন্তু শুনেছি উনি অত্যন্ত গুণী মানুষ। হাওড়ারই কোনও একটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। ওঁর কোচিং-এরও নামডাক আছে খুব।

একবার ভাবলাম চোরটার পেছনে একটু তাড়া লাগালে হত! যদিও দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠতাম না, তবু একটা শোরগোল ওঠানো যেত। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই আচমকা ঘটে গেল যে, তখন আর কিছুই করবার ছিল না আমার।

আমি অনেকক্ষণ সেই জায়গাটায় পায়চারি করে আকাশ একটু ফরসা হলে প্রোফেসরের বাড়ির দরজায় নক করলাম।

ভেতর থেকে সাড়া এল, "কে?"

তারপর সদ্য ঘুমভাঙা এক মহিলা বেরিয়ে এসে বললেন, "কাকে চাই?"

"প্রোফেসর বোস আছেন?"

"উনি এখন ঘুমোচ্ছেন। এখন তো দেখা হবে না। বেলায় আসবেন।"

"ওঁকে একবার ডাকুন, ডেকে বলুন বাড়িতে চোর এসেছিল।"

মহিলা ভয়েই হোক, বা যে-কোনও কারণেই হোক 'ও মাগো' বলে আমার মুখের ওপর সশব্দে বন্ধ করে দিলেন দরজাটা।

আমি আর কী করি, বাধ্য হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

রাখহরি বলল, "আজ এত ভোরে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন দাদাবাবু?"

"মর্নিং ওয়াকে। শুধু আজ নয়, এবার থেকে রোজই আমি বেরোব। মর্নিং ওয়াকটা আমার কাছে এখন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।"

"কিন্তু আপনার মতো লোকের পক্ষে অত ভোরে একা ওইভাবে বেরনোটা কি ঠিক? কে কখন সন্ধান নিয়ে পিছু নেয়, তা কে বলতে পারে?"

"ও-ভয় করলে তো ঘর থেকেই বেরনো যাবে না রে! আজ শুধু হাতে গেছি। কাল থেকে তৈরি হয়েই বেরোব। যাক, তুই এখন বেশ জুতসই করে একটু চা কর দিকিনি।"

রাখহরি ওর কাজে গেল।

আমি ইজি চেয়ারটা বাইরের বাগানে এনে আমার প্রিয় রঙ্গনগাছগুলোর কাছে গিয়ে বসলাম।

একটু পরেই কাগজওয়ালা কাগজ দিয়ে গেল। সেইসঙ্গে একটা দুঃসংবাদ।

কাগজওয়ালা বলল, "জানেন তো চ্যাটার্জিদা, একটা খুব খারাপ খবর আছে আজ। কাগজে নেই অবশ্য খবরটা, তবে কালকের কাগজে নিশ্চয়ই বেরোবে।"

"কীরকম!"

"প্রোফেসর এম.এল. বোস খুন হয়েছেন।"

আমার তো আঁতকে ওঠার পালা। বললাম, "সে কী!"

"হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, খুনি খুন করে নীচের দিদিকে জানিয়েও গেছে।"

রাখহরি তখন চা আর টোস্ট নিয়ে এসেছে। আমি কোনওরকমে ওর হাত থেকে সেটা নিয়ে

(এর পরে ৬২ পাতায়)

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

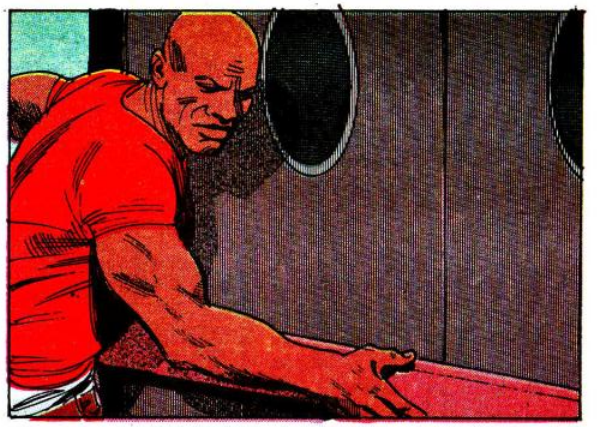

ফ্লোরেস্কুর গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি জীবরা এবার প্রতিশোধ নিতে উদ্যত...

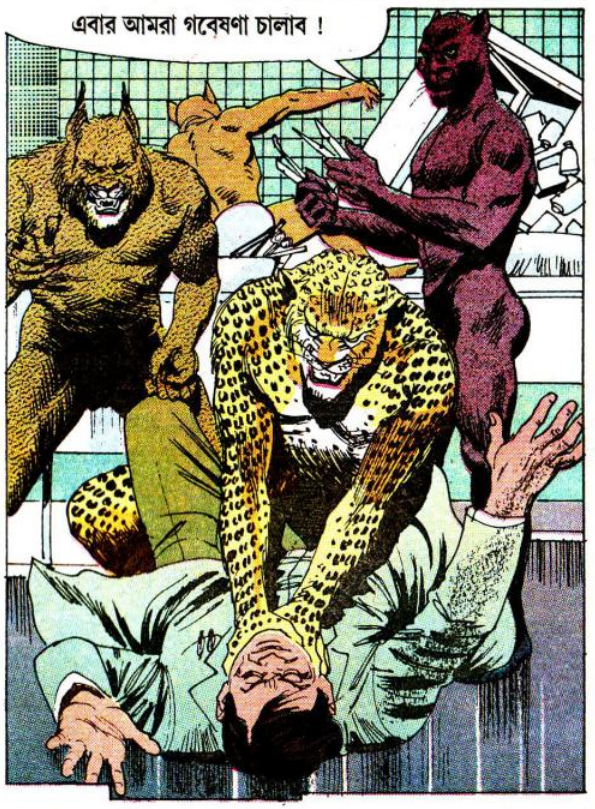

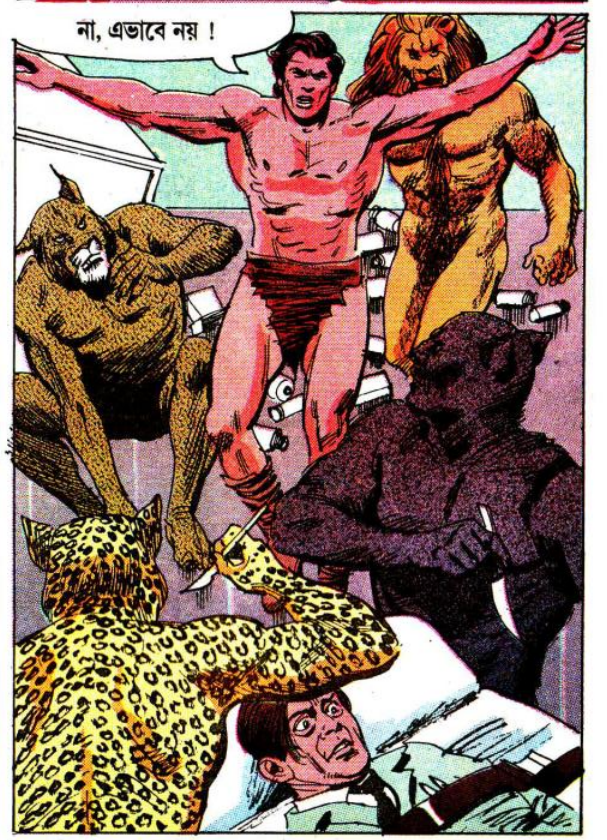

টারজান

এডগার রাইস বারোজ

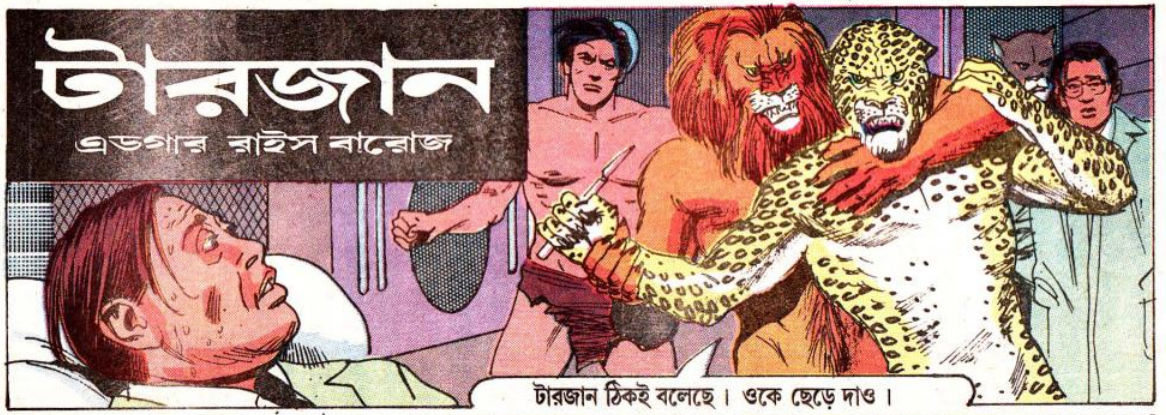

ফ্লোরেস্কুর তৈরি ওষুধ ওর ওপরই পরীক্ষা করার দাবি ঠেকাচ্ছে টারজান...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

(৫৯ পাতার পর)

মাটিতে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

কাগজওয়ালা বলল, "এই ধরনের অজাতশত্রু মানুষের যদি এই অবস্থা হয়, তা হলে দেশের পরিস্থিতি কীরকম এবার বুঝতে পারছেন তো?" বলে চলে গেল।

আমি কাঁপা-কাঁপা হাতে টোস্টে কামড় দিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। এই মুহূর্তে নিজের ওপর দারুণ রাগ হল আমার। কেন যে ভোরবেলা সেই খুনিটার পেছনে ধাওয়া করলাম না, তা ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। এই মুহূর্তে আগাগোড়া ঘটনাটা পুলিশকে জানানো দরকার। তারপর যেভাবেই হোক খুঁজে বের করতে হবে আততায়ীকে।

থানায় গিয়ে পুলিশকে সব কথা বলতেই ইনস্পেক্টর ত্রিবেদী বললেন, "অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন আপনার এবং আততায়ীর মধ্যে দূরত্ব এতটাই ছিল যে, আপনি উদ্যম নিলেও ধরতে পারতেন না।"

"ঠিক তাই।"

"তবু খুনির চেহারার একটু বর্ণনা দিতে পারেন?"

"বেঁটেখাটো চেহারা। শর্টস আর গেঞ্জি পরে ছিল।"

"মুখে বসন্তের দাগ ছিল কি?"

"দূরত্বের জন্য বোঝা যায়নি।"

মিঃ ত্রিবেদী একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "মনে হয় চোর-গণেশ। ছোটখাটো যত চুরিটুরির প্রধান হচ্ছে ও। তবে কিনা এইরকম খুন-জখমের মতো জঘন্য অপরাধের কোনও রেকর্ড ওর নেই। আচ্ছা, লোকটাকে আর একবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?"

"না পারাই স্বাভাবিক। আমি যখন রথতলার বাঁকের মুখে এসেছি, ও তখন দড়ি বেয়ে ঝুপ করে নেমে পালাল।"

ত্রিবেদী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "ঠিক আছে। চলুন একবার ঘটনাস্থলে যাওয়া যাক।"

আমি বললাম, "যেতে তো হবেই ত্রিবেদীজি। তবে একটা কথা, এই খুনের তদন্তটা কিন্তু আমি করব। আপনারা আমাকে হেল্প করবেন।"

"অন্তত এই একটা ব্যাপারে আপনি আমাদের পরম বন্ধু। আপনার সহযোগিতা আমাদের কাছে অলওয়েজ অ্যাক্সেপ্টেবল।"

আমরা একটুও দেরি না করে ঘটনাস্থলে চলে এলাম।

সেই দিদি তো আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, "এই তো! এই বাবুই আমাকে খবর দিয়েছিলেন। উনি চলে যাওয়ার পর ওপরে গিয়েই দেখি এই কাণ্ড। আমি তো ভয়েই মরি। ভাবলাম উনিই বোধ হয় বাবুকে খুন করে আমাকে জানিয়ে গেলেন। এখন তো দেখছি উনি পুলিশেরই লোক।"

ইনস্পেক্টর ত্রিবেদী এবং আমি বাইরের লোকজনের ভিড় ঠেলে ওপরে উঠে গেলাম। নীচের কনস্টেবলরা ভিড় কন্ট্রোল করতে লাগল।

আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম মিঃ বোস মাথায় আঘাতের চিহ্ন নিয়ে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর মাথা রেখে এমনভাবে পড়ে আছেন, যাতে মনে হচ্ছে অত্যন্ত ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন তিনি। টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানি আছে। সম্ভবত এই ফুলদানিটা দিয়েই ওঁর মাথার ব্রহ্মতালুতে আঘাত করা হয়। ওঁর হাতের মুঠোয় আছে একগোছা রজনীগন্ধা। টেবিলের ওপর একটা বিদেশি গোয়েন্দা গল্পের বই এবং একটি 'সুইসাইড নোট'। একটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের ওপর লেখা আছে 'আমিই খুনি'। লেখার নীচে ওঁর সই।

রহস্যময় ব্যাপার। রহস্যময় এই কারণে যে, উনি যদি নিজের মাথায় ফুলদানি দিয়ে আঘাত করে থাকেন, তা হলে সেটা ওইভাবে টেবিলের ওপর থাকতে পারে না। সুইসাইড নোটে কেউ নিজেকে নিজের খুনি বলে লিখে রাখে না। আর তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার যেটা, সেটা হল ওই রজনীগন্ধা ফুলগুলো। এই ফুলগুলো ওঁর হাতের মুঠোয় এল কীভাবে?

এইবার ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের দিকে নজর দেওয়া হল। সবই ঠিকঠাক আছে। শুধু স্টিলের আলমারিটাই যা লণ্ডভণ্ড। তার মানে খুনি যার লোভে এই কাজ করেছে তা পেয়ে অথবা না পেয়েই করেছে এই কাজ। ওই আলমারিতেই একটি খাতায় লেখা ছিল ওঁর সঞ্চয়ের হিসেবনিকেশ। প্রায় সাড়ে তিন লাখ টাকার মতো ইন্দিরা বিকাশ কিনেছিলেন উনি, তার একটিও নেই। জাতীয় সঞ্চয়ের কিছু কাগজ ছেঁড়াখোঁড়া অবস্থায় পড়ে আছে। সেও প্রায় দেড় লাখ টাকার মতো। ব্যাঙ্কে এফ.ডি-র জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেওয়ার ফর্ম ফিল আপ করেছিলেন, কিন্তু ফর্ম আছে, অথচ টাকা নেই। অর্থাৎ খুনি এটাকেও হাতিয়েছে। এই টাকাটা সম্ভবত কোনও পলিসি ম্যাচিওর হওয়ার পর জমা পড়তে যাচ্ছিল। খুনি সেটা জানত।

ত্রিবেদী বললেন, "কী বুঝলেন মিঃ চ্যাটার্জি?"

"রীতিমত সন্ধানী চোর।"

"কিন্তু ওই সুইসাইড নোটের অর্থ কী?"

"বোঝা যাচ্ছে না। তবে লেখাটা ওঁরই। কেননা ওঁর খাতাপত্র বা অন্য লেখাটেখা দেখে এই লেখার কোনও গরমিল পাচ্ছি না।"

এবার আমরা বারান্দার কাছে এসে একজোড়া পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। পরে আরও লক্ষ করে ঘরের ভেতর পর্যন্ত একই পায়ের যাওয়া আসার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম আমরা। আততায়ী জুতো পরে আসেনি। সে এসেছিল ধুলোমাখা খালি পায়ে। কিন্তু সেই পায়ের ছাপ বোসবাবুর চেয়ারের কাছ পর্যন্ত আছে, তারপর আর নেই। তা হলে স্টিলের আলমারি ভেঙে জিনিসপত্রগুলো চুরি করল কে?

আমি ওঁর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতা ও ডায়েরিটা আদায় করে পুলিশকে বললাম, "আপনারা এবার আপনাদের কাজ করুন। আমি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে একটু কথা বলে আসি।"

কাজের দিদি নীচের ঘরে বসে নীরবে চোখের জল মুছছিলেন। আমি গিয়ে বললাম, "আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

উনি বললেন, "বেশ তো, করুন।"

"আপনি এখানে কতদিন আছেন?"

"তা ধরুন না কেন, বছর পনেরো।"

"আগে কোথায় ছিলেন? আপনার কে-কে আছে?"

"আগে দেশে ছিলাম। আমার কেউ নেই। গরিব মানুষ, বিধবা। উনি আমাকে ওঁর চরণে ঠাঁই দেন।"

"বোসবাবুর কে-কে আছেন? এখানে অথবা দেশের বাড়িতে?"

"উনি তো আমারই দেশের লোক। দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বহু বছর। কেননা যা যেখানে ছিল সবই বেচেবুচে দিয়ে এইখানে এসে বাড়ি করেছেন। ওঁরও কেউ কোথাও নেই। বিয়ে করেছিলেন, ছেলেপুলে হয়নি। বউদিমণি মারা গেছেন ক্যান্সারে। তারপর উনি আর বিয়েও করেননি। তবে কিছুদিন ধরে বলছিলেন অবসর নেওয়ার পর থেকে তীর্থে-তীর্থে ঘুরবেন। তা কোন তীর্থে যে উনি চলে গেলেন বাবা, তা কে জানে?"

"আচ্ছা, সম্প্রতি ওঁর সঙ্গে কি কারও মনোমালিন্য হয়েছিল?"

"না বাবা। সকলে ওঁকে দেবতার মতো ভক্তিশ্রদ্ধা করত।"

"কাল উনি কখন ফিরেছেন? কতক্ষণ কাজ করেছেন? কে-কে দেখা করতে এসেছিল ওঁর সঙ্গে?"

"উনি তো কাল কলেজে যাননি। কী একটা বই লিখবেন বলে ক'দিনের ছুটি নিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীও আসেনি কেউ। বাইরের কেউও আসেনি দেখা করতে। শুধু ভোরবেলা আপনিই যা এসেছিলেন।"

কাজের দিদির কথায় একটু আলোর ইশারা পেলাম। অর্থাৎ সুইসাইড নোটের রহস্যটা একটু পরিষ্কার হল। উনি তা হলে বই লিখতে যাচ্ছিলেন। আর সেই বইটার, অথবা সেই বইয়ের কোনও গল্পের নাম নিশ্চয় 'আমিই খুনি'। হয়তো বা ওই ইংরেজি বইয়ের কোনও গল্পের অনুবাদ করতে বসেছিলেন। আর ঠিক সেই সময়ে খুনি এসে তার ফায়দাটা লুটেছে। কিন্তু কীভাবে ?

আমি আবার ওপরে উঠে এসে বোসবাবুর টেবিলের ওপর রাখা সেই ইংরেজি বইটার পাতা উলটেই এমন একটা গল্প দেখতে পেলাম, যার বাংলা করলে নামটা দাঁড়ায় 'আমিই খুনি'। বইটা ত্রিবেদীকে দেখাতে তিনিও চমকে উঠলেন। বললেন, "আরে, তাই তো ! আমরা তো এতক্ষণ ভুল সিদ্ধান্তে যাচ্ছিলাম।"

আমার মনের মধ্যে তখন একটাই দুশ্চিন্তা তোলপাড় করতে লাগল, খুনি কে ? তার পায়ের ছাপ মৃতের কাছ পর্যন্ত গেল কিন্তু আলমারির কাছে নেই কেন ? আর মৃতের হাতের মুঠোয় ওই রজনীগন্ধার অর্থ কী ?

দুপুরবেলা ঘরে বসে নিজের মনে কত কী চিন্তা করতে লাগলাম। কোন সূত্র ধরে এই তদন্তের কাজে কীভাবে এগোব তা কিছুতেই ভেবে পেলাম না। আততায়ী একমাত্র পদচিহ্ন ছাড়া আর কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। বোসবাবুর সম্পত্তির হিসেব লেখা খাতায় ষাট ভরি সোনার গয়নার উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই গয়নাও মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে উধাও। অমন একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এমন অমূল্য সম্পদ লকারে না রেখে কেন যে ঘরে রেখেছিলেন, তা ভেবে পেলাম না। হয়তো-বা এইসবের প্রতি কোনও মোহ ছিল না, তাই।

যাই হোক, আমি যখন বসে-বসে এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, ঠিক তখনই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। ফোন ধরতেই ত্রিবেদীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "মিঃ চ্যাটার্জি, শিগ্‌গির একবার আসুন। বোধ হয় আপনার খুনি ধরা পড়েছে।"

বোধ হয় ? তবুও আমি এক মুহূর্ত দেরি না করে থানায় এলাম। দেখলাম বেঁটেখাটো চেহারার একজন লোককে লকআপে রাখা হয়েছে। এই চোর-গণেশ। লোকটাকে এই এলাকায় বহুবার দেখেছি। তবে নাম জানতাম না। আমাকে দেখেই কেঁদে ফেলল সে। বলল, "আমাকে বাঁচান বাবু। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুযোগ পেলেই ছোটখাটো চুরিটুরি একটু-আধটু করে থাকি বটে, তবে এই সমস্ত খুন-খারাপির ব্যাপারে আমি নেই। দরকার হলে আপনারা পুলিশ-কুকুর আনান, দেখবেন সে আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। শুধু আমি কেন, ওঁকে খুন করবে এই অঞ্চলে এমন কেউ নেই।"

আমি চোর-গণেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বললাম, "এ-লোকটাকে ছেড়ে দিতে পারেন। এর পায়ের সঙ্গে ওই ঘরের ভেতরের পায়ের ছাপ মিলছে না। তার এক পায়ে ছ'টা আঙুল ছিল।"

এই কথা শুনেই লাফিয়ে উঠল চোর-গণেশ, "কী বললেন বাবু, ছ'টা আঙুল ছিল ? বাঁ পায়ে কী ?"

ত্রিবেদী উৎসাহিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঁ পায়ে। তুমি চেনো তাকে ?"

"চিনি মানে ? ওর জামার কলার ধরে এখনই ওকে টেনে আনছি আপনার কাছে। সামান্য ক'টা টাকার লোভে শেষপর্যন্ত এই কাজ করল ও ?"

"ও কে ?"

"সুবল বাগ। ঘরামির কাজ করে। আমি এখনই টেনে আনছি ওকে। দু'নম্বর বস্তিতে ঘর ছাইতে গেছে ও।"

চোর-গণেশকে ছেড়ে দেওয়া হল। লোকটা বোধ হয় ম্যাজিক জানে, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে মারতে-মারতে যাকে নিয়ে এসে হাজির করল তার নাম সুবল বাগ।

সুবল প্রথমেই এসে ত্রিবেদীর পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর আমার পায়ে। বলল, "অপরাধ নেবেন না হুজুর। আমি চোর বটে, তবে খুনি নই।"

ত্রিবেদী বললেন, "তা হলে কি সাধু ?"

আমি ইশারায় ত্রিবেদীকে চুপ করতে বললাম।

সুবল বলল, "হুজুর, কাল অনেক রাতে বেগড়ি থেকে একজনের ঘর ছেয়ে খটিরবাজারে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখি, সুন্দরপানা এক ভদ্রলোকবাবুর বাড়ির দোতলা থেকে কী একটা বেয়ে নামল। তার কাঁধে ছিল একটা ঝোলা-ব্যাগ। পায়ে মোজা। নীচে নেমেই জুতো পরে একটা ভটভটিতে চেপে কোথায় যেন চলে গেল। বাবুর ওপরের ঘরে তখন আলো জ্বলছে। আমি তখন ব্যাপারটা কী হল তা বোঝবার জন্য কাছে গিয়ে দেখি একটা নাইলনের ফিতে ওপর থেকে ঝুলছে। দেখেই কেমন সন্দেহ হল। আমাদের মতো চোরেরা ফিতে ধরে ওঠে না, আবার ভটভটিও চাপে না। তাই কৌতূহলী হয়ে সেই ফিতে ধরে ওপরে উঠেই দেখি ওই কাণ্ড। বাবু টেবিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন। দু'চোখ বোজা। আস্তে করে দু'বার ডেকে সাড়া না পেয়ে বুঝলাম বাবুর দেহে প্রাণ নেই। টেবিলের ওপর ফুলদানিটা কাত হয়ে পড়ে ছিল। ঘরের মেঝেয় ফুলদানির জল। সেটাকে ঠিক করে রেখে গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম শরীরে তখনও উত্তাপ আছে যদিও, তবুও উনি মৃত। আমি তখন আলোটা নিভিয়ে দিলাম। কেননা দারুণ ভয়ে হাত-পা তখন কাঁপছে আমার। যদি কেউ নামবার সময় আমাকে দেখে ফেলে তা হলে আমাকেই খুনি ভাববে। তাই কোনওরকমে পালিয়ে বাঁচলাম। কিন্তু বেঁচেও কি রেহাই পেলাম ? আমার পায়ের ছাপের জন্য ধরা পড়ে গেলাম। বাবুরা বিশ্বাস করুন আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।"

আমি বললাম, "তুমি তখন ওই লোকটাকে নামতে দেখে চেঁচালে না কেন ?"

"ভয়ে। কেননা ওই জোয়ান লোকটা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠতাম না। তা ছাড়া ওইসব লোকের কাছে গোলাগুলিও থাকে।"

"তুমি তখন পুলিশে খবর দিতে পারতে !"

ত্রিবেদী বললেন, "যাক, এসব তো হল। এখন ওই বাবুর ঘর থেকে কী-কী জিনিস চুরি করেছিলে তুমি ?"

"হুজুর, মা-বাপ। ওই খুন দেখেই আমার সব কিছু তখন মাথায় উঠে গেছে। তা ছাড়া ওই সমস্ত নামীদামি লোকের ঘরে চুরি করবার মতো দুর্মতি আমার হয় না বাবু। আসলে হয় কী, পেটে টান পড়লে তখনই...।"

যাই হোক, সুবলের অকপট স্বীকারোক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হল। কেননা ও মৃতের কাছ পর্যন্ত যে গিয়েছিল, সে-প্রমাণ আমরাও পেয়েছি। কিন্তু আলমারির কাছে ওর কোনও পদচিহ্ন ছিল না। চতুর খুনি মোজা পরে ঘরে ঢোকার ফলে তারও পায়ের ছাপ কিছু পাওয়া যায়নি। তাই সামান্য জিজ্ঞাসাবাদের পর সুবলকেও ছেড়ে দেওয়া হল।

সন্ধেবেলা পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এল। বোসবাবুকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে, পরে মাথায় ফুলদানির ঘা দিতেই আঘাতজনিত কারণে মারা যান বোসবাবু। পুলিশ কুকুরও এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কোনওরকম আলোকপাত করতে পারেনি আমাদের।

পরদিন সকালে আমি আবার বোসবাবুর বাড়ি গেলাম। কাজের দিদি তখন অত্যন্ত কান্নাকাটি করছিলেন। বললেন, "বাবা, তুমি আমার ছেলের মতো। এই অনাথিনীর একটা ব্যবস্থা করে দাও বাবা। আমাকে কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দাও। কেউ কোথাও নেই

(এর পরে ৬৫ পাতায়)

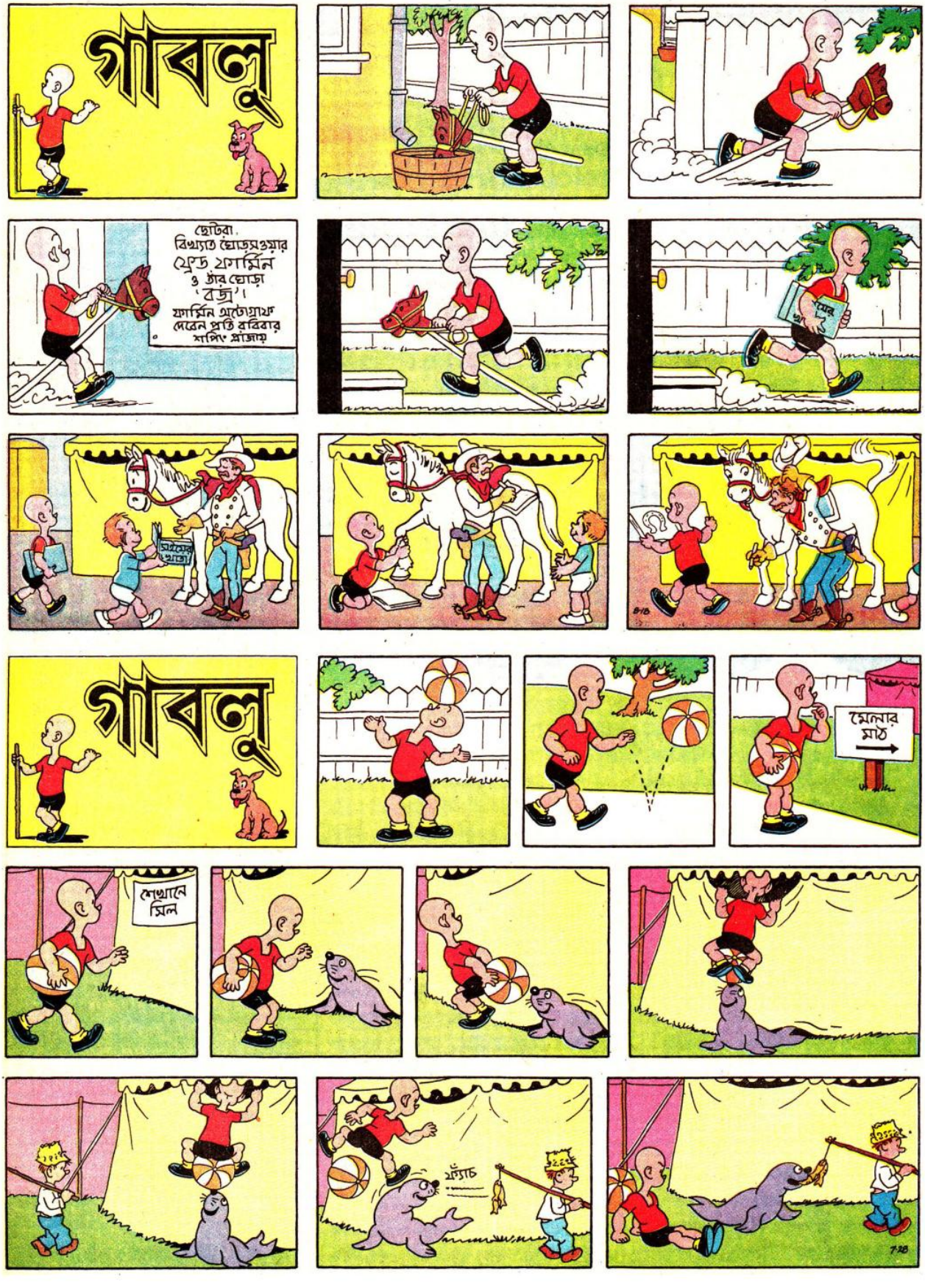

গাবলু
ছোটরা,
বিখ্যাত ঘোড়সওয়ার
ফ্রেড ফার্মিন
ও তাঁর ঘোড়া
'বজ্র'।
ফার্মিন অটোগ্রাফ
দেবেন প্রতি রবিবার
শপিং প্লাজায়

গাবলু
মেলার
মাঠ
শেখানো
সিল
ফ্যাঁচ

(৬৩পাতার পর)

আমার। এই বাড়িতে একা আমি কী করে থাকব, কী খাব ? আর শোনো, বউদিমণির গয়নার বাক্সটা নীচের ঘরে থাকত। তাই ওটা চোরে নিয়ে যেতে পারেনি। ও তুমি থানায় জমা দিয়ে দাও। ও আমি কতদিন আগলে রাখব বাবা ? কার জন্য রাখব ?"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বউদিমণির গয়নার বাক্স আপনার কাছে থাকত কেন ?"

"ওগুলো নীচের ঘরের আলমারিতে থাকত। তার চাবি আমার কাছে। আমি যে বাবুর মায়ের মতো, দিদির মতো ছিলাম বাবা। উনি যে আমাকে খুবই বিশ্বাস করতেন।"

কাজের দিদির এই কথা শুনে শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে এল আমার। আজকের দিনে এমন নির্লোভ মানুষও হয় ? এইজন্যই এই মহিলাকে দেবীর আসনে বসিয়েছিলেন বোসবাবু। আমি বললাম, "আপনার কোনও চিন্তা নেই দিদি। আপনি এই বাড়িতেই থাকবেন। পরে আপনার ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা নেব। সেরকম হলে আপনি নীচের তলাটা ভাড়া দিয়ে ওপর তলায় থাকবেন।" তারপর বললাম, "আচ্ছা, একটু মনে করে দেখুন তো, ওঁর এই বিষয়সম্পত্তির দাবি করতে পারে এমন কেউ কি কোথাও নেই ?"

"আমার অন্তত জানা নেই বাবা। তবে ওঁর এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা কাশীতে ছিলেন। শুনেছি তিনিও মারা গেছেন। তাঁর একমাত্র ছেলে খোকনবাবু একবার এখানে এসে এক রাত ছিলেন।"

"কতদিন আগের কথা ?"

"এই তো গত মাসে। তা, বাবু ওঁকে কিছু টাকাও দিয়েছেন। বলেছেন আর কখনও যেন এখানে না আসেন।"

"বাবু ওকে এখানে আসতে বারণ করলেন কেন ? সে-ব্যাপারে কিছু কি জানেন ?"

"না। তবে শুনেছি উনি বাবুকে এখানকার বাড়ি বেচে দিয়ে কাশীতে গঙ্গার ধারে একটা বাড়ি কিনে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। সেরকম বাড়িও নাকি ওঁর সন্ধানে আছে। তা বাবু একদমই রাজি হননি।"

"আপনি ওদের কাশীর বাড়ির ঠিকানাটা জানেন ?"

"না বাবা, তাও জানি না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "খোকনবাবু যা লোক দেখছি তাতে মনে হয় ওঁকে একটা খবর দেওয়া একান্তই দরকার। কেননা যদি কখনও এই বাড়ির দাবি করে উনি কোর্টে যান তখন কিন্তু আপনি মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

দিদি চোখের জল মুছে বললেন, "আমার আর মুশকিল কী বাবা ? যাদের যা পাওনা তারা তাই নেবে। আমাকে দয়া করে থাকতে দেয় দেবে, না দেয় তোমরা কোনও একটা আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ো আমাকে। শেষমেশ ভিক্ষে করব। তাও যদি না জোটে গঙ্গায় জল তো আছেই বাবা !"

আমি তখন দিদিকে বললাম গয়নার বাক্সটা দেখাতে। দিদি আলমারি খুলে বাক্স বের করে দেখালেন। ওই আলমারিতেও অনেক পুরনো কাগজ ও চিঠিপত্র ছিল। হঠাৎ একটি চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। চিঠিটা এসেছিল কাশীর পাঁড়েঘাট থেকে। চিঠিটা লিখেছেন নিশিকান্ত বসু। সম্ভবত ইনিই বোসবাবুর সেই দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা। চিঠিটা এই : "বউমার মৃত্যুসংবাদ লোকমুখে শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলাম। আরও দুঃখ পেলাম তুমি দেশের পাট চুকিয়ে হাওড়ায় বাড়ি কিনেছ বলে। তাই আমার অনুরোধ, যদি তুমি কাশীর এই বাড়িটা কিনে রাখো তা হলে এই বৃদ্ধ বয়সে আমি একটু নিশ্চিন্ত হই। তোমার বাড়ি তোমারই থাকবে। ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আর আমি বেঁচে যাই ভাড়া গোনার হাত থেকে। মাত্র পঁচিশ হাজার টাকা হলেই বাড়িটা কিন্তু তোমার হয়ে যায়। ছেলেটাকে মানুষ করতে পারিনি। আমার জীবনের এইটাই চরম ব্যর্থতা।"

আমি চিঠিটা পকেটে রেখে গয়নার বাক্সটা দিদিকে ফেরত দিলাম। বললাম, "এখনই এটা থানায় জমা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না। সাবধানে থাকবেন। বাড়ির বাইরে যাবেন না। আর অচেনা কেউ এলে বাড়ির দরজা খুলবেন না।"

দিদি আমার কথায় সায় দিয়ে 'হ্যাঁ' বললেন।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। এসে আবার বোসবাবুর ডায়েরিটা নিয়ে বসলাম। একমাস আগের একদিনের পাতায় লেখা আছে, "পুরনো পরিচয়ের সূত্র ধরে খোকন এসে হাজির। প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি। পরে পরিচয় দিতে চিনলাম। ও কাশীর একটি চার লাখ টাকার বাড়ির দালালি করতে এসেছে। আমাকে ওই বাড়িটা কেনবার জন্য বিশেষভাবে চাপ দিতে লাগল। কিন্তু আমি রাজি হলাম না। শেষমেশ ও আমাকে ওর নানারকম বিপদের কথা বলে দশ হাজার টাকা চাইল। আমি ওকে তাও দিলাম না। বললাম, আমার সব টাকাই এখন ব্যাঙ্ক ও পোস্ট অফিসে ডবল ইনভেস্টমেন্ট-এ আছে। এমনকী, ওর বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আলমারি থেকে কাগজপত্রগুলোও বের করে দেখালাম। তারপর হাঁজারখানেক টাকা ওর হাতে দিয়ে বিদায় করলাম ওকে, এবং এও জানালাম, ভবিষ্যতে আর কখনও যেন ও আমাকে এইভাবে বিরক্ত করতে না আসে।"

এই ডায়েরি পড়ে মনে-মনে আমি স্থির করলাম যেভাবেই হোক একবার কাশীতে গিয়ে ওই খোকনবাবুর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। ঠিকানা না থাকলেও পাঁড়েঘাটের ওদের সেই পুরনো বাড়ি থেকেই শুরু হবে আমার অনুসন্ধান। একান্ত খুঁজে না পাই তদন্তের কাজে গিয়ে বারাণসী ভ্রমণ তো হবে ! জয় বাবা বিশ্বনাথ।

কিন্তু ভাগ্য আমার এতই ভাল যে, কাশীযাত্রা আর করতে হল না। হঠাৎই সন্ধেবেলা এক অবাঙালি যুবক দেখা করতে এল আমার সঙ্গে, "আপনিই মিঃ অম্বর চ্যাটার্জি ? মানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ...।"

"হ্যাঁ আমিই। আপনার পরিচয় ?"

"আমার নাম শিবকুমার শর্মা। আমার বাড়ি বারাণসীতে। আমি সালকিয়ায় থাকি।"

"কী ব্যাপার বলুন তো ?"

"শুনলাম, আপনি নাকি মিঃ বোসের খুনের ব্যাপারে তদন্ত করছেন। তা এই ব্যাপারে আমার বন্ধু খোকনবাবু একটু দেখা করতে চান। কেননা মিঃ বোসের ওই বাড়ি এবং তাঁর অন্যান্য সম্পত্তির ও-ই এখন একমাত্র দাবিদার।"

"আপনার সেই বন্ধুটি কোথায় ?"

"বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"বাইরে কেন ? ভেতরে নিয়ে আসুন।"

"আসলে এই মর্মান্তিক সংবাদে ও খুব ভেঙে পড়েছে। মাসখানেক আগে একবার ও এখানে এসেছিল। সেই শেষ দেখা।"

"ঠিক আছে। ওঁকে আসতে বলুন।"

রহস্যের গন্ধ পেয়ে আমি অস্থির হলাম।

একটু পরেই শিবকুমার যাকে নিয়ে ভেতরে এল সুবল বাগের বর্ণনার সঙ্গে তার হুবহু মিল। ওরা ঘরে এসে আসন গ্রহণ করলে বললাম, "আপনারই নাম খোকনবাবু ?"

"হ্যাঁ, ভাল নাম রজনীকান্ত বোস।"

"কিন্তু আপনি যে সেই লোক তার প্রমাণ কী ? আপনাকে চেনে এমন কেউ কি আছে এখানে ?"

শিবকুমার বলল, "কেন, আমি আছি।"

"আমি তো আপনাকে চিনি না।" তারপর ওদের দু'জনের আপাদমস্তক আর একবার নিরীক্ষণ করে বললাম, "আচ্ছা ওই বাড়িতে যে কাজের দিদি আছেন তিনি কি চিনবেন আপনাকে ?"

খোকনবাবু বললেন, "চিনবেন না মানে ? মাত্র একমাস আগে আমি ওই বাড়িতে এসে এক রাত কাটিয়ে গেছি, এত তাড়াতাড়ি ভুল হবে কী

করে ? আমি এসেছিলাম দাদাভাইকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে কাশীতে নিয়ে যাব বলে। তা ওই মহিলার চক্রান্তেই সেটা হল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই মহিলাই সম্পত্তির লোভে খুন করিয়েছেন আমার দাদামণিকে।"

"কী এমন সম্পত্তি ছিল যে, তার লোভে মহিলা ওই কাজ করতে যাবেন ?"

"কী ছিল না ? সাড়ে তিন লাখ টাকার ইন্দিরা বিকাশ। দু'লাখ টাকার 'কিষাণ বিকাশ', 'জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট'। ব্যাঙ্কে এফ. ডি.-তে লক্ষাধিক টাকা আর ছিল প্রচুর সোনার গয়না। ওই মহিলা সবকিছুরই সন্ধান জানেন। তা ছাড়া দোতলা ওই বাড়িটার দামও নেহাত কম নয় !"

আমি বিস্মিত হওয়ার ভান করে বললাম, "ওরে বাবা, আপনি মাত্র এক রাত এই বাড়িতে থেকেই সবকিছু জানতে পেরেছেন ?"

"আসলে উনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাই বিশ্বাস করে এ-কথা আমাকে বলেছিলেন, এবং এও বলেছিলেন শিগ্‌গিরই উনি এই-সবই আমার নামে উইল করে দেবেন। এ-কথা জানতে পেরেই ওই মহিলা এই সর্বনাশটি ঘটিয়েছেন।"

"সর্বনাশ যে কে কীভাবে ঘটাল তা ভগবানই জানেন। কিন্তু রজনীবাবু ওরফে খোকনবাবু, ওঁর ডায়েরি যে অন্য কথা বলছে। আপনার কথার সঙ্গে তো তা মিলছে না।"

"কী লিখেছেন উনি ডায়েরিতে ?"

"সে-কথা নাই-বা জানলেন ?" বলে একটুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে বললাম, "জাস্ট এ মিনিট। ছেলেটাকে একটু চা করতে বলে আসি।" বলে উঠে গিয়ে রাখহরিকে যা করতে হবে তা বুঝিয়ে দিলাম।

ও ঘাড় নেড়ে ওর কর্তব্যপালনে চলে গেল।

আমি আবার ঘরে এসে ওদের সামনে বসে বললাম, "বোসবাবুর মৃত্যুসংবাদটা আপনারা কীভাবে পেলেন ?"

খোকনবাবু বললেন, "কেন, খবরের কাগজ মারফত পেয়েছি।"

"আপনি এখন থাকেন কোথায় ?"

"বেনারসেই থাকি।"

"ওরে বাবা, আজকের কাগজে খবর পেয়ে আজই চলে এলেন ?"

"না, না, আমি খবরটা পাই শিবকুমারের মারফত। ও-ই আমাকে ভোরবেলা ফোনে জানায়। আমি তখনই পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে চলে আসি।"

"আজকের কাগজ তো ছ'টার পরে বেরিয়েছিল। আর বারাণসীতে পূর্বা এক্সপ্রেস ছাড়ে ভোর পাঁচটা দশে। এটা কী করে সম্ভব হল ?"

"আসলে ট্রেনটা আজ এক ঘণ্টা লেট ছিল কিনা ?"

"বুঝলাম। কিন্তু আজ বৃহস্পতিবার। আজ তো পূর্বা এক্সপ্রেস বারাণসী দিয়ে আসে না।"

"তা হলে কি বলতে চান আমি মিথ্যে কথা বলছি ?"

"না, না, তা কেন ? আমারও ভুল হতে পারে। কিন্তু আমি যে এই ঘটনার তদন্ত করছি এ-কথা আপনাদের কে বলল ?"

খোকনবাবু গদগদ হয়ে বললেন, "বাবা, কাল থেকে সবার মুখেই আপনার নাম। সবাই বলছে অম্বর চ্যাটার্জি যখন তদন্ত করছে খুনি তখন ধরা পড়বেই।"

"আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক ভাই। আজকের ভোরে মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সুদূর বারাণসী থেকে এই সবে এখানে এসে পৌঁছলেন আপনি, অথচ কাল সকাল থেকেই এই খুনের তদন্ত আমি করছি বলে আপনি জেনে গেছেন !"

শিবকুমার বলল, "ও-কথা আমিই বলেছি ওকে।"

"আপনিও তো মশাই আজই কাগজ পড়ে জেনেছেন খবরটা। এখানে 'কাল' আসে কোত্থেকে ?"

শিবকুমার চুপ করে গেল।

আমি খোকনবাবুকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি ট্রেন থেকে নেমেই সোজা এখানে আসছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"ওরে বাবা, পূর্বা এক্সপ্রেস দেখছি আজকাল বিমানেরও আগে আসে। যাক, স্টেশন থেকে কিসে এলেন ? হেলিকপ্টারে ?"

"আপনি কি আমাদের বিদ্রূপ করছেন ? আমরা আমাদের স্কুটারে এসেছি।"

"আপনার জিনিসপত্র ?"

"কিছুই আনিনি সঙ্গে।"

"বন্ধু নিশ্চয়ই আপনাকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন ?"

"ঠিক তাই।"

এবার একটু যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল শিবকুমার। বলল, "শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি, আমার বন্ধুটি সবে ট্রেন থেকে নেমেছেন। এখন ওঁর একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনার সঙ্গে পরিচয়পর্বটা সারা হয়ে গেল। আমরা কাল সকালে দেখা করব আপনার সঙ্গে। আজ তা হলে আসি, কেমন ?"

"সে কী ! আপনাদের জন্য চা করতে বললাম যে !"

"মাফ করবেন। আমরা কেউই চা খাই না।"

"তা হলে আমি যখন চায়ের কথা বললাম তখন আপনার না করলেন না কেন ?"

ওরা দু'জনেই তখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

আমি গলার স্বর কঠিন করে বললাম, "এখন কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন না। তার কারণ, যে-রাতে বোসবাবু খুন হন সে-রাতে উনি কিছু মাত্র লিখে যেতে না পারলেও ওঁর হাতের মুঠোয় আমরা একগোছা রজনীগন্ধা পেয়েছি। তাতেই বুঝেছি রজনী নামের কারও কথা উনি মরণকালে বলতে চেয়েছিলেন। আর এখন এই ঘরেও একজন রজনী আছেন। তিনি এমন এক রজনী যিনি এক মাস আগে ওঁর সঙ্গে দেখা করে ওঁর নাড়িনক্ষত্র জেনেছেন এবং যাঁকে উনি পছন্দ করেননি। গত রাতে খুনি যখন খুন করে পালায় তখন আমাদেরই পরিচিত একজন লোক খুব কাছ থেকেই তাকে দেখে ফেলে। তারও দেওয়া বিবৃতির সঙ্গে এই রজনীর চেহারার জুতসই একটা মিল আছে। কাল রাতে খুনি পালাবার সময় একটা ভটভটি অর্থাৎ মোটরবাইক কিংবা স্কুটারে চেপে পালায়। আজ আপনারাও একটি স্কুটারে চেপেই এখানে এসেছেন।"

খোকনবাবু ও শিবকুমারের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

খোকনবাবু বললেন, "এর দ্বারা কি প্রমাণ হয় আমিই খুনি ?"

"ইয়েস। নাউ ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।" বলতে-বলতেই হাতে হাতকড়া নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মিঃ ত্রিবেদী। সঙ্গে আরও পুলিশ। এমনকী সেই সুবল বাগও।

সে রজনীকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই তো সেই লোক। একেই আমি দেখেছি কাল।"

ত্রিবেদী বললেন, "একজনকে খুনের অপরাধে এবং অন্য জনকে খুনিকে সাহায্য করার অপরাধে গ্রেফতার করা হল।"

রাখহরি তখন দূরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। আমার নির্দেশে সে-ই গিয়ে পুলিশে খবর দিয়েছিল।

আমি তখন খোকনবাবুকে বললাম, "কী রজনীবাবু, এই ব্যাপারে আর কিছু আপনার বলবার আছে ?"

ক্লান্ত রজনী মাথা নত করে ঘাড় নাড়লেন।

"তা হলে আপনার অপরাধ আপনি স্বীকার করছেন তো ?"

রজনীকান্ত অশ্রুসজল চোখে বলল, "হ্যাঁ। আমিই খুনি।"

শিবকুমারের দু'চোখে তখন আগুন জ্বলছে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ধারাবাহিক উপন্যাস

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

নয়

বিলু বলল, "আমরা মানে ? আর কে-কে ছিল ?"

"বেশি কেউ নয়, আমরা দু'জনই ছিলাম। আমি আর ভানু। ভানুটা পালিয়ে গেলেও আমি পড়ে গেলাম ওর খপ্পরে। নেহাত আমার চেনাজানা একজন এগিয়ে এল তাই রক্ষে। না হলে কী যে হত ? ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত বোধহয়।"

"আপনাদের ওইসব করার নির্দেশ কে দিয়েছিল ?"

"তোমরা তাকে চিনবে না। ওর নাম—।"

"কী হল ? বলতে গিয়েও থেমে গেলেন কেন ? বলুন ?"

"ওর নাম উচ্চারণ করতেও ভয় লাগে। লোকটা ডেঞ্জারাস। যদি কোনওরকমে প্রকাশ হয় ওর নাম কারও কাছে বলেছি, তা হলে কিন্তু বিপদের আর শেষ থাকবে না।"

"কিচ্ছু হবে না। সাহসে ভর করে রুখে দাঁড়ান। ওদের সংস্পর্শ থেকে বেরিয়ে আসুন, দেখবেন দিব্যি পার পেয়ে গেছেন।"

"আমরা যে-পথের পথিক, সে-পথে একবার এলে আর ফেরা যায় না রে ভাই।"

"আমরা যদি ফিরিয়ে আনি ?"

যুবক হেসে বলল, "যে-বিষ যদি একবার জিভে ঠেকালে কেউ যেমন তাকে বাঁচাতে পারে না, তেমনই আমরা যে দলের হয়ে কাজ করি সেই দল থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করলে কারও সাধ্য নেই তাকে বাঁচাবার।"

ভোম্বল বলল, "বুঝলাম। সব দলেরই দলত্যাগীদের ওই একই পরিণাম। কিন্তু ওই দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে নিষ্ঠার সঙ্গে ওদের কাজ করে গেলেও তো আপনি মরবেন। কেননা এখনও আপনি জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নেননি। তাই বলি কী, সোজা রাস্তায় আসুন না দাদা ?"

বাবলুর কথায় বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল যুবক। তারপর বলল, "জলাতঙ্ক বড় কঠিন রোগ, তাই না ?"

বাবলু হাসল।

যুবক বলল, "ওই রোগে ভুগে মরার চেয়ে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারানো অনেক ভাল। তা হলে শোনো, ওর নাম—।" বলে বাবলুকে ডেকে ওর কানে-কানে কী যেন বলল।

শুনেই চোখ কপালে উঠে গেল বাবলুর, "সত্যি বলছেন ?"

"তা হলেই বুঝলে তো ? কেন ওকে এত ভয় ?"

বাবলু বলল, "ওর ব্যাপারে আরও বিশদভাবে জানতে চাই। কিছুকাল আগে হাজারিবাগের গভীর জঙ্গলে পলিপ্যাকের বস্তাবন্দি প্রায় শতাধিক মানুষের মাথার খুলি পুলিশের হাতে পড়ে। পুলিশের ধারণা ওটা ওই দলেরই কাজ। কেননা ওই অঞ্চলে ওর চেয়েও দুর্ধর্ষ আর কেউ তো নেই। কিন্তু অত স্কাল ওখানে কেন জড়ো করেছিল ওরা ?"

"বিদেশে পাচার করবে বলে। কিন্তু গোল বাধাল শিবকুমার শর্মা নামে আর এক শয়তান।"

বাবলু বলল, "বাকিটা পরে শুনব। আগে আপনাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করি।" বলে সোজা ও.সি.র ঘরে গিয়ে ঢুকল বাবলু।

একটু পরেই বাবলুর সঙ্গে কীসব কথাবার্তার পর একজন কনস্টেবল এসে লকআপের তালা খুলে মুক্তি দিল যুবককে।

বাবলু বলল, "আপনি আজ আমাদের অতিথি। এখন সোজা আমাদের বাড়িতেই চলুন। তার আগে ডাক্তার সান্যালকে একটা ফোন করি।" বলে আবার অফিসারের ঘরে গেল ফোন করতে। কিন্তু ডায়াল ঘুরিয়ে ফোনে লাইন পেয়ে খবর যা শুনল তাতে শিউরে উঠল বাবলু। সে দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "না, না। এ অসম্ভব ! এ আমি বিশ্বাস করি না। কে বলছেন আপনি ? রং নম্বর নয় তো ?"

ও.সি. বললেন, "কী ব্যাপার ! হলটা কী ?"

বাবলু ফোনটা ও.সি'র হাতে দিল।

ফোনে খবর শুনেই লাফিয়ে উঠলেন ও.সি, "ইউ ব্লাডি ফুল। ধরতে পারলে তোমার ডানা আমি ছাঁটবই।"

ক্লান্ত, অবসন্ন বাবলু ও.সি'র ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বিলু বলল, "কী ব্যাপার বাবলু ? কোনও খারাপ খবর নয় তো ?"

বাবলু কিছু না বলে একবার ঘাড় নাড়ল শুধু।

ভোম্বল বলল, "সাসপেন্সে রাখিস না বাবলু। খুলে বল। এই মুহূর্তে টেনশন আর ভাল লাগছে না।"

বাবলু বলল, "আমাদের ওখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটা মালবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সঙ্ঘর্ষে ডাঃ সান্যাল...।"

"কী হয়েছে তাঁর ?"

"ঘটনাস্থলেই মৃত্যু। সেইসঙ্গে অর্কও হাওয়া। সে বেঁচে আছে না মরে গেছে, কেউ জানে না তা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের কারও মুখে আর কথাটি নেই। কী জটিল কাণ্ডকারখানা !

শব্দসন্ধান

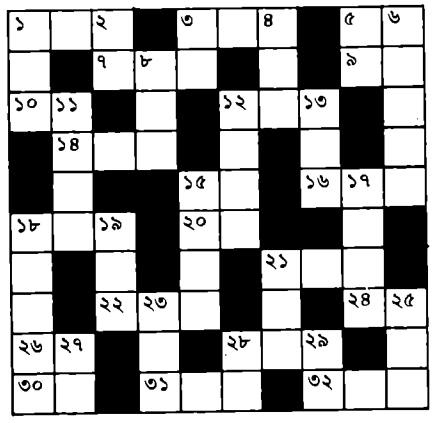

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) এই ক্রোধান্ধ মুনির অভিশাপে শকুন্তলাকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল। (৩) জল আনার ঘড়া। (৫) হত্যা। (৭) জমির সীমা-নির্দেশক নালা। (৯) বাণ। (১০) শূন্য হলে ঘুঘু চরে। (১২) বেতন। (১৪) জব্দ। (১৫) এর চেয়ে মসির শক্তি অধিক। (১৬) গভীর রাত্রি। (১৮) বাতাস। (২০) কান ঘুরিয়ে যা দেখানো হয়। (২১) বহু লোকের সমাবেশ। (২২) যে-মহিলা হাস্য-পরিহাসে পটু। (২৪) বাল্মীকির মহাকাব্যের নায়ক। (২৬) লঙ্কায় এই সেনাই ছিল রামচন্দ্রের ভরসা। (২৮) সীতার এক নাম। (৩০) অভাবে স্বভাব—। (৩১) ফরাসে যা হেলান দিয়ে আরামে বসা যায়। (৩২) ধনুকের ছিলার শব্দ।

উপর-নীচ : (১) দামামা জাতীয় প্রাচীন রণবাদ্য। (২) এরই দেবী মনসা। (৩) হস্ত। (৪) ১৮৫৭ সালে এরা বিদ্রোহ করেছিল। (৫) অধীন, আয়ত্ত। (৬) রাজা। (৮) ভেড়া। (১১) টানা-হেঁচড়া। (১২) মন সম্বন্ধীয়। (১৩) যে-মেয়ে নাচে। (১৫) কড়ে আঙুলের আগের আঙুল, সাধারণত যেখানে আংটি পরে। (১৭) ভোররাতে পুব আকাশে ও সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে এ জ্বলজ্বল করে। (১৮) বিশেষভাবে দেখা। (১৯) ঢেউ। (২১) কথা, ভাষা। (২৩) বালি। (২৫) সঙ্গীতের এই রাগে সাধারণত বর্ষার গান গাওয়া হয়। (২৭) দলিত, মর্দিত। (২৮) পত্নী। (২৯) বহু মূল্যবান পুঁথিই এর দ্বারা দষ্ট।

গত সংখ্যার সমাধান

বা	ন্ধ	ব			কা	মা	র	শা	লা
ল		ছ	ত্রা	কা	র			খা	ল
ক	দ	র			বা	তা	য়	ন	
	ঙ্গ		কে	শ	র			দী	ন
অ	ল	স	তা			ন	খ		ক
ধ		ন	ব			ক	র	বা	ল
র	ব			হ	তা	শা		তি	
	না	ম	ঞ্জু	র			কা	ক	লি
শা	ন্ত			তা	ল	পা	তা		খ
ক	র	ক	ম	ল			র	ন্ধ	ন

দেবসেনাপতি

সুদেষ্ণার মুখও ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাচ্চু আর বিচ্ছুর হাত দুটো সে যেভাবে শক্ত করে ধরল, তাতে বোঝাই গেল দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, ফোনটা তুমি কোথায় করেছিলে ? ডাক্তারবাবুর বাড়িতে নিশ্চয় ?"

"হ্যাঁ।"

"ফোনটা ধরেছিল কে ?"

"জানি না। তবে মনে হল ওঁদের পরিবারের কেউ ধরেনি।"

"তা হলে কে সে ?"

"কে জানে ? শুধু তাই নয়, ফোনের কথা শুনে ও.সি.ও কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যুবকের মুখের দিকে তাকালে সে বলল, "আর কি আমার যাওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে ? তোমাদের ডাক্তারবাবুই তো এখন সবকিছুর ঊর্ধ্বে।"

"তা হোক। তবু আপনাকে আমরা কথা দিয়েছি। তাই আপনার চিকিৎসার ভার আমাদের। তা ছাড়া আপনার মুখ থেকে আমরা কিছু শুনতে চাই।"

"বেশ, তবে চলো।"

বাবলুরা সবে থানা থেকে বেরিয়েছে এমন সময় হঠাৎ একটা গুলির শব্দ। ওরা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই যুবক লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলোয়।

থানা থেকে পুলিশের লোকজন ছুটে এল।

পঞ্চুও ভৌ-ভৌ রবে ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে। কিন্তু কোথায় কে ? অজ্ঞাত আততায়ী যে কোথা থেকে গুলি করে কোথায় হারিয়ে গেল, তা টেরও পেল না কেউ। কালো রাতের কুটিল অন্ধকারে ওরা নির্বাক।

পুলিশের লোকেরা যুবককে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেল।

আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা পুলিশের গাড়িতে চেপেই সুদেষ্ণাকে ওদের বাড়িতে ওর বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে যে যার বাড়িতে ফিরে এল। সে-রাতটা যে কীভাবে কাটল ওদের, তা ওরাই জানে।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালে ঘুম যখন ভাঙল বেলা তখন ন'টা।

ঘুম থেকে উঠেই বাবলু দেখল, বাবা বসে-বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। বাবা যে দুর্গাপুর থেকে কখন এসেছেন তা ও জানেই না ! অনেকদিন পরে বাবাকে দেখে খুবই আনন্দ হল ওর।

বাবা বললেন, "কী ব্যাপার ! এত বেলা অবধি কখনও তো ঘুমোস না তুই। শুনলাম আবার কীসব ঝামেলায় নাকি জড়িয়ে পড়েছিস ?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, খুব সিরিয়াস ব্যাপার। আমি চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে সব বলছি।"

"তোদের আর সবাই কোথায় ?"

"বাড়িতেই আছে যে যার। আমি পঞ্চুকে পাঠাচ্ছি, ও গেলেই এসে হাজির হবে সব।"

বাবলু বাথরুমের কাজ সেরে যখন ঘরে এসে বাবার সামনে টি-টেবিলে মুখোমুখি বসেছে, তখনই এল সব এক-এক করে। পঞ্চুকে যেতে হয়নি, ওরা নিজেরাই এসেছে।

বাবলু সবাইকে পাশে বসিয়ে ওর বাবাকে আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা খুলে বলল।

বাবা সব শুনে একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "তোদের তো দেখছি এবার

বহুমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। এক, রাজকুমারীকে উদ্ধার করা। দুই, অর্ককে ফিরিয়ে আনা এবং ডাক্তারবাবুর খুনের কিনারা করা। তিন, কালাচাঁদকে ফাঁদে ফেলা। চার, শিবকুমার-রহস্য ভেদ করা। পাঁচ, রাকেশের খোঁজ করা। ছয়, হাজারিবাগের নরমুণ্ড শিকারি গোল্ডেন প্রিন্স-এর মোকাবিলা।"

বাবলু বলল, "আমাদের এতদিনের এত কিছু সাফল্যের পরে এ এক কঠিন পরীক্ষা। একদিকে যাই তো আর-একদিক অন্ধকারে ঢেকে যায়। সত্যি, কী যে করি!"

বাবা বললেন, "কালাচাঁদ রায়কে আমি চিনি, খুব বাজে লোক। তবে ওই শিবকুমার শর্মার ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। ওই লোকটার সঙ্গে কালাচাঁদের সম্পর্ক কী?"

"বলছে তো সম্পর্কটা শ্যালক-ভগ্নীপতির।"

বাবা হাসলেন, বললেন, "ওদের ব্যাপারস্যাপারই আলাদা।"

মা ততক্ষণে সকলের জন্য চা-জলখাবার নিয়ে এসেছেন।

বাবা দুর্গাপুর থেকে এলেই বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানা নিয়ে আসেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। জলখাবারের সঙ্গে প্লেট ভর্তি তাও পড়ল। সেইসঙ্গে ধূমায়িত গরম চা।

ভোম্বলের সে কী আনন্দ সীতাভোগ দেখে! প্রথমেই তো জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার বুলিয়ে নিল। তারপর বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে-খেতে বলল, "দ্যাখ বাবলু, আমার মনে হয় আমাদের চা খাওয়া হলে সর্বাগ্রে কাল রাতের ওই লোকটির ব্যাপারে থানায় খবর নিয়ে কালাচাঁদের কালামুখের একটা ব্যবস্থা করে আসা উচিত। তারপর যদি কোনওরকমে ধরতে পারি রাকেশ নামের ওই কালো শয়তানকে, তখনই এক-এক করে সমস্ত রহস্যের জট খুলে যাবে।"

বিলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়। এই চক্রটার পরস্পরের মধ্যে একটা চমৎকার যোগসাজস আছে।"

বাচ্চু বলল, "কী থেকে কী হয়ে গেল দ্যাখো! অর্কদের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু রাজকুমারী? ওকে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল কী?"

বিচ্ছু বলল, "তাও সাহস কী! একেবারে দিনদুপুরে অসুস্থ মেয়েটাকে ঘরের ভেতর থেকে নিয়ে গেল। এমন ঘটনার কথা এর আগে আমরা শুনিওনি কখনও।"

এমন সময় পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হয়ে সকলে তাকাল বাইরের দিকে। দেখল গেটের কাছে ছিপছিপে চেহারার এক সুদর্শন যুবক চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আর তাকে দেখেই পঞ্চুর এত লম্ফঝম্ফ।

বাবলু কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে পঞ্চুকে চুপ করাল। তারপর আগন্তুককে জিজ্ঞেস করল, "কাকে চাই?"

সুদর্শন যুবক ম্লানমুখে একটু হাসি এনে বলল, "তোমাকেই।"

"কে আপনি?"

"তুমি বা তোমরা আমাকে চিনবে না। আমার নাম ভানু। ভানুপ্রতাপ। আমার বন্ধু শানু কাল রাতে আততায়ীর গুলিতে জখম হয়ে পুলিশ-হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।"

"ও, বুঝেছি। তা বলুন, আমাকে আপনার কিসের প্রয়োজন?"

ভানুপ্রতাপ হেসে বলল, "শুধু তোমাকে নয়, তোমাদের সবাইকেই। অনেক কথা বলার আছে আমার। একটু সময় দিতে হবে যে!"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আমার মনে হয়, এইসব কথাবার্তা আমাদের ঘাঁটিতে হওয়াই ভাল।"

"যেখানে তোমাদের সুবিধে হবে সেইখানেই আমি যেতে রাজি।"

বাবলু বলল, "তার আগে এক কাপ চা চলতে পারে কি?"

ভানুপ্রসাদ বলল, "না ভাই। এখন আমার মুড নেই। আগে আমার সব কথা তোমাদের বলি, তারপর চা-পর্ব। তা ছাড়া এইমাত্র চা আমি খেয়ে এসেছি।"

বাবলুর বাবা-মা দু'জনেই একবার দূর থেকে দেখলেন যুবককে। তারপর ভেতরে চলে গেলেন।

বাবলুও ঘরে ঢুকে বেশ রীতিমত তৈরি হয়েই বেরিয়ে এসে বলল, "চলুন।"

ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে মিত্তিরদের বাগানের দিকে চলল। পঞ্চুও গেল ওদের সঙ্গে। তবে আগের মতো আগ বাড়িয়ে নয়। সবার সঙ্গে একভাবে কাছে-কাছে থেকে হেলেদুলে ড্যাংলিং টেকনিকে।

মিত্তিরদের বাগানে প্রবেশ করে সেই চিরপরিচিত গুলঞ্চগাছটির নীচে ঘন ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসল সবাই।

ভানুপ্রসাদ বলল, "তোমরা হয়তো আমাকে দেখে খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছ, মনে-মনে ভাবছ কে আমি? তা হলে শোনো, শানু আর আমি দু'জনেই হলাম অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই আমরা দু'জনে একসঙ্গে মানুষ হয়েছি। পড়াশোনায় ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে সিনেমা দেখে, আড্ডা মেরে বেড়িয়েছি। ঘরের সঙ্গে কোনওদিনই কোনও সম্পর্কই রাখিনি আমরা। এমনই বখে গিয়েছিলাম যে, আমাদের বাড়ির লোকরাও আমাদের পরিচয় দিতে লজ্জা পেত। সে যাই হোক, সেসব পাটও এখন চুকে গেছে। এখন দু'জনেই আমরা ঘরছাড়া। আমাদের এখন থাকারও কোনও নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। এইভাবে অসৎসঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একসময় আমরা 'গোল্ডেন প্রিন্স' নামে এক শয়তানের সংস্পর্শে এলাম। জঙ্গলের বড়-বড় গাছ কেটে চোরাচালান দেওয়া, আর মরা মানুষের মাথার স্কাল নিয়ে ব্যবসা করা, কোনওটিতেই ব্যর্থ নয় সে।"

বাবলু বলল, "জানি। কিছুদিন আগে ওই গোল্ডেন প্রিন্সকে নিয়ে কাগজে অনেক লেখালিখি হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। পুলিশ ওর পেছনে শনির মতো লেগে থেকেও ধরতে পারেনি ওকে। জঙ্গলের কোন গভীরে কোথায় যে ওর ঠেক তা কেউ জানে না। অথচ যখন-তখন মোটরবাইক নিয়ে হঠাৎ করে ও লোকালয়ে চলে আসে। এমনই আচমকা ওর যাতায়াত যে, পুলিশের সামনে দিয়ে চলে গেলেও পুলিশ তাকে চিনতে পারে না। পারলেও কিছু করবার অবকাশ পায় না। ওর সম্বন্ধে প্রবাদ, বনের হিংস্র জন্তুরাও ওকে ভয় পায়। তা আমরা ওর দলে ভিড়ে এমন কাজ নেই যে, করিনি। সে-কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিকও আমরা পেয়েছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ঝুঁকি নিতে নিতে এমনই একটা পর্যায়ে এসে গেছি আমরা যে, আর এ-কাজ ভাল লাগছে না। অথচ ওর দল ছেড়ে যে বেরিয়ে আসব সে-উপায়ও নেই। কারণ আমাদের একজন দলত্যাগী সুদূর দক্ষিণে পালিয়েও রেহাই পায়নি ওর লোকেদের হাত থেকে। ওরা সেখানে গিয়েও তাকে খুঁজে বের করে শেষ করে এসেছে।"

"তার মানে শুধু হাজারিবাগের ওই জঙ্গলে নয়, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই ঘাঁটি আছে ওর!"

"অথচ এই প্রিন্সকে দেখতে এমনই সুন্দর যে, ওই সুন্দরের আড়ালে কোনও হিংস্র প্রাণী বাসা বেঁধে থাকতে পারে বলে ধারণাও করতে পারবে না কেউ।"

বাবলু বলল, "সে কী! এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, অথচ অমন মিষ্টি চেহারা?"

(ক্রমশ)

গত ৬ অক্টোবর রবীন্দ্রসদনে হয়েছে আন্তঃস্কুল বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা 'অঙ্কুর '৯৬'-এর মূলপর্বের অনুষ্ঠান। জানিয়েছেন **অভীক ভট্টাচার্য**

অঙ্কুর '৯৬

কে বলল, ছোটরা নাটক করতে পারে না ? কে বলল, ছোটদের নাটক মানেই ভূত-প্রেত-দত্যি-দানোয় ভরা রূপকথার রাজ্য ? গত ৬ অক্টোবর রবীন্দ্রসদনে 'আনন্দমেলা' পত্রিকা ও 'পাঠভবন' স্কুলের মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃস্কুল বাংলা একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা 'অঙ্কুর '৯৬'-এর চূড়ান্ত পর্বের অনুষ্ঠান দেখার পর এসব তথাকথিত প্রচলিত অভিযোগের বিরুদ্ধে অনায়াসে লড়ে যাওয়া যায়। অনেকেরই ধারণা আছে, ছোটদের নাটক মানেই 'আলিবাবা' কিংবা 'আলাদিন', বড়জোর সিন্দবাদ নাবিকের কোনও গল্প। কিন্তু রীতিমত সমকালীন সামাজিক সমস্যা নিয়ে পুরোদস্তুর পরিণতমনস্ক নাটক করছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা, এরকম অভিজ্ঞতা আছে ক'জনের ? সত্যি বলতে কী, ৬ অক্টোবর রবীন্দ্রসদনের অনুষ্ঠান দেখার পর মনে হয়েছে একটিই কথা, স্কুলের ছোট-ছোট ছাত্রছাত্রীদের ওপর অনায়াসে ভরসা রাখা যায়। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় আরও একটি কথা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নাকি নাটক প্রযোজনা ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকর্মীদের দ্বারস্থ হতে হয় বিদেশি নাটক ও নাট্যকারদের। অঙ্কুর '৯৬-এর প্রতিযোগীরা প্রমাণ করেছে, বাংলা নাটক নিয়ে এখনও কাজ করার সুযোগ আছে যথেষ্টই।

'আনন্দমেলা' পত্রিকা ও 'পাঠভবন' স্কুলের মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে কলকাতার বেশ কিছু নামকরা স্কুল। এদের মধ্যে উল্লেখ করতে হবে 'ভারতীয় বিদ্যাভবন', 'সল্ট লেক স্কুল', 'খিদিরপুর বালিকা বিদ্যালয়', 'সুজাতাদেবী বিদ্যামন্দির', 'দ্য ওরিয়েন্টাল সেমিনারি', 'সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুল' 'এপিজে স্কুল', 'পাঠভবন' প্রভৃতি বিদ্যালয়ের কথা। প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বের বাধা টপকে চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছেছিল সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুল, এপিজে স্কুল এবং পাঠভবন।

চূড়ান্ত পর্বের প্রথম নাটক 'তিলোত্তমা', মঞ্চস্থ করে পাঠভবন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। স্কুলের শিক্ষক দীপঙ্কর সরকারের রচিত ও নির্দেশিত 'তিলোত্তমা' নাটকটি সমকালীন জীবনের অত্যন্ত মৌলিক একটি প্রশ্ন তুলে ধরেছে। সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে গিয়ে কীভাবে আমরা ক্রমশ যান্ত্রিক হয়ে পড়ছি, তারই এক মর্মস্পর্শী চিত্র পাওয়া যায় নাটকটিতে। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সমাজ আমাদের মানুষ হিসেবে গড়ে না তুলে রোবট হিসেবে গড়ে তুলছে—প্রতিযোগিতামূলক জীবনের এই করুণ পরিণতির দিকেই ইঙ্গিত করে নাটকটি।

পাঠভবন স্কুলের নাটক 'তিলোত্তমা'-র একটি দৃশ্য

ফোটো : দেবাশিস রায়

দিনের দ্বিতীয় নাটক 'তেঁতুলগাছ', মঞ্চস্থ করে এপিজে স্কুল। মনোজ মিত্রের এই বহুপরিচিত নাটকটিও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থাপনার গুণে এক নতুন মাত্রা পায়। ব্যবসায়ীদের অর্থলিপ্সা ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদের কথা আছে এই নাটকটিতে। তেঁতুলগাছ কাটার বিরুদ্ধে গ্রামের মানুষের সম্মিলিত প্রতিবাদ যেন পরোক্ষে ছুঁয়ে থাকে পরিবেশ-সংরক্ষণের প্রশ্নটিকেও। এভাবেই নাটকটি হয়ে ওঠে সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় নাটক 'গুরু', মঞ্চস্থ করে সেন্ট টমাস বয়েজ স্কুলের ছাত্ররা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অচলায়তন' নাটকের সংক্ষেপিত নাট্যরূপ 'গুরু' নিয়ে নতুন করে নিশ্চয়ই কিছু বলার নেই। প্রাতিষ্ঠানিকতার প্রাচীর ভেঙে বেঁচে থাকার সহজ ও স্বতস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার প্রকাশই রূপকের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে এই নাটকে। নিয়মের বেড়া ভেঙে থেমে থাকা সমাজের শতাব্দীলালিত অন্ধকার ঘুচিয়ে আলো নিয়ে আসার নাটক 'গুরু'। আনন্দের যে, স্কুলের ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথের নাটক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ছুঁয়ে থাকতে চেয়েছে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকেই।

প্রতিযোগিতার মূলপর্বের বিচারক ছিলেন বিভাস চক্রবর্তী, অরুণ মুখোপাধ্যায় ও গৌরী ঘোষ। প্রতিটি নাটকই পরিবেশনা ও অভিনয়ের গুণে মনোজ্ঞ হলেও বিচারকদের বিবেচনায় সেরা নাটকের সম্মান পায় এপিজে স্কুলের 'তেঁতুলগাছ'। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে পাঠভবন স্কুল। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সম্মান পায় যথাক্রমে এপিজে স্কুলের কনীশ মজুমদার ও পাঠভবন স্কুলের অপরাজিতা ঘোষ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিশিষ্ট কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নাটকগুলির সুন্দর বিশ্লেষণ করে মূল বক্তব্যগুলি বুঝিয়ে দেন তিনি। তাঁর কথায় নিশ্চয় অনুপ্রাণিত হয়েছে সেদিনের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুবীর মিত্র। সবশেষে উল্লেখ থাকুক, কোনও পত্রিকা ও বিদ্যালয়ের মিলিত উদ্যোগে এ-ধরনের নাট্যানুষ্ঠান কলকাতা শহরে নিঃসন্দেহে এই প্রথম। এই অঙ্কুর যত দ্রুত, যত বর্ণময়ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে, ততই মঙ্গল।

মাধ্যমিক পরীক্ষার লে খা প ড়া

ভৌতবিজ্ঞান

মাধ্যমিক 'ভৌতবিজ্ঞান'-এর প্রশ্নপত্রে চিন্তা-উদ্দীপক নানারকম প্রশ্ন দেখা যায়। পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠায় সবসময় সেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না।

'মাধ্যমিক পরীক্ষার লেখাপড়া' বিভাগে আমরা সেসব প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। পাঠ্যসূচির অন্তর্ভূত বিষয়গুলির খুঁটিনাটি ছাত্রছাত্রীদের জানানোর জন্য প্রথাগত প্রশ্নাবলীও আমাদের আলোচনার আওতায় আসবে। তবু, পড়তে-পড়তে পরীক্ষার্থীদের মনে যেসব প্রশ্ন জাগে, তার সবকিছু আগাম জেনে নিয়ে উত্তর দেওয়া বোধ করি কারও পক্ষে সম্ভব নয়, যদি না এ-ব্যাপারে তোমরা সক্রিয়ভাবে আমাদের সহায়তা করো।

তাই, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তোমরা মাধ্যমিক পাঠ্যসূচির প্রাসঙ্গিক যে-কোনও প্রশ্ন 'আনন্দমেলা'র দফতরে লিখে পাঠাও। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোমাদের সমস্ত সুনির্বাচিত প্রশ্নের সমাধান আনন্দমেলায় প্রকাশ করব।

অজয় চক্রবর্তী
অধ্যাপক, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পর্ব
(পরিমাপের একক ও পদ্ধতি, ভর ও শক্তির নিত্যতা-সূত্র)

এক নজরে আলোচ্য বিষয়গুলির মূল জ্ঞাতব্য

স্কেলার রাশি : যেসব রাশির কেবলমাত্র মান আছে, কিন্তু কোনও দিক বা অভিমুখ নেই, তাকে স্কেলার রাশি বা নির্দিক রাশি বলা হয়। ভর, আয়তন, দ্রুতি, উষ্ণতা, শক্তি, চাপ ইত্যাদি স্কেলার রাশির দৃষ্টান্ত।

ভেক্টর রাশি : যেসব রাশির মান এবং দিক—দুই-ই আছে তাকে ভেক্টর রাশি বা সদিক রাশি বলা হয়। বেগ, ত্বরণ, বল, ভরবেগ, ওজন ইত্যাদি ভেক্টর রাশির দৃষ্টান্ত।

ভৌত রাশির একক : কোনও ভৌত রাশির পরিমাপ করতে হলে ওই রাশির একটি নির্দিষ্ট এবং সুবিধাজনক পরিমাণকে একক মাপের মাপকাঠি ধরে নিতে হয় এবং তার সঙ্গে তুলনা করে ওই ভৌত রাশির মান প্রকাশ করা হয়। পরিমেয় রাশির ওই নির্দিষ্ট এবং সুবিধাজনক পরিমাণকেই ওই রাশির একক বলা হয়।

মৌলিক একক : যেসব একক অন্য কোনও সরলতর এককের ওপর নির্ভর করে না, তাদের মৌলিক একক বলা হয়। ভাষান্তরে বলা যায়, যেসব রাশি অন্য কোনও সরলতর রাশির ওপর নির্ভরশীল নয় তাদের এককে মৌলিক একক বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, সময়ের একক **'সেকেন্ড'**, দৈর্ঘ্যের একক **'মিটার'**, ভরের একক 'কিলোগ্রাম', উষ্ণতার একক **'কেলভিন'**, দীপন-প্রাবল্যের একক **'ক্যান্ডেলা'**, তড়িৎপ্রবাহের একক **'অ্যাম্পিয়ার'** মৌলিক এককের দৃষ্টান্ত।

লব্ধ একক : যেসব ভৌত রাশির একক এক বা একাধিক মৌলিক এককের সাহায্যে গঠিত হয় তাদের এককে লব্ধ একক বলা হয়। দ্রুতির একক 'মিটার/সেকেন্ড' (m/s), ত্বরণের একক 'মিটার/সেকেন্ড^2', ক্ষেত্রফলের একক 'মিটার^2' (m^2), ঘনত্বের একক 'কিলোগ্রাম/মিটার^3' (kg/m^3) ইত্যাদি লব্ধ এককের দৃষ্টান্ত।

এককের বিভিন্ন পদ্ধতি : [(১) সি জি এস বা মেট্রিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের একক যথাক্রমে **সেন্টিমিটার** (cm), গ্রাম (g), এবং সেকেন্ড (s)। মিটারকে দৈর্ঘ্যের মানক (standard) ধরা হয় বলে এই পদ্ধতিকে মেট্রিক পদ্ধতিও বলা হয়। এ পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য এবং ভরের এককের ভগ্নাংশ এবং গুণিতাংশগুলি একে অন্যের সঙ্গে দশ বা দশের ঘাত দিয়ে সম্পর্কযুক্ত বলে একে **দশমিক পদ্ধতিও** বলা হয়।

(২) **এফ পি এস পদ্ধতি বা ব্রিটিশ পদ্ধতি** : এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য ভর এবং সময়ের একক যথাক্রমে ফুট

(ft), পাউন্ড (lb) এবং সেকেন্ড (s)। ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল বলে একে **ব্রিটিশ পদ্ধতিও** বলা হয়।

(৩) **এম কে এস পদ্ধতি** : এই পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর এবং সময়ের একক যথাক্রমে মিটার (m), কিলোগ্রাম (kg) এবং সেকেন্ড (s)।

এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি এবং এস আই একক : ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির এম কে এস পদ্ধতির ভিত্তিতে এককের যে-পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন তাকে এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি বলা হয়। 'আন্তর্জাতিক পদ্ধতি' কথাটির ফরাসি তর্জমা হল 'Systeme internationale'। এই পদ্ধতির এককগুলিকে **এস আই একক** বলা হয়। বলা বাহুল্য, 'এস আই' (S.I.) হল Systeme internationale-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

গড় সৌর দিন এবং সেকেন্ড : সূর্য যখন ভৌগোলিক মধ্যরেখার ওপরে থাকে তখন 'মধ্যাহ্ন'। পর পর দুটি মধ্যাহ্নের মধ্যবর্তী সময়ের অবকাশকে 'সৌর দিন' বলা হয়। এক বছরের সমস্ত সৌর দিনের মানের গড় নিয়ে **'গড় সৌর দিন'** পাওয়া যায়।

1 গড় সৌর দিন = 24×60×60 সেকেন্ড =86,400 সেকেন্ড।

ভরের নিত্যতা সূত্র : কোনও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক পদার্থের মোট ভর সব সময় বিক্রিয়াজাত পদার্থের মোট ভরের সমান হয়। অর্থাৎ, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের রূপান্তর ঘটে মাত্র, পদার্থের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না।

শক্তির নিত্যতা সূত্র : শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই। একরকম শক্তি অন্যরকম শক্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র। বিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ ধ্রুবক।

ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র : আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে শক্তি ও পদার্থ পরস্পরের তুল্য। পদার্থের ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়, শক্তিও ভরে রূপান্তরিত হতে পারে, শক্তিও ভরের তুল্যতার পরিপ্রেক্ষিতে ভরের নিত্যতা সূত্র এবং শক্তির নিত্যতা সূত্রকে একত্রিত করে ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্রটি বিবৃত হয়েছে। এই সূত্র অনুসারে, বিশ্বের মোট ভর ও শক্তির যোগফল ধ্রুবক।

গুরুত্বপূর্ণ হ্রস্বোত্তর প্রশ্নাবলী

পরিমাপের একক ও পদ্ধতি

(১) আলোকবর্ষ কাকে বলে ? কিলোমিটারের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী ?

আলো শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে এক বছরে যে-দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে আলোকবর্ষ বলা হয়। অর্থাৎ, আলোকবর্ষ একটি দূরত্বের একক, আলো এক সেকেন্ডে শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে 3×10^5 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। কাজেই,

1 আলোকবর্ষ = $(3 \times 10^5) \times 60 \times 60 \times 24 \times 365$ কিলোমিটার = 9.45×10^{12} কিলোমিটার

(২) 'সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৪ আলোক-মিনিট।' এ উক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

আলো শূন্যস্থানের মধ্য দিয়ে প্রতি মিনিটে যে-দূরত্ব অতিক্রম করে, তাকে 1 আলোক-মিনিট বলা হয়। সুতরাং, সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ৪ আলোক-মিনিট বলতে বোঝায় যে, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে প্রায় ৪ মিনিট সময় লাগে।

(৩) একটি দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত পথের দৈর্ঘ্যকে 100 গজ থেকে বদলে 100 মিটার করা হল। এতে পথের কতটা হ্রাস বা বৃদ্ধি হল ?

আমরা জানি যে, 1 ফুট = 30.48 সেন্টিমিটার

কাজেই, 1 গজ = 3×30.48 সেন্টিমিটার = 0.9144 মিটার

$\therefore$ 100 গজ = 91.44 মিটার

স্পষ্টতই, 100 মিটার দৈর্ঘ্য 100 গজ দৈর্ঘ্যের তুলনায় বেশি, পথের দৈর্ঘ্যকে 100 গজ থেকে 100 মিটার করলে পথের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির পরিমাণ = 100 মিটার − 100 গজ = (100 − 91.44) মিটার = 8.56 মিটার

(৪) তামার তৈরি একটি নিরেট গোলকের ভর 130 g এবং একটি নিরেট ঘনকের ভর 1.5 kg. কোনটির ঘনত্ব বেশি ? গোলকটির, না কি ঘনকটির ?

কোনও বস্তুর ঘনত্ব কেবলমাত্র বস্তুটির উপাদানের ওপর নির্ভর করে, বস্তুটির আকৃতির ওপর নির্ভর করে না। এ-ক্ষেত্রে গোলকটি এবং ঘনকটি একই উপাদানের (তামার) তৈরি। কাজেই, গোলক এবং ঘনক— এদের উভয়ের ঘনত্ব সমান।

(৫) একটি লোহার বলের ভর 20 পাউন্ড হলে কিলোগ্রাম এককে ওই বলের ভর কত ?

আমরা জানি যে, 1 পাউন্ড = 453.6 g

$\therefore$ 20 পাউন্ড = 453.6×20 g = 9.072 kg

অর্থাৎ, 20 পাউন্ড = 9.072 কিলোগ্রাম

(৬) ওজন-বাক্সের বাটখারাগুলির ভরের অনুপাত 5:2:2:1 হওয়ার সার্থকতা কী ?

5 এককের একটি, 2 এককের দুটি এবং 1 এককের একটি বাটখারার সাহায্যে 1 থেকে 10 পর্যন্ত যে- কোনও অখণ্ড একক মানের ভরের পরিমাপ করা যায়। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে,

1=1, 2=2, 3=2+1, 4=2+2, 5=5, 6=5+1, 7=5+2, 8=5+2+1, 9=5+2+2, 10=5+2+2+1

এই কারণেই ওজন-বাক্সে 5:2:2:1 অনুপাতে বাটখারা রাখা হয়।

(৭) একটি সরু মাপনি চোঙের সাহায্যে কোনও ড্রপারের এক ফোঁটা জলের আয়তন কীভাবে নির্ণয় করা যায় ?

ড্রপারের এক ফোঁটা জলের আয়তন এত কম যে, কোনও আয়তন মাপনি-চোঙ দিয়ে সেই আয়তন মাপা যায় না। কিন্তু একটি সরু মাপনি-চোঙে বেশ কয়েক ফোঁটা জল নিয়ে সহজেই এক ফোঁটা জলের আয়তন মাপা যাবে।

মনে করি, মাপনি-চোঙে N সংখ্যক জলের ফোঁটা নেওয়া হল। N -এর মান যথেষ্ট বেশি হলে মাপনি-চোঙে পরিমাপযোগ্য তরল সংগৃহীত হবে।

ধরি, সংগৃহীত জলের আয়তন = V cm^3

কাজেই, ড্রপারের এক ফোঁটা জলের গড় আয়তন = $\frac{V}{N}$ cm^3

(৮) পারদের ঘনত্ব 13.6 g/cm^3 হলে এস.আই. এককে পারদের ঘনত্বের মান কত ?

ঘনত্বের সংজ্ঞানুসারে, 1 cm^3 পারদের ভর = 13.6g

কাজেই, 10^6 cm^3 পারদের ভর = 13.6×10^6 g

বা, $(10^2 cm)^3$ পারদের ভর = 13.6×10^3 kg

বা, 1 m^3 পারদের ভর = 13.6×10^3 kg

সুতরাং, এস.আই. এককে পারদের ঘনত্ব = 13.6×10^3 kg/m^3

(৯) আপেক্ষিক গুরুত্ব বা আপেক্ষিক ঘনত্ব কাকে বলে ? আপেক্ষিক গুরুত্বের সঙ্গে কোনও পদার্থের ঘনত্বের সম্পর্ক কী ?

কোনও পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তনের ওজন এবং 4°C উষ্ণতাবিশিষ্ট সম-আয়তন জলের ওজনের অনুপাতকে ওই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব বলা হয়।

সংজ্ঞানুসারে, আপেক্ষিক গুরুত্ব (s)

$$= \frac{\text{V আয়তন পদার্থের ওজন}}{\text{4°C উষ্ণতাবিশিষ্ট V আয়তন জলের ওজন}}$$

$$= \frac{\text{একক আয়তন পদার্থের ওজন}}{\text{4°C উষ্ণতাবিশিষ্ট একক আয়তন জলের ওজন}}$$

$$= \frac{\text{একক আয়তন পদার্থের ভর}}{\text{4°C উষ্ণতাবিশিষ্ট একক আয়তনের ভর}}$$

$$= \frac{\text{পদার্থের ঘনত্ব}}{\text{4°C উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব}}$$

কাজেই, কোনও পদার্থের ঘনত্ব = ওই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব × 4°C উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব

(১০) শূন্য অবস্থায় একটি পাত্রের ভর 410g । পাত্রটিকে 4°C উষ্ণতাবিশিষ্ট জল দিয়ে ভর্তি করলে জলপূর্ণ পাত্রটির ভর হয় 890g । পাত্রটিকে জলের পরিবর্তে কেরোসিন দিয়ে ভর্তি করলে এর মোট ভর হয় 794g । কেরোসিনের ঘনত্ব নির্ণয় করো ।

শূন্য অবস্থায় পাত্রটির ভর = 410 g

4°C উষ্ণতাসম্পন্ন জলে পূর্ণ অবস্থায় পাত্রটির ভর = 890 g

কাজেই, পাত্রের সমান আয়তন জলের (4°C উষ্ণতাবিশিষ্ট) ভর = (890–410)g = 480g ....(i)

আবার, কেরোসিনপূর্ণ অবস্থায় পাত্রটির ভর = 814 g

কাজেই, পাত্রের সমান আয়তন কেরোসিনের ভর = (794–410)g = 384g ....(ii)

∴ কেরোসিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব (s)

$$= \frac{\text{পাত্রের সমান আয়তন কেরোসিনের ভর}}{\text{পাত্রের সমান আয়তন জলের (4°C উষ্ণতার) ভর}}$$

$$= \frac{384g}{480g} \quad \text{[সমীকরণ (i) এবং (ii) থেকে]}$$

∴ কেরোসিনের আপেক্ষিক গুরুত্ব $= \frac{384}{480} = 0.80$

কাজেই, কেরোসিনের ঘনত্ব = 0.80 g/cm^3 বা 800 kg/m^3

(১১) রূপার ঘনত্ব 10.5 g/cm^3 । এফ.পি.এস. পদ্ধতিতে এর ঘনত্ব কত ?

আমরা জানি যে, কোনও পদার্থের ঘনত্ব

= ওই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব × 4°C উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব

এফ.পি.এস. পদ্ধতিতে জলের ঘনত্ব = 62.5 lb/ft^3

রূপার ঘনত্ব 10.5 g/cm^3 বলে রূপার আপেক্ষিক গুরুত্ব = 10.5

∴ রূপার ঘনত্ব = 10.5 × 62.5 lb/ft^3 = 937.5 lb/ft^3

(১২) একটি ত্রুটিপূর্ণ তুলাযন্ত্রের বাহু দুটি সমান, কিন্তু এদের তুলাপাত্র দুটির ওজন অসমান । ডান তুলাপাত্রে রেখে কোনও বস্তুর ভর মেপে বস্তুটির আপাত ভর পাওয়া গেল m_1 । এবং বাম তুলাপাত্রে রেখে ওই বস্তুর ভর মেপে আপাত ভর পাওয়া গেল m_2 দেখাও যে, বস্তুটির প্রকৃত ভর = $(m_1+m_2)/2$

মনে করি, ডান পাশের তুলাপাত্রের ভর = M_1

এবং বাম পাশের তুলাপাত্রের ভর = M_2

প্রদত্ত শর্তানুসারে, পরীক্ষাধীন বস্তুটিকে যখন ডান তুলাপাত্রে রাখা হয় তখন বাঁ তুলাপাত্রে m_1 ভরের বাটখারা রাখলে তুলাযন্ত্র ব্যালান্স হয় (চিত্র ১) । এ ক্ষেত্রে

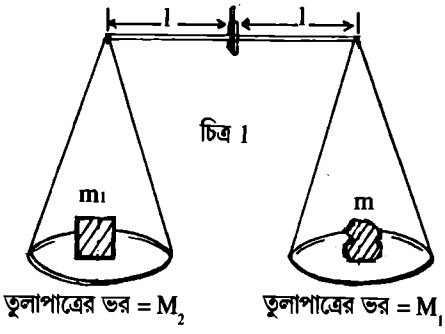

চিত্র 1

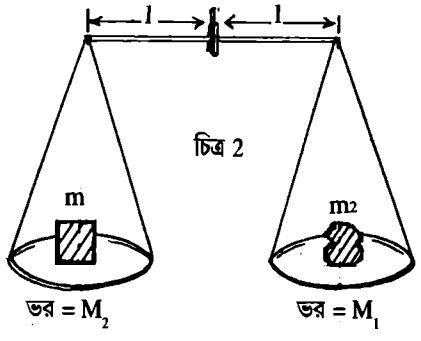

চিত্র 2

আলম্বের সাপেক্ষে দু'পাশের ওজনের ভ্রামক, সমান হয় বলে লেখা যায়,

$(M_1+m)g.l = (M_2+m_1 g.l$

এখানে m = পরীক্ষাধীন বস্তুটির প্রকৃত ভর, g = অভিকর্ষজ ত্বরণ এবং l = তুলাযন্ত্রের উভয় বাহুর দৈর্ঘ্য ।

বা, $(M_1+m) = M_2 + m_1$ ....(i)

আবার, পরীক্ষাধীন বস্তুটিকে যখন বাম তুলাপাত্রে রাখা হয় তখন ডান তুলাপাত্রে m_1 ভরের বাটখারা রাখলে তুলাযন্ত্র ব্যালান্স হয় । কাজেই দেখা যায়,

$(M_2 + m)\, g \times l = (M_1 + m_2) g \times l$

বা, $M_2+m = M_1+m_2$ ....(ii)

সমীকরণ (i) এবং (ii) যোগ করে পাই,

$M_1 + M_2 + 2m = M_1 + M_2 + m_1 + m_2$

বা, $2m = (m_1 + m_2)$

বা, $m = (m_1 + m_2)/2$

(১৩) এফ.পি.এস. পদ্ধতির চেয়ে মেট্রিক পদ্ধতি অধিকতর সুবিধাজনক কেন ?

মেট্রিক পদ্ধতিতে একই রাশির বিভিন্ন এককের মধ্যে 10 বা 10-এর ঘাতের সম্পর্ক বর্তমান বলে এই পদ্ধতিতে এক এককে থেকে অন্য এককে রূপান্তর খুবই সহজসাধ্য, কেবলমাত্র দশমিক চিহ্ন সরিয়েই তা করা সম্ভব । যেমন, 1.257 মিটার = 12.57 ডেসিমিটার = 125.7 সেন্টিমিটার = 1257 মিলিমিটার । ব্রিটিশ পদ্ধতি বা এফ.পি.এস পদ্ধতিতে এরূপ সুবিধা পাওয়া যায় না ।

মেট্রিক পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্য, ভর ও আয়তনের পারস্পরিক সম্পর্কও ব্যবহারিক দিক দিয়ে সুবিধাজনক। উদাহরণস্বরূপ, 4°C উষ্ণতায় 1 ঘন সেন্টিমিটার (cm^3) বিশুদ্ধ জলের ভর 1 গ্রাম। সুতরাং, cm^3 এককে কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের আয়তন জানা থাকলে সহজেই গ্রাম এককে এর ভর পাওয়া যায়। একই ভাবে, গ্রাম এককে কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের ভর জানা থাকলে cm^3 এককে সরাসরি (কোনও গুণ-ভাগ না করে) এর আয়তন পাওয়া যায়। এফ.পি.এস. পদ্ধতিতে এরকম সুবিধে নেই।

(১৪) 20°c উষ্ণতায় একটি ধাতব স্কেল সঠিক দৈর্ঘ্যের পাঠ দেয়। 25°c উষ্ণতায় এই স্কেলের সাহায্যে মেপে একটি বস্তুর দৈর্ঘ্যের মান পাওয়া গেল 50 cm। বস্তুটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য 50cm অপেক্ষা কম হবে, না কি বেশি হবে ?
উষ্ণতাবৃদ্ধির ফলে ধাতব স্কেলের দৈর্ঘ্যের প্রসারণ ঘটে। কাজেই, 20°c উষ্ণতায় স্কেলের যে-দাগের দৈর্ঘ্য 1 সেন্টিমিটার 25°c উষ্ণতায় তার দৈর্ঘ্য 1 সেন্টিমিটারের তুলনায় সামান্য বেশি হয়। কাজেই, 25° উষ্ণতায় স্কেলটি যে-দৈর্ঘ্যের পাঠ দেয় 1 cm তার প্রকৃত মান 1 cm-এর তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি। কাজেই, এক্ষেত্রে বস্তুটির দৈর্ঘ্য 50 cm-এর তুলনায় বেশি হবে।

(১৫) একটি তুলাযন্ত্রের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য অসমান। এই ত্রুটিপূর্ণ তুলাপাত্রের সাহায্যে একটি বস্তুকে প্রথমে বাম তুলাপাত্রে রেখে এবং দ্বিতীয় বার ডান তুলাপাত্রে ওজন করা হল। প্রথম ক্ষেত্রে বস্তুটির আপাত ভর পাওয়া গেল m_1। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তুটির আপাত ভর পাওয়া গেল m_2। বস্তুটির প্রকৃত ভর কত ?
মনে করি, পরীক্ষাধীন বস্তুটির প্রকৃত ভর = m

চিত্র-3

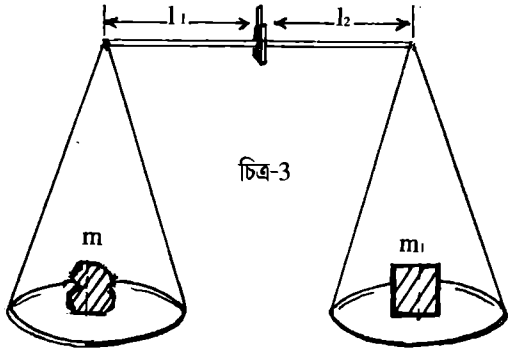

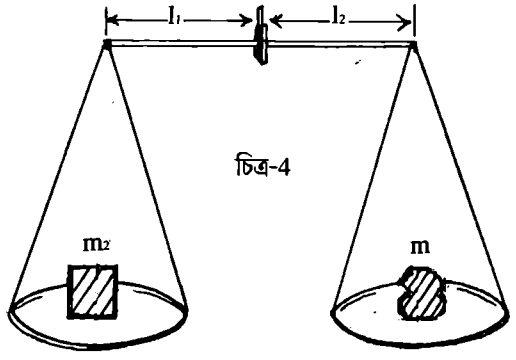

চিত্র-4

বস্তুটিকে বাম তুলাপাত্রে রেখে ওজন করলে বস্তুটির আপাত ভর পাই m_1 (চিত্র 3)। সুতরাং, আলম্বের সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে লেখা যায়,

$$mg \times l_1 = m_1 g \times l_2$$
$$\text{বা, } ml_1 = m_1 L_2 \quad \text{.....(i)}$$

আবার, বস্তুটিকে ডান তুলাপাত্রে রেখে ওজন করে এর আপাত ভর পাওয়া গেল m_2 (চিত্র 4)। কাজেই, আলম্বের সাপেক্ষে ভ্রামক নিয়ে পাই,

$$mg \times l_2 = m_2 g \times l_1$$
$$\text{বা, } ml_2 = m_2 l_1 \quad \text{.....(ii)}$$

সমীকরণ (i) এবং (ii) গুণ করে পাই,

$$m^2 l_1 l_2 \qquad m_1 m_2 l_1 l_2$$
$$\text{বা } m^2 = m_1 m_2 \qquad \text{বা } m = \sqrt{m_1 m_2}$$

অর্থাৎ, বস্তুটির প্রকৃত ভর এর আপাত ভর m_1 এবং m_2 এর গুণোত্তরীয় মধ্যকের (geometrical mean) সমান হয়।

ভর ও শক্তির নিত্যতা সূত্র

(১) ভর এবং ওজনের পার্থক্য কী ?
ভর এবং ওজন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও এদের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্যগুলি লক্ষণীয়।
(i) ভর হল বস্তুর জাড্যের পরিমাপ। বস্তুর ওজন হল বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাপ।
(ii) ভর একটি স্কেলার রাশি, কিন্তু ওজন একটি ভেক্টর রাশি।
(iii) কোনও বস্তুর ভর তার অপরিবর্তনীয় স্বধর্ম। কিন্তু অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন ঘটে।
(iv) সি.জি.এস, এফ.পি.এস এবং এম.কে.এস. পদ্ধতিতে ভরের একক যথাক্রমে গ্রাম, পাউন্ড এবং কিলোগ্রাম। এই তিন পদ্ধতিতে ওজনের একক যথাক্রমে ডাইন, পাউন্ডাল এবং নিউটন।
(v) সাধারণ তুলাযন্ত্রের সাহায্যে ভর মাপা যায়। স্প্রিংতুলার সাহায্যে ওজন মাপা যায়।

(২) কী কী কারণে ওজনের পরিবর্তন ঘটে ?
নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন ঘটে :
(i) **পৃথিবীর অসম আকৃতি** : পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, এটি নিরক্ষীয় অঞ্চলে কিছুটা স্ফীত এবং উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা। সুতরাং ভূ-কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত স্থানের দূরত্ব সমান নয়। ভূ-কেন্দ্র থেকে দুই মেরুর দূরত্বের তুলনায় ভূ-কেন্দ্র থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দূরত্ব বেশি বলে মেরু অঞ্চলের তুলনায় নিরক্ষীয় অঞ্চলে কোনও বস্তুর ওজন কম হয়।
(ii) **ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতার পরিবর্তন** : ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যায় বস্তুর ওজন তত কম হয়।
(iii) **পৃথিবীর অভ্যন্তরে গভীরতার পরিবর্তন** : ভূপৃষ্ঠ থেকে যত নীচে নামা যায় কোনও বস্তুর ওজন তত কম হয়। পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজন শূন্য হয়।

(৩) কোনও বস্তুকে চাঁদে কিংবা সূর্যপৃষ্ঠে নিয়ে গেলে এর ভর এবং ওজনের কী পরিবর্তন হবে ?
কোনও বস্তুকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রপৃষ্ঠে নিয়ে গেলে বস্তুটির ওজন কমে এক-ষষ্ঠাংশ হয় এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সূর্যপৃষ্ঠে নিয়ে গেলে বস্তুটির ওজন বেড়ে ২৭ গুণ হয়।

(৪) বায়ুতে একটি ম্যাগনেশিয়াম তারকে পোড়ালে এর ওজন বেড়ে যায়। এই ঘটনা কি ভরের নিত্যতা সূত্রের পরিপন্থী ?
বায়ুতে ম্যাগনেশিয়ামের দহনের সময় ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে

অক্সিজেনের এবং নাইট্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটে। এই বিক্রিয়ার ফলে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এবং সামান্য পরিমাণ ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইড উৎপন্ন হয়। ম্যাগনেশিয়াম ভস্মে ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে অক্সিজেন এবং সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন যুক্ত থাকে বলে ম্যাগনেশিয়াম ভস্মের ওজন ম্যাগনেশিয়ামের চেয়ে বেশি হয়। সুতরাং, ম্যাগনেশিয়ামের ওজন বৃদ্ধি ভরের নিত্যতা সূত্রের পরিপন্থী নয়।

(৫) তড়িৎশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে, তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তিতে, আলোকশক্তি থেকে তড়িৎশক্তিতে এবং তড়িৎশক্তি থেকে আলোকশক্তিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত দাও।

(i) **তড়িৎশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি :** বৈদ্যুতিক পাখার আর্মেচারের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে পাখা ঘুরতে থাকে। এ-ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(ii) **তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি :** বাষ্পচালিত এঞ্জিনে কয়লার দহনে যে-তাপ উৎপন্ন হয় সেই তাপশক্তিই রেলগাড়ি বা জাহাজ চালানোর যান্ত্রিক শক্তি জোগায়। মোটরগাড়ির দহন-কক্ষে পেট্রোল বা ডিজেলের দহনে যে-তাপশক্তি উৎপন্ন হয় সে-তাপশক্তিই যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে মোটরগাড়ি চালায়।

(iii) **আলোকশক্তি থেকে তড়িৎশক্তি :** আলোক-বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে আলোক-বৈদ্যুতিক কোষ (photoelectric cell) তৈরি করা হয়েছে। এরূপ কোষে আলো পড়লে তাতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। এটি আলোকশক্তির তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত।

(iv) **তড়িৎশক্তি থেকে আলোকশক্তি :** বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠালে ফিলামেন্টটি ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং আলো বিকিরণ করে। এটি বৈদ্যুতিক শক্তির আলোকশক্তিতে রূপান্তরের দৃষ্টান্ত।

(৬) সূর্যের বিপুল শক্তির উৎস কী ?

সূর্যের বিপুল শক্তির উৎস হল পারমাণবিক শক্তি। সূর্যে তাপ-নিউক্লীয় বিক্রিয়ায় (thermonuclear) হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়াম উৎপন্ন হয়। এই সময় কিছু পরিমাণ ভরের শক্তিতে রূপান্তরের ফলে সূর্যে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।

(৭) কয়লার দহনের সময় এবং একটি তড়িৎকোষ যখন কোনও বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠায় তখন কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় ?

কয়লার দহনের সময় কয়লায় সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তি এবং আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। একটি তড়িৎ-কোষ যখন কোনও বর্তনীর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠায় তখন তড়িৎকোষে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(৮) নীচের ক্ষেত্রগুলিতে কোন শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয় :

(i) গোবরগ্যাস থেকে যখন আলো জ্বালানো হয়।

(ii) বিদ্যুতের সাহায্যে যখন গমকল চালানো হয়।

(iii) যখন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

(i) গোবর গ্যাস থেকে যখন আলো জ্বালানো হয় তখন গোবর গ্যাসে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তি এবং আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(ii) যখন বিদ্যুতের সাহায্যে গমকল চালানো হয় তখন তড়িৎশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(iii) যখন জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তখন জলে সঞ্চিত যান্ত্রিক শক্তির প্রভাবে জল-টারবাইন ঘোরে। কাজেই, এ-ক্ষেত্রে যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

(৯) পৃথিবীর তরল এবং গ্যাসীয় জীবাশ্ম জ্বালানিভাণ্ডার (খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি) আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নিঃশেষ হওয়ার দিকে। এই শক্তি সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য কয়েকটি বিকল্প জ্বালানির নাম করো, যা থেকে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান সম্ভবপর হতে পারে।

জীবাশ্ম জ্বালানিভাণ্ডার নিঃশেষিত হলে উদ্ভিদ-জগৎ থেকে অ্যালকোহল, মিথানল, ইথানল ইত্যাদি সংগ্রহ করে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এদের ব্যবহার করা যেতে পারে। জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে ওই হাইড্রোজেন গ্যাসকেও ভবিষ্যতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন। এ ছাড়া, বিভিন্ন বায়োগ্যাস, ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম জাতীয় নিউক্লীয় জ্বালানি ইত্যাদিও ভবিষ্যৎ শক্তি-উৎস হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

(১০) হালকা বস্তুকে পৃথিবী যে-বলে আকর্ষণ করে ভারী বস্তুকে পৃথিবী তার চেয়ে বেশি বলে আকর্ষণ করে। তা সত্ত্বেও অবাধে পতনশীল সমস্ত বস্তুই একই ত্বরণ নিয়ে নামে কেন ?

মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে, কোনও বস্তুর ওপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষ বল (পৃথিবী-কর্তৃক প্রযুক্ত আকর্ষণ-বল) বস্তুটির ভরের সমানুপাতিক। অর্থাৎ, m ভরবিশিষ্ট বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ F হলে

$F \propto m$

বা $\frac{F}{M} =$ ধ্রুবক

কিন্তু নিউটনের সূত্রানুসারে, $(\frac{F}{m})$ অনুপাতটিই আলোচ্য বস্তুটির অভিকর্ষজ ত্বরণ। স্পষ্টতই, এই ত্বরণ ভর-নিরপেক্ষ।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ এস.আই.একক

মেট্রিক পদ্ধতির আধুনিক রূপ হল এস. আই. পদ্ধতি। মেট্রিক পদ্ধতির আধুনিক নামকরণ করা হয় 1960 সালে। এই নাম হল 'ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব ইউনিট্স' বা সংক্ষেপে 'এস. আই.'। এস. আই. পদ্ধতিতে সাতটি মূল একক হল : দৈর্ঘ্য : **মিটার** (m); সময় : **সেকেন্ড** (s); তড়িৎ-প্রবাহ : **অ্যাম্পিয়ার** (A); দীপনশক্তি : **ক্যান্ডেলা** (cd); উষ্ণতা : **কেলভিন** (K); ভর : **কিলোগ্রাম** (Kg.); দ্রব্যের পরিমাণ : **মোল** (mol)। এর মধ্যে কয়েকটি এককের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল :

মিটার : 1 সেকেন্ডের 299, 792, 458 ভাগের এক ভাগ সময়ে আলো শূন্য মাধ্যমে যতটা পথ অতিক্রম করে, সেই পথের দৈর্ঘ্যই হল 1 **মিটার**।

সেকেন্ড : সিজিয়াম-133 পরমাণুর একটি নির্দিষ্ট অবস্থান্তরের সময়ে যে-বিকিরণ হয়, তার 9, 192, 631, 770টি পূর্ণ তরঙ্গের সময়কালই হল 1 **সেকেন্ড**। **এই সময়ে যে-ক'টি তরঙ্গ সম্পূর্ণ হয়, তাকে বলা হয় কম্পাঙ্ক। কম্পাঙ্কের একক হল হার্ৎস** (H_z)।

ভর : প্যারিসের কাছাকাছি 'ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো অব ওয়েট্স অ্যান্ড মেসার্স'-এ রাখা প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম সংকর ধাতুর তৈরি একটি সিলিন্ডার বা চোঙই হল ভরের প্রামাণ্য একক **কিলোগ্রাম**। আমেরিকার 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস, অ্যান্ড টেকনোলজি'-তে রাখা এই চোঙের একটি নলকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভরের প্রামাণ্য একক হিসেবে ধরা হয়।

ভূগোল

প্রতি বছর রাজ্যের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। ভূগোল কীভাবে পড়বে, কীরকম উত্তর লিখবে, আদর্শ উত্তর কেমন হওয়া উচিত, কীভাবে তৈরি হলে ভাল ফল করা যায় ইত্যাদি সম্পর্কে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই তেমন অবহিত নয়। ভয়-ভীতি ও উদ্বেগ নিয়েই পরীক্ষা দেয়। অধিকাংশ পরীক্ষার্থীই বিষয়টিতে আশানুরূপ ফল করতে পারে না। কোনওরকমে পাশ করে তারা। আবার অনেকে করেও না। কিন্তু কেন ? বিষয়টির প্রতি কেন এত অনীহা ? মনে হয়, এর একটা বড় কারণ হল উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও বিষয়টির প্রতি আগ্রহের অভাব। আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মনে রেখে এখানে আলোচনা করা হল কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য। পাশাপাশি, রইল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অবজেক্টিভ প্রশ্ন ও তার উত্তর।

কালিদাস চন্দ

শিক্ষক, দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন

মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে-ক'টি বিষয়ে বেশি নম্বর তোলা যায় ভূগোল এর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ভূগোলের ভীতিও কম নয়। আবার অবহেলাও আছে। বিষয়টিতে তেমন সময় দেয় না তারা। নিয়ম করে চর্চাও করে না। ফলে ভূগোল ভাল লাগা দূরে থাকুক, বরং বিষয়টির প্রতি গড়ে ওঠে অনীহা। পরীক্ষার আগে তাই হিমশিম খেতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। বুঝে উঠতে পারে না কী করবে, কীভাবে পড়বে। বিশাল সিলেবাস ! কী করে সামাল দেবে, রীতিমত সমস্যায় পড়ে যায় তারা ! ভূগোল তোমরা পড়ছ ক্লাস থ্রি থেকে। ভূগোল কী, কেন আমরা ভূগোল পড়ি, এসব শিক্ষার্থীদের অজানা নয়। তা হলে সংশয় কেন ? আসল কথা ভূগোলকে ভালবাসতে হবে। জন্ম থেকেই তো আমাদের ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্ক। জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারে, ভূগোলকে আমাদের জানতেই হয়, বুঝতে হয়। না হলে জীবন চলে না। আসলে আমাদের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে ভূগোল।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভাল করতে হলে প্রতিটি বিষয়েই ভাল করা দরকার। একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী সবক'টি বিষয়েই মোটামুটি নম্বর তোলা দরকার। তবেই তো 'রেজাল্ট' ভাল হবে। দুটি বা তিনটি 'সাবজেক্ট' খুব ভাল করে তৈরি করলে, কিন্তু হয়তো ইতিহাস, ভূগোলে তেমন মনোযোগ দিলে না। এটা ঠিক নয়। ভূগোল হল বিজ্ঞানের জননী। ভূগোলের প্রতিটি স্তরেই আছে কার্য-কারণ সম্পর্ক। ভূগোলকে বলা হয় 'সিন্থেটিক সায়েন্স'। বহু বিষয় সমন্বিত এক আদর্শ বিজ্ঞান। 'ভূ' অর্থাৎ ভূমি ও মানুষ নিয়েই ভূগোল। ভূমিকে কেন্দ্র করেই দাঁড়িয়ে আছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। আর এই ভূমিকে অবলম্বন করেই তো সভ্যতার অগ্রগতি। মাটিকে তো 'মা' বলে সেইজন্যই। তা হলে ভূগোলে ভয় কেন ? একটু ভালবেসে পড়তে পারলেই বিষয়টির প্রতি আগ্রহ আসবে, অনুরাগ জন্মাবে। আকর্ষণ বাড়বে। আমরা আরও মনোযোগী হয়ে উঠব সরস এই বিষয়টির প্রতি।

দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশন-এর ছাত্র অভিজিৎ দাস দু' বছর আগে মাধ্যমিকে ভূগোলে পেয়েছিল ৯৮। বিশ্বাস করা যায় না। 'টোটাল' ছিল ৮১২। ওই বছরই মাধ্যমিকে পঞ্চম স্থানাধিকারী শৈবাল মুখোপাধ্যায় ভূগোলে পেয়েছিল ৯২। আর এবার শুভদীপ বসু ৮৫১ পেয়ে মাধ্যমিকে দ্বিতীয় হয়েছে, সে-খবর তো তোমাদের জানা। ভূগোলে শুভদীপের নম্বর ছিল ৯২। অভিজিৎ, শৈবাল, শুভদীপ, শরিফুল, সুমন, পিনাকী, দেবদীপ, অপরাজিতা, সিঞ্জিতা, শবরী এমন বহু ছাত্রছাত্রীর নাম করা যায়, যারা ভূগোলে খুব ভাল নম্বর পেয়েছে। এ ছাড়া, সাধারণ মানেরও অনেক ছাত্রছাত্রী ভূগোলকে ভালবেসে 'লেটার' পেয়েছে। তোমাদেরও তো ইচ্ছে হয় ভূগোলে ওদের মতো ভাল করতে ?

দিনকয়েক আগে ভূগোলে রেকর্ড নম্বর পাওয়া ছাত্র অভিজিতের সঙ্গে দেখা। কথা বলছিলাম ওর সঙ্গে ভূগোল নিয়েই। কীভাবে তুমি ভূগোলে অত ভাল করলে ? উত্তরই বা করেছ কীভাবে ? ওর কথা থেকে যা জানা গেল তা হল এই :

- বিভিন্ন গ্রুপ থেকে সবক'টি প্রশ্নের ঠিকমতো উত্তর করেছি।
- 'ম্যাপ পয়েন্টিং' আবশ্যিক। ওটা ভাল করে অভ্যেস করেছিলাম।
- ভূগোলের অঙ্কের প্রশ্নটার উত্তর করেছি। আমিও প্রথম-প্রথম অঙ্কটা এড়িয়ে যেতাম। ভাবতাম যদি ভুল হয়ে যায় ! পরে অবশ্য ঠিক করে নিয়েছি।
- ৬ নম্বরের বড় প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্য দিয়ে টানাভাবে রচনার মতো করে লিখিনি। বিভিন্ন প্যারাগ্রাফে ভেঙে-ভেঙে যথাসম্ভব 'টু দ্য পয়েন্ট' উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি।
- উত্তরের সঙ্গে দরকারমতো ছবি ও মানচিত্র এঁকেছি।
- সবচেয়ে বড় কথা, উত্তরপত্রটি যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন করে লিখেছি।

অভিজিৎকে ধন্যবাদ, ঠিকই বলেছে সে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল শৈবালের কথা। শৈবাল এবার উচ্চ মাধ্যমিকে খুব ভাল রেজাল্ট করেছে। আর সবচেয়ে বড় খবর,

'জয়েন্ট এন্ট্রান্স' পরীক্ষায় শৈবাল এবার প্রথম হয়েছে। দারুণ কৃতিত্ব।. শৈবালের পুরনো এক পরীক্ষার খাতার পাতা ওলটাচ্ছিলাম অন্যমনস্কভাবে। শৈবালের হাতের লেখা তত ভাল নয়। তাড়াতাড়ি লিখলে অনেকসময় ওর লেখা পড়াই যায় না। অথচ ঘড়ি ধরে ঠিক দু' ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ভূগোলের একটি সম্পূর্ণ পেপারের উত্তরপত্রটি কী সুন্দর। যেন এক শিল্পকর্ম। দু' চোখ ভরে দেখবার। এক-একটি প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন অনুচ্ছেদে কী পরিচ্ছন্ন করে লেখা। একটি অনুচ্ছেদের পর একটু ছাড় দিয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদ শুরু। পাশে ছবি। আর ছবির 'ডিসপ্লে' কী চমৎকার। একটি ছবি বাঁ দিকে তো, আর একটি ডান দিকে। খুব যে বেশি লেখা তা নয়। একেবারে মাপমতো উত্তর। পরীক্ষক যা-যা চাইছেন সবই আছে তাতে। ওই উত্তরপত্রে শৈবাল পেয়েছিল ৯০-এ ৮৪, অর্থাৎ ৯৩.৩%। কিন্তু কী করে ? ওর মুখ থেকেই সেটা শোনা যাক :

"আমি জানতাম, আমার হাতের লেখা খারাপ। কয়েকমাস ধরে ভীষণভাবে প্র্যাকটিস করেছি। আমিও জানলাম,চেষ্টা করলে পারা যায়।"

দিনকয়েক আগে বিভিন্ন স্কুলের প্রি-টেস্ট পরীক্ষার শেষে কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে পুরনো কিছু খাতাপত্র দেখাচ্ছিলাম। অনির্বাণ প্রশ্ন করল, "সার, এই দুটো খাতায় দেখছি কোনও কিছুর উত্তর লেখা নেই। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের নম্বর দিয়ে শুধুমাত্র অনেক ছবি আঁকা আছে। আর এতে নম্বরও দেওয়া হয়েছে। এ-ব্যাপারে কিছু বলুন না সার।"

বুঝলাম, ওদের আগ্রহ প্রবল। আসলে ভূগোলের পরীক্ষায় শুধু লিখলেই হয় না, ছবিও দিতে হয়। আর ছবি দিতে বললেই তো দেওয়া যায় না। এর জন্য চাই অনুশীলন। অনুশীলন বা প্র্যাকটিস না করলে ভাল করা যায় না। যে খাতা দুটি দেখালাম, ও দুটি হল প্রতীতি বিশ্বাসের। মাধ্যমিকে প্রতীতি ত্রয়োদশ স্থান পেয়েছিল। ভূগোলে খুব ভাল করেছিল। প্রতীতিকে বলেছিলাম, "তোমার পরীক্ষা নেব। তবে কিছু লিখতে হবে না। প্রশ্ন অনুযায়ী শুধু ছবি আঁকবে। ছবির লেবেলিং কিন্তু করা চাই।" দুটি ভাগে পুরো সিলেবাসের ওপর পরীক্ষা নিয়েছিলাম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারী সুন্দরভাবে ছবিগুলো এঁকেছিল প্রতীতি। খাতা দুটোয় একটিতে ৫০-এ ৩৮, অন্যটিতে ৪১। তোমাদেরও এইভাবেই অভ্যাস করতে হবে। চিন দেশের একটা প্রবাদ আছে, একটা ছবি হাজার কথা বলে। কাজেই ভূগোলের উত্তর দিতে হাজার কথা বলার দরকার নেই। একটা ছবিই বিষয়টির হয়ে হাজার কথা বলে দেয়।

এবার ছাত্রদের দেখালাম প্রতীতির আর-একটি খাতা। নম্বর ৯০-এ ৮১। ওদের জানালাম, প্রশ্নটি এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আগের দুটো পরীক্ষার আঁকা ছবিগুলোর প্রয়োগ করা যেতে পারে। ঝরঝরে হাতের লেখা। কালো কালিতে লেখা অক্ষরগুলি সুছাঁদ ও সুচারু। হালকা জল রঙের প্রলেপ ছবির সৌন্দর্যও বাড়িয়ে তুলেছে। এমন উত্তরপত্র দেখে পরীক্ষকের মন তো খুশিতে ভরে উঠবেই। আরও পাঁচজনকে দেখাবেনও তিনি ওই খাতা।

"সার, খাতাগুলোর সবক'টিই দেখছি কালির পেন-এ লেখা। কলমে লিখতে গেলে লেখা বেশ 'স্লো' হয়ে যায় না ?" প্রশ্ন করল শৌভিক।

আমার মতে, খাতায় সবসময় 'ফাউন্টেন পেন'-এ লেখা দরকার। এতে হাতের লেখা খুব ভাল হয়, উত্তরপত্রটিও পরিচ্ছন্ন দেখায়। তোমরা ডটপেন-এ লিখতে অভ্যস্ত। ডটপেনে গড়গড় করে লেখা হয়, তাড়াহুড়ো করে লিখেও ফেলা যায়।

প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় বিচার করতে পারো না। ফাউন্টেন পেনের লেখা একটু ধীর লয়ে চলে। অনেক কিছু ভাবনা থাকলেও লিখে ওঠা যায় না। কালির কলমে লিখলে চিন্তা-ভাবনার একটা সংহত রূপ দেওয়া যায়। প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি সংক্ষেপে, গুছিয়ে লেখা যায়। লেখায় তাই সার অংশটাই বেশি থাকে। উত্তরও হয় 'টু দ্য পয়েন্ট'।

এবার দেবরূপা দাস নামে এক ছাত্রীর একটা খাতা দেখালাম ওদের। দেবরূপা এ-বছর উচ্চ মাধ্যমিকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে। খুবই ভাল রেজাল্ট। মাধ্যমিকে দেবরূপার মোট নম্বর ছিল ৮০৬। ভূগোলে 'লেটার' পেয়েছিল। ফাইনাল নয়, এই বিষয়ের অন্য একটি পরীক্ষায় কালো কালিতে লেখা ওর উত্তরপত্রে ছিল অনেক ছবি ও মানচিত্র। দেখবার মতো খাতা। ছাত্রছাত্রীরা অবাক হয়ে দেখছিল। লাজুক এক ছাত্রী রেশমির প্রশ্ন, "ভাল ছাত্রছাত্রীর কথা আলাদা,

প্রতীতির আঁকা ছবি

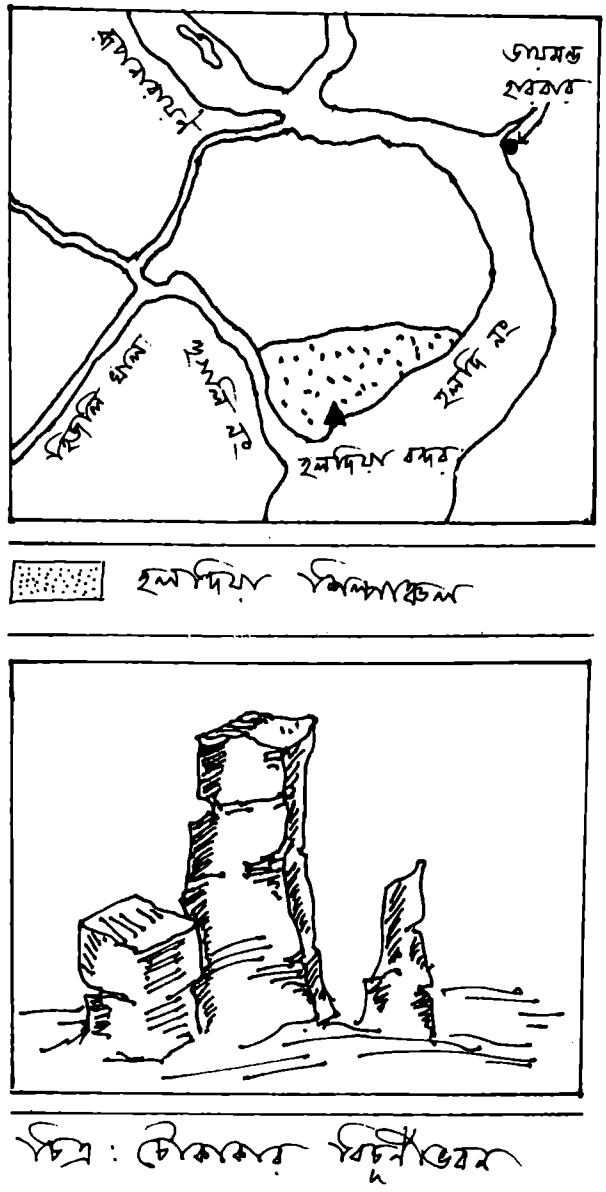

কিন্তু সাধারণ মেরিটের ছেলেমেয়েরাও কি ভূগোলে ভাল করতে পারে ?" খুশি হওয়ার মতো প্রশ্ন। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোবার পরের দিন। সুরেশ নামে আমার এক ছাত্র বাড়িতে এসে হাজির। কেমন রেজাল্ট হয়েছে জিজ্ঞেস করতেই সুরেশ জানাল, "৫৩১ সার। ফার্স্ট ডিভিশন হয়নি।"

"ভূগোলে কত পেয়েছ ?" লেটার পেয়েছে শুনে ওকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ওর কৃতিত্ব ভাল ছেলেদের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। খুবই সাধারণ মানের ছাত্র। কিন্তু বিষয়টি ভালবাসতে পারায় আর চেষ্টা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সুরেশ আজ ভূগোলে লেটার পেয়েছে। সুরেশের মতো এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। সামনেই তো তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা। ফাইনাল পরীক্ষার আগের মহড়া। সব বিষয়েই সম্পূর্ণ সিলেবাসের ওপর পরীক্ষা। অনেক সাবজেক্ট। সে জন্য বিহ্বল হলে চলবে না। ধৈর্য এবং অধ্যবসায় নিয়ে তৈরি করতে হবে। ভূগোলের কথায় আসি। ভূগোলের প্রশ্নের তো একটা ধরন আছে। যেখান থেকে খুশি যেমন-তেমন প্রশ্ন আসতে পারে না। প্রশ্নের একটা কাঠামো নিশ্চয়ই আছে। সেই 'কাঠামো' বা 'স্ট্রাকচার'টা ধরতে পারলে প্রস্তুতির কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায়। আসলে ব্যাপারটা কী জানো ? খেলার আগে যদি মাঠ ভাল করে চিনে নেওয়া যায়, 'বাউন্ডারি লাইন'টা বুঝে নেওয়া যায়, তা হলে খেলতে সুবিধে হয়। তোমাদেরও তেমনই বুঝে নিতে হবে প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন গ্রুপে কোন-কোন অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে,ক'টি করে উত্তর দিতে হয় এবং প্রতিটি প্রশ্নে নম্বর বিভাজনই বা কীরকম ?

আগের বছরগুলির প্রশ্ন বিশ্লেষণ করলে একটা নির্দিষ্ট কাঠামো পাওয়া যাবে। ভূগোলে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য মোট বিভাগ থাকে ৫টি। ক-বিভাগে ম্যাপ পয়েন্টিং-এর প্রশ্নটি আবশ্যিক। খ-বিভাগে নাইন ও টেন-এর প্রাকৃতিক ভূগোল থেকে ৬টির মধ্যে ৩টি প্রশ্নের উত্তর করতে হয়। গ-বিভাগে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও ভারতের আঞ্চলিক ভূগোলের নাইন ও টেনের পাঠ্যাংশ থেকে ৬টি প্রশ্নের মধ্যে ৩টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ঘ-বিভাগে ২টির মধ্যে ১টির উত্তর করতে হয়। এই বিভাগের পাঠ্যাংশ হল ক্লাস টেনের এশিয়া, চিন, জাপান ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার তৈল উৎপাদনকারী দেশসমূহ। আর শেষ বিভাগ ঙ-তে থাকে সিক্স, সেভেন ও এইটের নির্বাচিত পাঠ্যাংশ। ক্লাস সিক্স থেকে পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়ু, সেভেনের নীলনদের অববাহিকা, আর এইটের লন্ডন অববাহিকা, ইউক্রেন অঞ্চল ও যুক্তরাষ্ট্রের হ্রদ অঞ্চল থেকে প্রশ্ন আসে। ২টির মধ্যে ১টির উত্তর করতে হয়।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ঘ-বিভাগে দুটির মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি যাকে এশিয়া থেকে। এশিয়ার ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়ু। অন্য প্রশ্নটি থাকে বিভিন্ন বছর বিভিন্ন বিষয়ে— চিন, জাপান ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া থেকে। কাজেই এই বিভাগ থেকে এশিয়ার ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়ু খুব ভালভাবে আয়ত্ত করা দরকার। আবার ঙ-বিভাগ থেকেও সেরকম পশ্চিমবঙ্গের ওপর একটা প্রশ্ন থাকেই। অন্য প্রশ্নটি থাকে এক-এক বছর এক বা একাধিক বিষয়ের ওপর। নীলনদের অববাহিকা, লন্ডন অববাহিকা, ইউক্রেন ও হ্রদ অঞ্চল থেকে প্রশ্ন আসে। কাজেই এই বিভাগ থেকে পশ্চিমবঙ্গ অধ্যায়টি খুব ভাল করে পড়া দরকার। তা ছাড়া এটি তো একেবারে আমাদের নিজেদের রাজ্যের বিষয়। মনে রাখা অবশ্যই দরকার।

জ্ঞানের পরিধি বিরাট। সেজন্য পড়াশোনারও শেষ নেই। কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির পরিধি প্রয়োজনে অনেক কমিয়ে আনা যায়। অন্যান্য সাবজেক্ট আছে, কেবল ভূগোল নিয়ে থাকলেই তো চলবে না। তা হলে ফাইনাল পরীক্ষায় ভূগোলের জন্য আমরা কীভাবে তৈরি হব ? কী করেই বা পাব ভাল নম্বর ?

ক বিভাগের ম্যাপ পয়েন্টিংটা ভাল করে শিখতেই হবে। কারণ ওটি আবশ্যিক। না হলে ১০টি নম্বর বাদ চলে যাবে। **খ** বিভাগে ২ নম্বর প্রশ্নটি আসে অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা ও সময়ের অঙ্ক বিষয়ে। এই প্রশ্নে নম্বর ওঠে। কাজেই এটি ভাল করে রপ্ত করা দরকার। এই বিভাগে দশম শ্রেণীর বায়ুমণ্ডল অধ্যায় থেকে একটি প্রশ্ন প্রতি বছরই আসে। অতএব বায়ুমণ্ডল অধ্যায়টি ভাল করে শিখতে হবে। **খ** বিভাগের ২টি প্রশ্নের উত্তর তো হয়ে গেল। বাকি রইল ১টি। ৭ নম্বর প্রশ্নটি হল সংক্ষিপ্ত টীকার। ৭টির মধ্যে ৪টি সম্পর্কে টীকা লিখতে হয়। আরও দু-একটি প্রশ্নের উত্তর তৈরি করে রাখা যেতে পারে। শিলা, পর্বত-মালভূমি-সমভূমি এবং আবহবিকার অধ্যায়গুলি ভাল করে শিখে নেওয়া যেতে পারে।

গ বিভাগে ১০ নম্বর প্রশ্নটি থাকে কৃষির ওপর। প্রতি বছরই এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে। তাই এই অধ্যায়ের মাধ্যমিকের বিভিন্ন বছরের প্রশ্নগুলি একটু দেখে নাও। অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। 'খনিজ ও বিদ্যুৎ' অধ্যায় থেকে সাধারণত একটি প্রশ্ন আসে। কাজেই কয়লা, খনিজ তেল, লৌহআকরিক ইত্যাদি ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে ভাল করে দেখে রাখো। লক্ষ করবে, বেশিরভাগ বছরে শিল্পের ওপর একটি প্রশ্ন আসে। ভারতের কার্পাসবস্ত্র, লৌহ-ইস্পাত শিল্প ইত্যাদি একটু খুঁটিয়ে পড়ে নাও। তিনটি প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল। এতেও যদি মন না ভরে তা হলে 'ভারতের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অঞ্চল' অধ্যায়টি দেখে রাখো। প্রতি বছর এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসে। এই অধ্যায়ের গুজরাত, ছোটনাগপুর, হলদিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ভাল করে তৈরি করে রাখতে পারো।

এবার আসা যাক **ঘ** ও **ঙ** বিভাগে। **ঘ** বিভাগে এশিয়ার ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়ু ভাল করে খুঁটিয়ে পড়ে রাখো। এশিয়ার ওপর মাধ্যমিকের বিভিন্ন বছরের প্রশ্নগুলি ভাল করে তৈরি করে ফ্যালো। তবে হ্যাঁ, এশিয়ার কোনও কিছু বাদ দেওয়া চলবে না। এ-বছরের প্রশ্নের উত্তরেও ভাল করে চোখ বুলিয়ে রাখা ভাল। **ঙ** বিভাগে পশ্চিমবঙ্গের ওপর একটি প্রশ্ন থাকেই। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের সবকিছু ভাল করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে নাও। ভূ প্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু এবং পার্বত্য জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, সব কিছু।

এবার প্রশ্নের নম্বর সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া যাক। ভূগোলে প্রতি প্রশ্নের মান ১০। **ক** বিভাগে ১ নং প্রশ্নে ভারতের রেখা মানচিত্রে ১০টি পয়েন্টিং-এ থাকে ১০ নম্বর। **খ** বিভাগে ৭ নং প্রশ্নে ৪টি সংক্ষিপ্ত টীকায় থাকে ২½×৪=১০। এ ছাড়া সব বিভাগের সব প্রশ্নের নম্বর তিনটি অংশে বিভক্ত— ৩, ৬, ও ১ অর্থাৎ ৩+৬+১=১০। তা হলে ভূগোলে তোমাদের উত্তর করতে হচ্ছে **ক, খ, গ, ঘ** ও **ঙ** বিভাগ থেকে যথাক্রমে ১, ৩, ৩, ১ ও ১টি অর্থাৎ, মোট ৯টি প্রশ্নের। লিখিত পরীক্ষার মোট নম্বর ১০×৯=৯০। আর, স্কুলের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের জন্য থাকে ১০ নম্বর। এই হল ভূগোলের মোট ১০০ নম্বর।

আলোচনা চলছিল ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভূগোল নিয়েই। লক্ষ করলাম, মৌমিতা গোমড়া মুখে বসে আছে। "তোমার প্রিটেস্ট পরীক্ষা কেমন হয়েছে" জিজ্ঞেস করতেই মৌমিতা খানিকটা দ্বিধার

সঙ্গেই জানাল, "হয়েছে সার। কিন্তু ভাল হয়নি।"
"কেন ?"
"সব প্রশ্নের উত্তর করে উঠতে পারিনি। সময় পেলাম না।"
মৌমিতার কথার সূত্র ধরেই বলি, একটা কথা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে, সব প্রশ্নের উত্তর করা চাই। লক্ষ রাখতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের প্রতিটি অংশের উত্তর যেন ঠিকমতো দেওয়া হয়। কিছু বাদ দিলে চলবে না। গোড়ার দিকে বেশ সময় নিয়ে অনেক তথ্য দিয়ে দু-তিনটে প্রশ্নের উত্তর হয়তো খুব ভাল করে লিখলে। কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকাতেই চমকে উঠলে। আর বিশেষ সময় নেই। এখনও বেশ কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। তাড়াহুড়ো করে যা হোক কিছু উত্তর করলে। এর ফল যা হওয়ার তাই হল। প্রথম দিকের দু-তিনটে প্রশ্নে খুব ভাল নম্বর পেলে হয়তো। আর বাকি উত্তরগুলিতে যা পেলে তা অতি সামান্যই। সাকুল্যে নম্বর দাঁড়াল হয়তো ৪০ বা ৪৫। এভাবে উত্তর করলে চলবে না। সমান 'ওয়েটেজ' বা গুরুত্ব দিয়ে সময় ধরে সবক'টিরই উত্তর করতে হবে। একটি ১০ নম্বরের প্রশ্নে কিছুতেই ২০ মিনিটের বেশি সময় নেওয়া ঠিক নয়। আর খেয়াল রাখতে হবে, সবক'টি প্রশ্নের সব অংশের উত্তর করলে কি না। পরীক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি-প্রকরণ সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। এবার আমরা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে আলোচনা করি। "আচ্ছা সার, ম্যাপ পয়েন্টিং কীভাবে করব ? ম্যাপ মনে রাখার কি সহজতম কোনও পদ্ধতি আছে ?" তন্ময়ের এই প্রশ্নের উত্তরে জানাই, নিশ্চয়ই আছে। ভারতের সীমারেখা মানচিত্রে কোন-কোন বিষয়ে পয়েন্টিং করতে দেয় আগে তা ভাল করে বুঝে নিতে হবে। বই খুললেই তো তোমরা মাধ্যমিকের প্রশ্ন পাবে। '৮৬ থেকে '৯৬ এই ১১ বছরের প্রশ্ন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পয়েন্টিংয়ের বিষয়গুলি হল : ক) পাহাড়-পর্বত ; খ) নদী-হ্রদ উপসাগর ; গ) প্রাকৃতিক কোনও অঞ্চল বা উপঅঞ্চল ; ঘ) একটি ফসল উৎপাদন অঞ্চল ; ঙ) কোনও খনিজ উত্তোলক কেন্দ্র, বিদ্যুৎকেন্দ্র ; চ) শিল্পাঞ্চল ও শিল্পকেন্দ্র ; ছ) শহর ও বন্দর। কাজেই এই বিষয়গুলি একটু ভাল করে দেখে অভ্যাস করা দরকার। তবে অভ্যাসটা অবশ্যই নিয়ম করে করা চাই। প্রতিদিন একটি করে ম্যাপ অভ্যাস করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তবে হ্যাঁ, প্র্যাকটিস করা চাই মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোলের যে ম্যাপ দেয় সেইরকম ম্যাপে। মাধ্যমিকের ম্যাপ নিজেদের স্কুল থেকে অনায়াসেই সংগ্রহ করতে পারে। এবার ওই ম্যাপ জেরক্স করে নাও অনেক কপি। লক্ষ করলে দেখবে ওই মানচিত্রে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলি টানা আছে। এই মানচিত্রে অভ্যাস করলে তোমাদের অনেক সুবিধে। কোন খোপে বা কোন ঘরের কোথায় কোন জায়গাটি আছে তা বেশ আয়ত্ত হয়ে যাবে। এইভাবে অনুশীলন করতে হবে।
মানচিত্রে কী-কী পয়েন্টিং করবে, তার একটা তালিকা দেওয়া হল

প্রশ্ন : প্রদত্ত ভারতের সীমারেখা মানচিত্রে নিম্নলিখিতগুলি উপযুক্ত প্রতীক ও নামসহ চিহ্নিত করো।

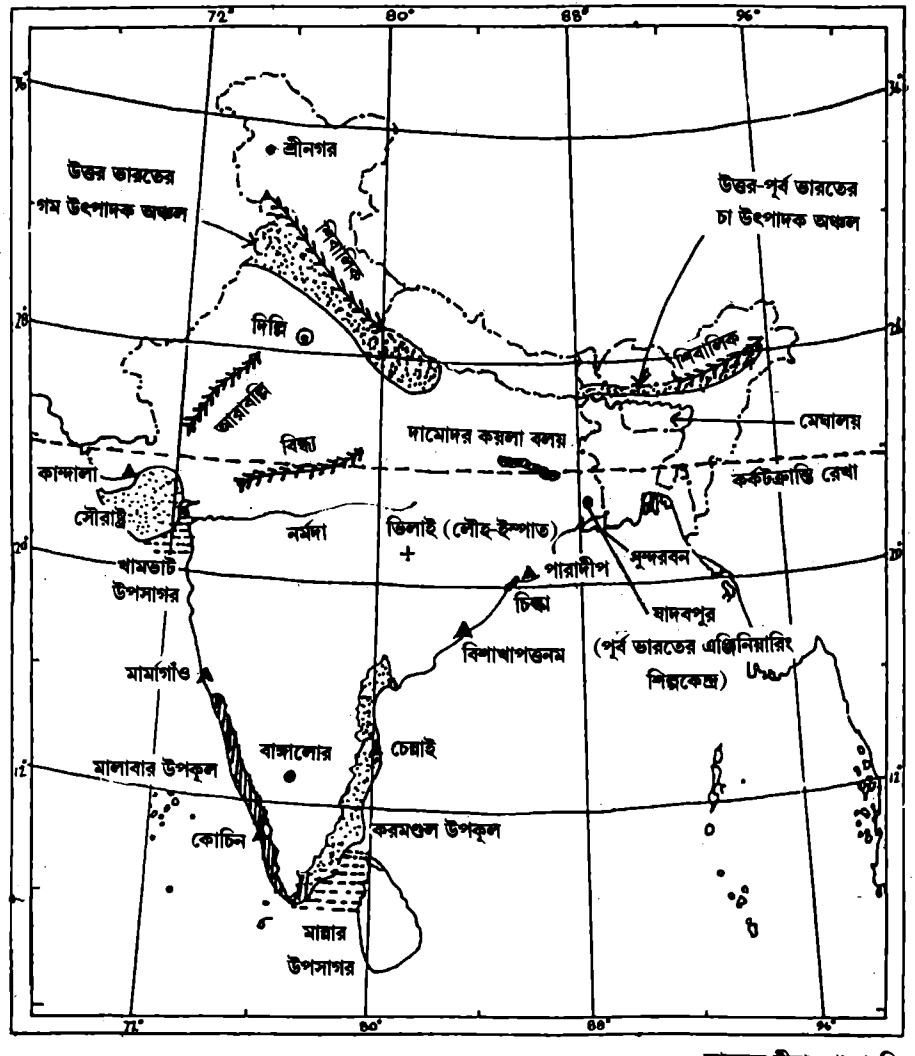

ক) বিন্ধ্য, আরাবল্লি, শিবালিক।
খ) নর্মদা, চিল্কা, খামভাট উপসাগর, মান্নার উপসাগর।
গ) সৌরাষ্ট্র, মেঘালয়, মালাবার উপকূল, করমণ্ডল উপকূল, কর্কটক্রান্তি রেখা, সুন্দরবন।
ঘ) উত্তর ভারতের গম উৎপাদক অঞ্চল, উত্তর-পূর্ব ভারতের চা উৎপাদক অঞ্চল।
ঙ) একটি কয়লা বলয়।
চ) পূর্ব ভারতের একটি এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্র, একটি লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র।
ছ) দিল্লি, শ্রীনগর, বাঙ্গালোর, পারাদীপ, বিশাখাপত্তনম, চেন্নাই, কোচিন, মার্মাগাঁও, কান্দালা।

ভারতের সীমারেখা মানচিত্র

তোমাদের সুবিধের জন্য।
ক) বিন্ধ্য, সাতপুরা, পশ্চিমঘাট, নীলগিরি, দোদাবেতা, কারাকোরাম, K2 শৃঙ্গ, গারো শিবালিক।
খ) গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা, তাপী, লুনী, সবরমতী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, মহানদী, চিল্কা, কচ্ছের রণ, পক প্রণালী, কচ্ছ উপসাগর, খামভাট উপসাগর, মান্নার উপসাগর।
গ) সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াওয়াড়), দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, মেঘালয়, থর মরুভূমি, কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল, কোঙ্কন উপকূল, মালাবার উপকূল, করমণ্ডল উপকূল, কর্কটক্রান্তি রেখা।
ঘ) কৃষিজ ফসল উৎপাদক অঞ্চল— ধান, গম, মিলেট, ইক্ষু, চা, পাট, তুলা।
ঙ) একটি কয়লাখনি বা কয়লা বলয়, অভ্রখনি ও অভ্রবলয়, আকরিক লৌহখনি, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের খনিজ তৈল কেন্দ্র, উত্তর ও পূর্ব ভারতের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।
চ) একটি এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পকেন্দ্র, লৌহ-ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র, পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পকেন্দ্র, ছোটনাগপুর শিল্পাঞ্চল।
ছ) দিল্লি, আমেদাবাদ, চণ্ডীগড়, শ্রীনগর, পোর্টব্লেয়ার, হলদিয়া, বিশাখাপত্তনম, চেন্নাই, কোচিন, মার্মাগাঁও, মুম্বই, কান্দালা।
ভারতের সীমারেখা মানচিত্রে কয়েকটি পয়েন্টিং দেখানো হল। ভাল করে দেখে নাও। পরের সংখ্যাগুলোতে আরও কয়েকটি ম্যাপ দেখিয়ে দেব, ইচ্ছে রইল।

অবজেক্টিভ প্রশ্ন

খ-বিভাগ (প্রাকৃতিক ভূগোল)

(১) পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি কী রূপ ? ('90)
● অভিগত গোলাকৃতির।
(২) পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ কত কিলোমিটার ? ('92)
● প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার।
(৩) পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব কত ? ('95)
● প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার।
(৪) সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর একপাক ঘুরতে সঠিক কত সময় লাগে ? ('89)
● ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড।
(৫) কোন দিনকে মহাবিষুব বলে ? ('93)
● ২১ মার্চকে।
(৬) নিশীথ সূর্য কাকে বলে ? ('92)
● গ্রীষ্মকালে রাত্রিবেলা মেরু অঞ্চলের দৃশ্যমান সূর্যকে।
(৭) কোন সমাক্ষরেখাকে মহাবৃত্ত বলে ? ('86)
● বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা বা ০° সমাক্ষরেখাকে।
(৮) নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ কত ? ('86, '88)
● ০°।
(৯) কোন স্থান ও তার প্রতিপাদস্থানের মধ্যে সময়ের পার্থক্য কত ? ('89)
● ১২ ঘণ্টা।
(১০) ক্রনোমিটার কী ? ('91)
● গ্রিনিচ সময় নির্দেশকারী ঘড়ি।
(১১) উত্তর গোলার্ধের কোন স্থানে ধ্রুবতারার উন্নতিকোণ 90° ? ('94)
● উত্তর মেরু বা সুমেরু বিন্দুতে বা 90° উত্তর অক্ষাংশে।
(১২) কর্কটক্রান্তিরেখা ও কুমেরুবৃত্তের অক্ষাংশ কত ? ('96)
● ২৩½° উঃ এবং ৬৬½° দঃ।
(১৩) আগ্নেয়শিলা থেকে রূপান্তরিত একটি শিলার নাম করো। ('96)
● গ্রানাইট থেকে নিস।
(১৪) কোন শিলায় জীবাশ্ম দেখা যায় ? ('94)
● পাললিক শিলায়।
(১৫) কোয়ার্টজাইট কোন শিলার পরিবর্তিত রূপ ? ('88)
● বেলেপাথরের।
(১৬) যে-কোনও একটি আগ্নেয় পর্বতের নাম করো। ('87)
● ভিসুভিয়াস।
(১৭) একটি স্তূপ পর্বতের উদাহরণ দাও। ('90)
● সাতপুরা পর্বত।
(১৮) টেথিস সাগরের অবস্থান কোথায় ছিল ? ('86)
● এখন যেখানে হিমালয় পর্বত, সেখানে।
(১৯) একটি লাভাগঠিত মালভূমির নাম করো। ('95)
● ডেকান ট্র্যাপ।
(২০) পামির মালভূমিকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয় কেন ? ('87)
● সর্বোচ্চ মালভূমি।
(২১) ভারতের সর্ববৃহৎ সঞ্চয়জাত সমভূমি কোনটি ? ('93)
● সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-সমভূমি।
(২২) পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ সমভূমির নাম করো। ('89)
● গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার বদ্বীপ
(২৩) সিসমোগ্রাফের কাজ কী ? ('91)
● ভূমিকম্পের উৎসস্থল ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করা।
(২৪) রিখটার স্কেল কী ? ('89)
● ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্ণায়ক স্কেল।
(২৫) ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কাকে বলে ? ('92, '94)
● ভূমিকম্পের কেন্দ্রের ঠিক মাথার উপরে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত স্থানটিকে।
(২৬) কীরূপ জলবায়ু অঞ্চলে যান্ত্রিক আবহবিকার সর্বাধিক কার্যকর ? ('88)
● উষ্ণমরু মরু অঞ্চল ও শীতল পার্বত্য অঞ্চলে।
(২৭) উপনদী কাকে বলে ? ('94)
● নদী অববাহিকার ছোট-ছোট নদী যারা প্রধান নদীতে এসে মিলিত হয়।
(২৮) গঙ্গা নদীর পার্বত্য প্রবাহ কতদূর বিস্তৃত ? ('87)
● হরিদ্বার পর্যন্ত।
(২৯) নদী উপত্যকা ও হিমবাহ উপত্যকার আকৃতিগত পার্থক্য নিরূপণ করো। ('91)
● নদী উপত্যকা ইংরেজি "I" ও "V" আকৃতির এবং হিমবাহ উপত্যকা ইংরেজি "U" আকৃতির।
(৩০) বালিয়াড়ি কাকে বলে ? ('96)
● মরুভূমি ও সমুদ্রোপকূলের বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে অবস্থিত উঁচু ও দীর্ঘ বালির স্তূপকে।
(৩১) নদীর গতিপথের কোন অংশে সঞ্চয়কার্য সর্বাধিক ? ('90)
● নিম্ন প্রবাহে বা বদ্বীপ প্রবাহে।
(৩২) হিমরেখা কাকে বলে ? ('86, '92, '95)
● পর্বতের যে কাল্পনিক রেখার নীচে বরফ আর গলে না।
(৩৩) হিমশৈল কাকে বলে ? ('96)
● হিমবাহজাত ভাসমান বরফের স্তূপকে।
(৩৪) বায়ুর চাপ কোন যন্ত্রের সাহায্যে মাপা হয় ? ('86, '89)
● ব্যারোমিটার।
(৩৫) সমচাপ রেখা কাকে বলে ? ('93)
● সমুদ্রপৃষ্ঠের চাপে পরিবর্তিত করে বছরের কোনও নির্দিষ্ট সময়ে ভূপৃষ্ঠের সমচাপ বিশিষ্ট স্থানগুলির সংযোগকারী কাল্পনিক রেখাকে বলে সমচাপ রেখা।
(৩৬) ভূপৃষ্ঠে ক'টি চাপ বলয় আছে ? ('87)
● সাতটি। ৪টি উচ্চচাপ বলয় ও ৩টি নিম্নচাপ বলয়।
(৩৭) নিয়তবায়ু কাকে বলে ? ('96)
● সারা বছর নিয়মিতভাবে একটি নির্দিষ্ট দিক থেকে আর-একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত বায়ুকে।
(৩৮) একটি সাময়িক বায়ুপ্রবাহের উদাহরণ দাও। ('90)
● সমুদ্রবায়ু বা স্থলবায়ু বা মৌসুমি বায়ু।
(৩৯) সমুদ্র উপকূলে দিবাভাগে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তার নাম কী ? ('96)
● সমুদ্রবায়ু।

''ফুটে
উঠুক শুধু
আমার
রূপ।
আমার
মেকআপ নয়।'
L A K M É
U L T R A
LAKMÉ
ULTRASHEER
NATURAL MAKE-UP
LAKMÉ
ULTRASHEER
NATURAL MAKE-UP
BEIGE
আল্ট্রা শীয়ার ফেস মেক-আপ। যা মেক-আপ সম্বন্ধে আমার ধারণাই পাল্টে দিয়েছে। এই মৃদু-হাল্কা ন্যাচারাল মেক-আপ আমার ত্বকে এনে দেয় এক মোলায়েম ম্যাট ফিনিশ। এর অনন্য তেলচিটচিটেরহিত ফরমুলা ত্বকের রন্ধ্র খুলে দেয় যাতে আমার ত্বক স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নেয়।
আল্ট্রা শীয়ার-এর বিশেষ উপাদান ডি-প্যান্থেনল আমার ত্বকে সুরক্ষা যোগায় আর ময়েশ্চারাইজার একে নরম ও মোলায়েম রেখে দেয়। এ এমন এক স্বাভাবিক মেক-আপ, যাতে আমি সারাদিন বোধ করি এক অনাবিল স্বাচ্ছন্দ। আমার মধ্যে ফুটে ওঠে চনমনে সতেজতা আর জৌলুস-যে রহস্য আমি ছাড়া আর কেউ জানেনা। এবার আপনিও জানুন, একটু আল্ট্রা শীয়ার লাগিয়ে নিজেকে করে তুলুন রঙে-রূপে লাবণ্যময়ী – ন্যাচারালি।
LAKMÉ
ULTRASHEER
NATURAL MAKE-UP
Ambience/LU/20/Ben

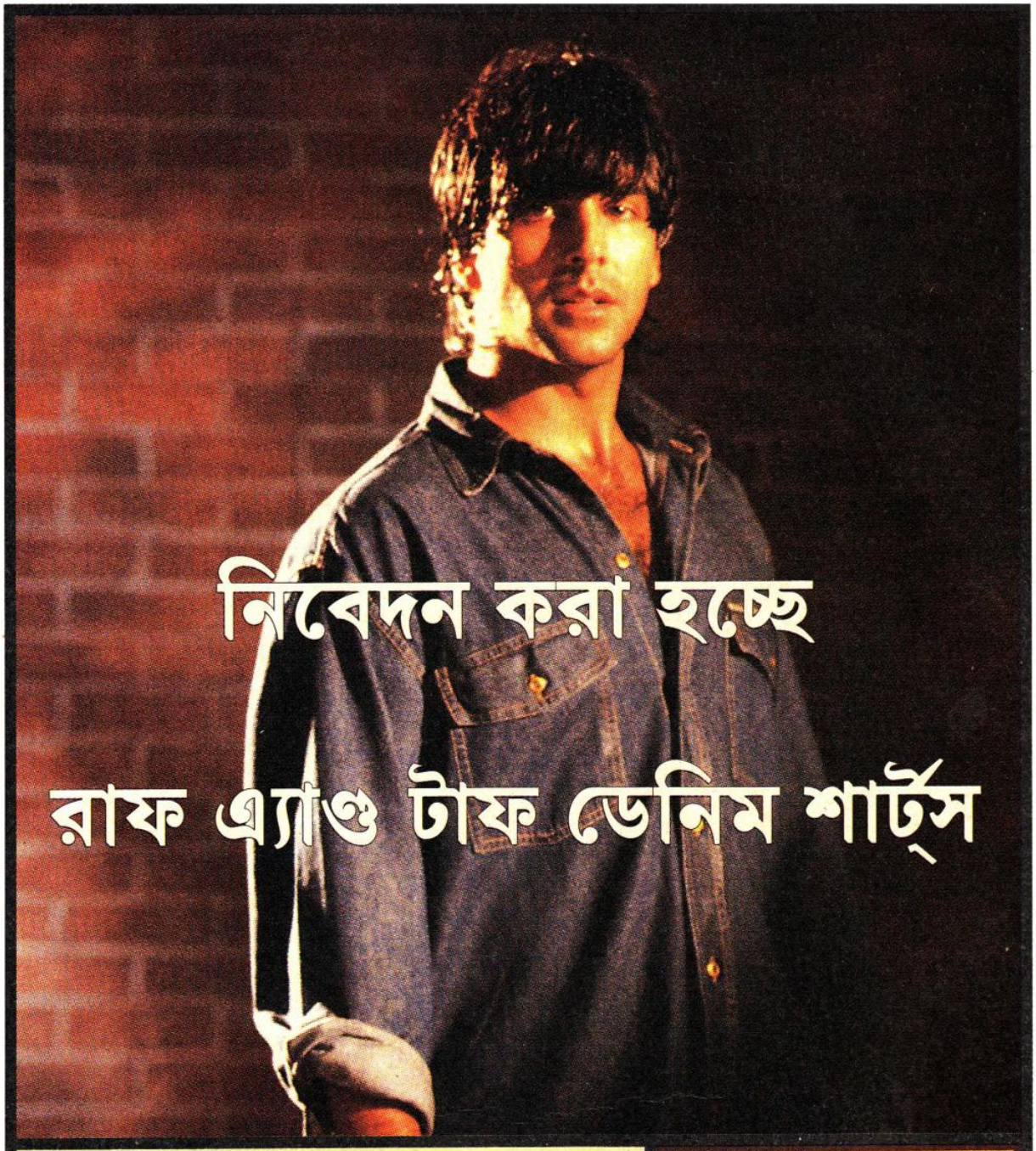

রাফ এ্যাণ্ড টাফ জিন্সের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এসে গেল ভারতের সর্বপ্রথম সেলাই'এর-জন্যে-রেডি শার্ট্স — রাফ এ্যাণ্ড টাফ। সাত আউন্সের আসল ডেনিম, সুপারস্মার্ট বোতাম, তিন-তিনটে স্টাইলিশ লেবেল। যেটাকে আপনার দর্জি, আপনার পছন্দসই ফ্যাশানে সাজিয়ে দেবে। আর আপনি হয়ে উঠবেন পাক্কা রাফ এ্যাণ্ড টাফ।

RUF AND TUF™

A QUALITY PRODUCT FROM ARVIND MILLS

সেলাই'এর-জন্যে-রেডি ডেনিম শার্ট্স

Trikaya Grey AML.4.96. BEN.

খেলার খবর

রণতুঙ্গা পরিবার

অর্জুন রণতুঙ্গার ব্যক্তিগত জীবন কীরকম ? প্রকৃতপক্ষে তিনি খুব নম্র ও বাস্তববাদী স্বভাবের মানুষ। কলম্বো শহরের ভিড় ও হইচই তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। তাই নুগিগোডা শহরতলির শান্ত পরিবেশে বাড়ি করেছেন। ক্রিকেটার রণতুঙ্গার কথা বাদ দিলেও ব্যক্তি হিসেবেও তিনি অনেক বড়। একদিনের ক্রিকেটের 'মানব বোমা' সনৎ জয়সূর্যকে নিজের বাড়িতে রেখে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছিলেন তিনিই।

অর্জুনের বাবা রেনি রণতুঙ্গা বর্তমানে শ্রীলঙ্কা সরকারের একজন উপ-মন্ত্রী বা ডেপুটি মিনিস্টার। শুধু বাবাই নন, রণতুঙ্গা পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। অর্জুন, বড় ভাই ধাম্মিক ও ছোট ভাই সঞ্জীব—তিনজনই টেস্টে শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলেছেন। আর এক ভাই নিশান্ত একদিনের ক্রিকেটে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রসন্ন রণতুঙ্গাও কম যান না। তিনি বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনীতিতে এসেছেন। ধাম্মিক এখন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ডের একজন প্রধান কর্মকর্তা। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সদ্য-সমাপ্ত টেস্টে সঞ্জীব জাতীয় দলে ফিরে এসেছেন।

রণতুঙ্গার কাছে রোজই হাজার-হাজার 'ফ্যান মেল' পৌঁছয়। কলকাতা থেকে পাওয়া চিঠিপত্রের সংখ্যাটাও খুব কম নয়। তিনি যতটা সম্ভব অনুরাগীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে চান। প্রায় সব চিঠিরই উত্তর দেন, সঙ্গে অটোগ্রাফও। পত্নী সামাদারা সম্পর্কেও রণতুঙ্গা খুব শ্রদ্ধাশীল। "আমার সাফল্যের পেছনে ওঁর একটা বড় ত্যাগ আছে। আমাদের বিয়ের সময় আমি ওঁর অর্ধেকও রোজগার করতাম না। হঠাৎই উনি ঠিক করলেন চাকরিটা ছেড়ে দেবেন। অনেক বোঝানো সত্ত্বেও কিছুতেই শুনলেন না। কেননা, ঘরকন্না ও আমার ক্রিকেট জীবন সম্পর্কেই উনি বেশি আগ্রহী।"

প্র্যাকটিসে যাওয়ার আগে রণতুঙ্গার পোশাক, কিট-ব্যাগ গুছিয়ে টেবিলের ওপর রাখা, অফিসে যাওয়ার সময় জামাটা ধরিয়ে দেওয়া, রান্নাঘরের ঝামেলা সামলানো, ছেলেমেয়েদের তৈরি করে স্কুলে পাঠানো, ফোন-কল অ্যাটেণ্ড করা ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাজই খুব যত্নের সঙ্গে করেন সামাদারা। রণতুঙ্গার কথায়, "টু মি শি হ্যাজ বিন এ সোর্স অব ট্রিমেণ্ডাস স্ট্রেংথ অ্যান্ড ইন্সপিরেশন।"

রণতুঙ্গার ফুটফুটে ছেলেটির নাম ধ্যান। বয়েস মাত্র আট। এখন থেকেই সে ক্রিকেটের নামে পাগল। হবে না-ই বা কেন ? যে-পরিবারে ক্রিকেটই ধ্যান-জ্ঞান, সেখানে ধ্যান রণতুঙ্গা কি অন্য কিছু ভাবতে পারে ! ধ্যানের সবচেয়ে বড় গুণ, ও স্ট্রেট ব্যাটে খেলে। ছেলেকে নিয়ে রণতুঙ্গার অনেক স্বপ্ন। বলেন, "ক্রিকেটের প্রতি ওর অসীম আগ্রহ আছে। আমি চাই, ও ঠিক পথটি ধরে এগোক।"

নতুন ফুটবল-প্রতিভা দিয়রকায়েফ

গত বিশ্বকাপে ফ্রান্সের পারফরম্যান্স খুব হতাশাজনক ছিল। এবারও 'হোস্ট নেশন' হওয়ার সুবাদে মূলপর্বে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে '৯৮-এর আসন্ন বিশ্বকাপে তারা যে জ্বলে উঠবে না, এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় না। ফ্রান্স সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে এক অসাধারণ ফুটবলার। ইউরি দিয়রকায়েফ। উল্কার মতোই আকস্মিকভাবে উঠে এসেছেন তিনি। এখন প্রকৃত অর্থেই 'ম্যাচ-উইনার'। বিশ্বাস হোক বা না হোক, মিশেল প্লাতিনি, জাঁ পিয়ের পপাঁ, এমনকী সাম্প্রতিক ফুটবলের অন্যতম আলোচিত নাম এরিক কতোনা-র চেয়েও তিনি বেশি কার্যকর। দিয়রকায়েফ খেলেন মূলত মিডফিল্ডার ও স্ট্রাইকারের মাঝামাঝি জায়গায়। ইতিমধ্যেই ১৫টি ম্যাচে ১০টি গোল করেছেন। যদিও বেশিরভাগ ম্যাচেই তাঁকে পুরো ৯০ মিনিট খেলানো হয়নি। সদ্য সমাপ্ত ইউরো '৯৬-এ ফ্রান্সকে মূলপর্বে তোলার পেছনে দিয়রকায়েফের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশি। শুধু যে নিজে ভাল খেলেন তা নয়, ওঁর পারফরম্যান্স সতীর্থ খেলোয়াড়দেরও গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে। আক্রমণ গড়তে যেমন ওঁর জুড়ি নেই, তেমনই আবার অন্যের বাড়ানো পাস থেকে গোলও করেন অনায়াসে। সন্দেহ নেই, আগের চেয়ে তিনিএখন আরও পরিণত। আশা করা যায়, আসন্ন বিশ্বকাপে দিয়রকায়েফ ফরাসি-ফুটবলের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

বিশ্বের সেরা 'র‍্যাপিড চেস প্লেয়ার' আনন্দ

সম্প্রতি জেনিভায় অনুষ্ঠিত 'পিসিএ ক্রেডিট সুইস মাস্টার্স টুর্নামেন্ট' জিতে বিশ্বনাথন আনন্দ প্রমাণ করেছেন, তিনিই বিশ্বের সেরা 'র‍্যাপিড চেস প্লেয়ার'। এই জয়ের ফলে ২৬ বছরের আনন্দ গ্রাঁ প্রি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থানে পৌঁছে

নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন থাকুন...

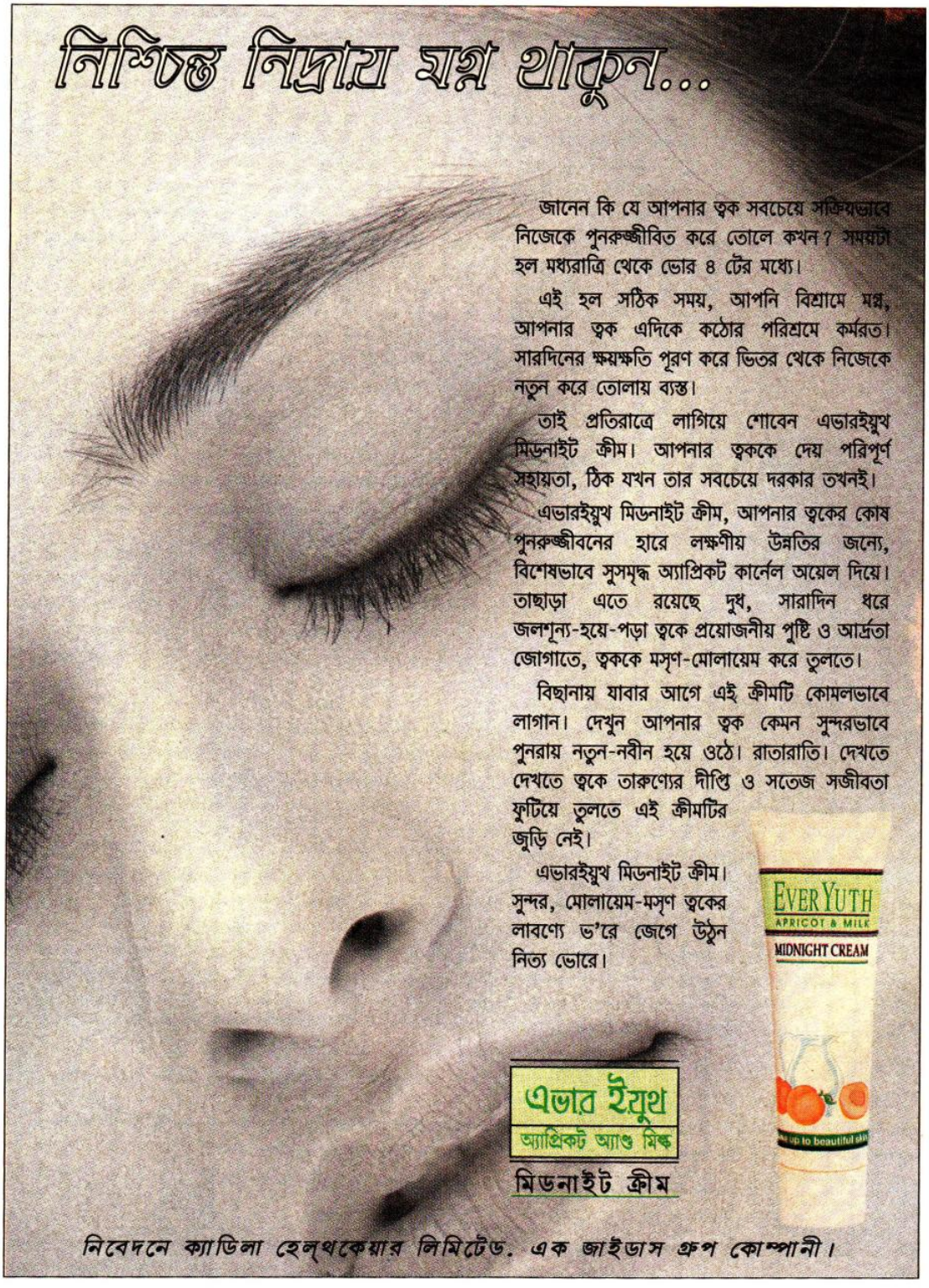

জানেন কি যে আপনার ত্বক সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে কখন? সময়টা হল মধ্যরাত্রি থেকে ভোর ৪ টের মধ্যে।

এই হল সঠিক সময়, আপনি বিশ্রামে মগ্ন, আপনার ত্বক এদিকে কঠোর পরিশ্রমে কর্মরত। সারদিনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে ভিতর থেকে নিজেকে নতুন করে তোলায় ব্যস্ত।

তাই প্রতিরাত্রে লাগিয়ে শোবেন এভারইয়ুথ মিডনাইট ক্রীম। আপনার ত্বককে দেয় পরিপূর্ণ সহায়তা, ঠিক যখন তার সবচেয়ে দরকার তখনই।

এভারইয়ুথ মিডনাইট ক্রীম, আপনার ত্বকের কোষ পুনরুজ্জীবনের হারে লক্ষণীয় উন্নতির জন্যে, বিশেষভাবে সুসমৃদ্ধ অ্যাপ্রিকট কার্নেল অয়েল দিয়ে। তাছাড়া এতে রয়েছে দুধ, সারাদিন ধরে জলশূন্য-হয়ে-পড়া ত্বকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও আর্দ্রতা জোগাতে, ত্বককে মসৃণ-মোলায়েম করে তুলতে।

বিছানায় যাবার আগে এই ক্রীমটি কোমলভাবে লাগান। দেখুন আপনার ত্বক কেমন সুন্দরভাবে পুনরায় নতুন-নবীন হয়ে ওঠে। রাতারাতি। দেখতে দেখতে ত্বকে তারুণ্যের দীপ্তি ও সতেজ সজীবতা ফুটিয়ে তুলতে এই ক্রীমটির জুড়ি নেই।

এভারইয়ুথ মিডনাইট ক্রীম। সুন্দর, মোলায়েম-মসৃণ ত্বকের লাবণ্যে ভ'রে জেগে উঠুন নিত্য ভোরে।

এভার ইয়ুথ
অ্যাপ্রিকট অ্যাণ্ড মিল্ক
মিডনাইট ক্রীম

নিবেদনে ক্যাডিলা হেল্‌থকেয়ার লিমিটেড. এক জাইডাস গ্রুপ কোম্পানী।

গেলেন। আনন্দের সংগ্রহ ন' পয়েন্ট। ভ্লাদিমির ক্র্যামনিক ও গ্যারি কাসপারভ তাঁর চেয়ে এক পয়েন্টে পিছিয়ে।

জেনিভার এই টুর্নামেন্টটিতে বিশ্বের তাবড়-তাবড় দাবাড়ুসহ মোট ১৬ জন অংশ নিয়েছিলেন। গুরুত্বের দিক থেকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপের সঙ্গে এ-ধরনের প্রতিযোগিতার অবশ্য কোনও তুলনাই চলে না। কিন্তু কাসপারভের মতো প্রতিভাকে হারিয়ে আনন্দের চ্যাম্পিয়ান হওয়া মোটেও সহজ কাজ ছিল না। লড়াই জমেছিল হাড্ডাহাড্ডি। আনন্দ বুদ্ধির জোরে সবাইকে পরাস্ত করে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার অর্থ পেয়েছেন। গত জুনে অরুণার সঙ্গে আনন্দের বিয়ে হওয়ার পর থেকেই সাফল্য যেন আনন্দকে ছাড়তেই চাইছে না। তিনি ডর্টমুন্ডে যুগ্মভাবে একটি 'সুপার ক্যাটেগরি টুর্নামেন্ট' জিতেছেন। কিছুদিন আগে মাদ্রিদেও র‍্যাপিড টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। জেনিভার এবারের জয়টির সঙ্গে-সঙ্গে অসাধারণ এক হ্যাট্‌ট্রিক করলেন। এই কৃতিত্ব সত্যিই প্রশংসা করার মতো। জেনিভায় পাওয়া সাফল্য ও স্ত্রী অরুণার প্রেরণা হয়তো আনন্দকে আসন্ন বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপে সাফল্য এনে দেবে।

অভিনব মিড্‌ল স্টাম্প

টেকনোলজির সুফল এখন ক্রিকেটেও ঢুকে পড়েছে। কাঠের তৈরি স্টাম্পের দিন শেষ। সে জায়গায় চলে এসেছে 'ফাইবারগ্লাস'। অবশ্য, ঠিক এই মুহূর্তে, কেবলমাত্র মিড্‌ল স্টাম্পটিই তৈরি হচ্ছে ফাইবারগ্লাস দিয়ে। এতদিন 'স্টাম্পক্যাম' ব্যবহার করা হত ব্যাট্‌সম্যানের ফুটওয়ার্কের নিখুঁত ছবি পাওয়ার জন্য। কিন্তু ওই ব্যবস্থা আদৌ 'ত্রুটিহীন' প্রমাণিত হয়নি। ডেভিড শেপার্ডদের মতো নামকরা আম্পায়ারকেও কঠোরভাবে সমালোচিত হতে হয়েছে।

'টি ডব্লিউ আই' বা 'ট্রান্স ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল' (যারা বর্তমানে ইএসপিএন-এর হয়ে শুটিং-এর কাজ করছে) দুটো স্টাম্প ক্যামেরা নিয়ে জোর গবেষণা চালাচ্ছে। একটি ক্যামেরা রাখা হবে উইকেটের ঠিক মাঝখানে, এবং এর ফলে 'লেগ বিফোর' সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু অতিক্ষুদ্র এই স্টাম্পক্যাম দুটির এক-একটির দাম এক লক্ষ টাকারও বেশি। জানা গেছে, শুধু ক্যামেরা বাবদ মিড্‌ল স্টাম্পের পেছনেই খরচ হবে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। প্রথমে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি শক্ত একটা রডের মধ্যে ক্যামেরা দুটো ভরে রাখা হবে। তারপর ফাইবারগ্লাসের তৈরি ফাঁপা মিড্‌ল স্টাম্পের ভেতরে রডটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। ওয়াকার ইউনুস বা অ্যালান ডোনাল্ডের 'এক্সপ্রেস বোলিং'-এর হাত থেকে দামি ক্যামেরাগুলোকে অক্ষত রাখার জন্যই এই অভিনব ব্যবস্থা। ঘাতসহ করার জন্য উইকেটটি আগাগোড়া থার্মোকল দিয়ে মুড়ে রাখা হবে। অবশ্য ওপর থেকে দেখে অভিনব মিড্‌ল স্টাম্পটিকে আলাদা করা যাবে না। এমনভাবে রং করা, মনে হবে যেন হুবহু কাঠেরই স্টাম্প। ক্রিকেট-সরঞ্জাম তৈরির জন্য বিখ্যাত 'ডানকান ফার্নলে' এই বিশেষ ধরনের ফাইবারগ্লাস উইকেট তৈরি করেছে। 'আন্ডারগ্রাউন্ড কেব্‌ল'-এর মাধ্যমে কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে ক্যামেরার সংযোগ থাকবে। তখন হয়তো আম্পায়াররা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রিকেটকে 'জেন্টলম্যান্‌স গেম'-এর আসনে পুনরায় বসাতে পারবেন। এখানে বলা দরকার, কয়েক মাস আগের ইংল্যান্ড-পাকিস্তান টেস্টে এই বিশেষ উইকেট ব্যবহার করা হয়েছে। ভারতেও অত্যাধুনিক এই মিড্‌ল স্টাম্প ব্যবহারের পরিকল্পনা আছে।

শৌনক ঘোষ

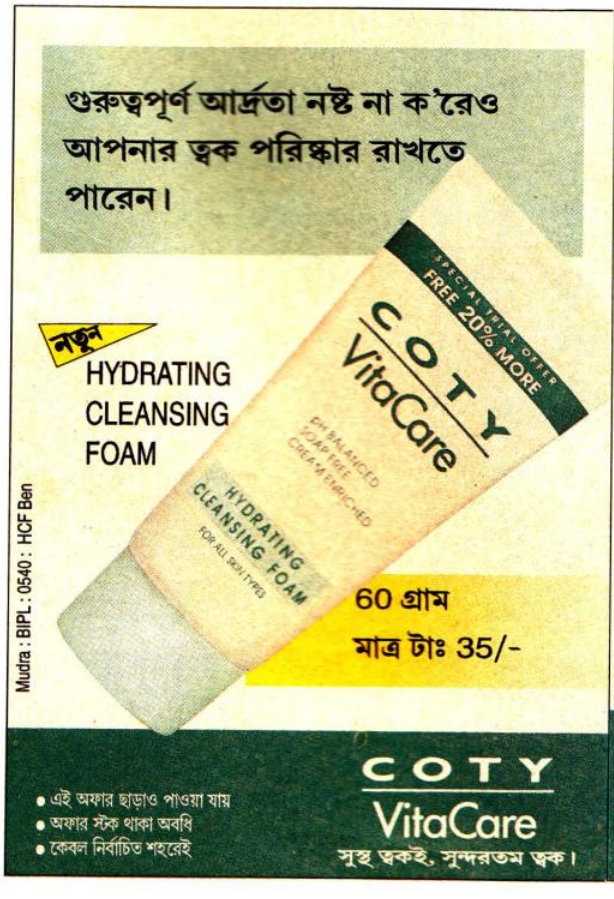

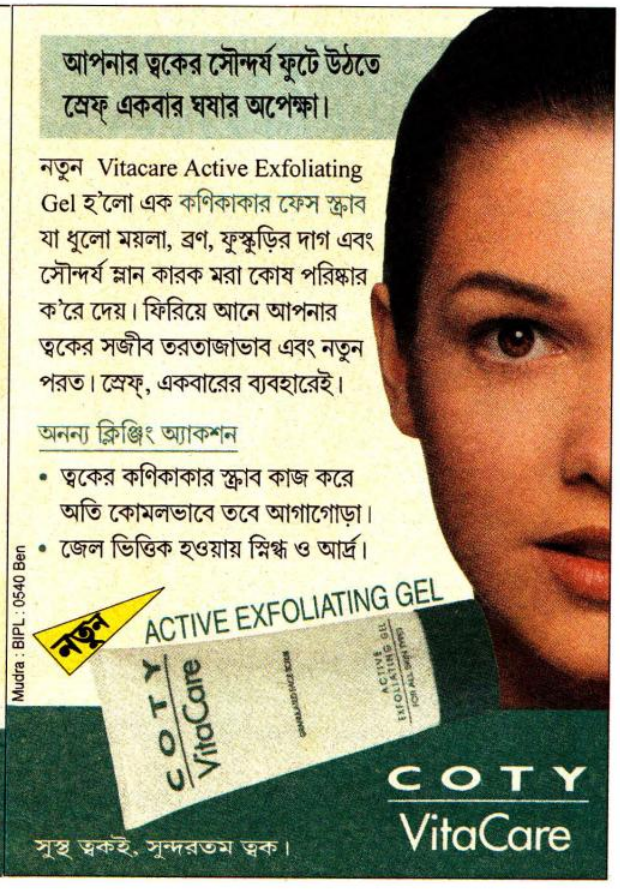

এল আই সি
মানেই
সুরক্ষা

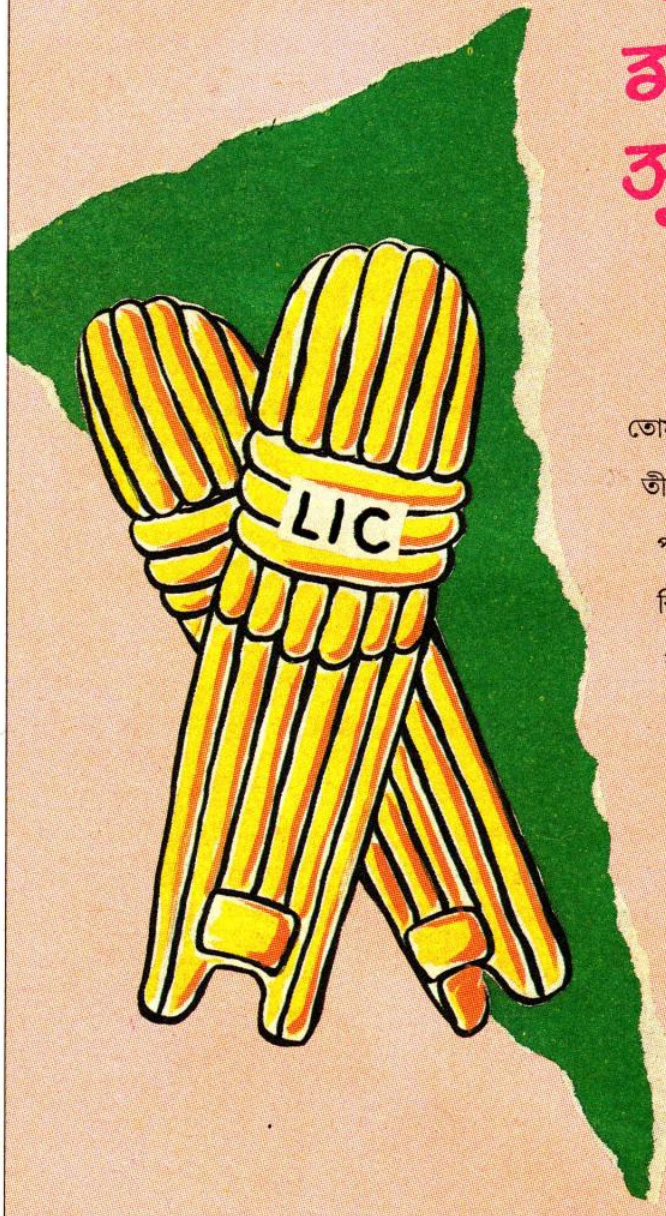

তোমার ব্যাটিং-এর সময় যখন তোমার দিকে তীরবেগে বল আসে, তখন শুধু প্যাড তোমার পা-দুটোকে বাঁচিয়ে রাখে। তাইনা ?

কিন্তু এল আই সি, অর্থাৎ লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন তোমায় আজীবন সম্পূর্ণ সুরক্ষা জোগায়। এল আই সি পলিসি সম্বন্ধে তোমার বাপ-মাকে জিগ্যেস করো।

ওঁরাই বুঝিয়ে দেবেন-এল আই সি তোমাকে কিভাবে সুরক্ষিত রেখে দেয়!

মনে রেখো, এল আই সি সদাই তোমার খেয়াল রাখে!

ভারতীয় জীবন বীমা নিগম

বীমা করুন, সুরক্ষিত থাকুন

R.K.SWAMY/BBDO LIC 5824 A BEN

মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল আজ ফুটবলে ভারতসেরা

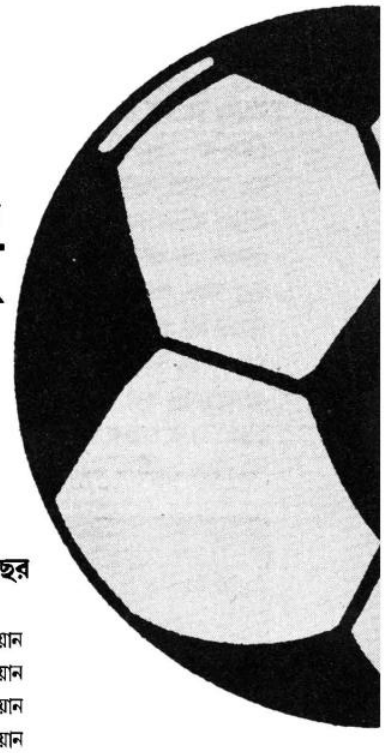

স্কুল-ফুটবলে একের পর এক সাফল্য মধ্যমগ্রাম হাই স্কুলকে আজ উন্নীত করেছে গৌরবের শিখরে। লিখেছেন রতন চক্রবর্তী

হারের খবর শুনতে-শুনতে তখন রীতিমত ক্লান্ত আমরা। তাইল্যান্ডে অনূর্ধ্ব ১৬-র জাতীয় দল এশীয় কাপে একের পর এক ম্যাচে হারছে। দোহায় প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে আক্রামভের ফুটবলাররাও চূড়ান্ত ব্যর্থ। এর মধ্যেই একঝলক খোলা বাতাস এনে দিল মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল। ইজরায়েলের ওর্ট নাটানিয়া স্কুলকে হারিয়ে সুব্রত কাপ জিতল তারা। এবার নিয়ে ন'বার ফাইনালে উঠে সাতবার ভারতসেরা স্কুলের মর্যাদা পেল উত্তর ২৪ পরগনার এই স্কুলটি। দিল্লির অম্বেডকর স্টেডিয়ামের প্রায় ৩০ হাজার দর্শকের সামনে ট্রোফি হাতে যে-ছেলেগুলি গর্বিত ভঙ্গিতে 'ভিক্‌ট্রি ল্যাপ' দিল তাদের অনেক কিছুই নেই। বিজয়ন, বাইচুং, দীপেন্দু বিশ্বাস, অলোক দাসদের মতো বিদেশি কোচ নেই, ওরা পায় না নিয়মিত পুষ্টিকর খাদ্য বা 'মাল্টিজিম'-এর সুযোগ-সুবিধেও। তবুও তারাই দেখিয়ে দিল, বিদেশি দলকে ভয় না পেয়ে কীভাবে ম্যাচ জিততে হয়।

এই সাফল্যের আসল রহস্য কী ? কোচ গৌরহরি দাঁর মতে, "ছাত্রদের জেদ আর অধ্যবসায় এই সাফল্য এনে দিয়েছে।" ১৯৭৭ সাল থেকে দলকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন গৌরহরিবাবু। স্কুলের শিক্ষক নন তিনি। নেন না কোনও পারিশ্রমিকও। তবুও তাঁর ধ্যানজ্ঞান মধ্যমগ্রাম হাই স্কুল। সব অর্থেই 'দ্রোণাচার্য' বলা যায় যাঁকে সেই মানুষটি বলছিলেন, "স্কুলের প্রধানশিক্ষক কৃষ্ণপদ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহুদিনের। সেই টানেই 'কোচিং' করি। অনেক কিছুই নেই আমাদের। নিজেদের মাঠ নেই। শরীরকে সুঠাম করার জন্য জিমনাশিয়াম বা মাল্টিজিমও নেই। তবুও ছেলেরা সাফল্য আনছে শুধু জেদ দিয়ে।"

এমনিতেই সুব্রত কাপে বাংলার ছাত্র-ফুটবলারদের দাপট শুরু থেকেই। গোড়ায় রমরমা ছিল হাওড়ার অক্ষয় শিক্ষায়তন-এর। সাতের দশকে তা চলে যায় পাইকপাড়ার কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন-এর দখলে। প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই চক্রবর্তীর মতো দেশের একসময়ের সেরা ফুটবলারদের তখন তুলে আনতেন আশুতোষের ক্রীড়া-শিক্ষক গোপাল দাস। যা এখন করছেন গৌরহরি দাঁ। সলতে পাকানোর কাজটা মধ্যমগ্রাম শুরু করে নভেম্বর-ডিসেম্বরে। ওই সময় বিভিন্ন স্কুল টুর্নামেন্ট, নার্সারি বা 'আন্ডারহাইট' ফুটবল প্রতিযোগিতা যেখানে হয়, সেখানেই পৌঁছে যান গৌরহরি দাঁ-সহ মধ্যমগ্রাম হাই স্কুলের শিক্ষক 'স্পটার'রা। ১৪-১৫ বছরের ভাল ছেলে দেখলেই যোগাযোগ করেন তার সঙ্গে। ট্রায়ালে উত্তীর্ণ হলে মার্চে নতুন 'সেশন'-এ ভর্তি করানো হয় ছাত্র-ফুটবলারকে। নিয়মিত অনুশীলন হয় স্কুলের পাশের বসুনগর মাঠে। সুব্রত কাপে যাওয়ায় আগে হয় দিন পনেরোর ক্যাম্প। এভাবেই প্রতি বছর উঠে আসে সম্ভাবনাময় ফুটবলাররা, যারা গর্বিত করে মধ্যমগ্রাম স্কুলকে।

'৭৭ থেকে এভাবেই দল নির্বাচন করে দেশের স্কুল-ফুটবলে রীতিমত হইচই ফেলে দিয়েছে মধ্যমগ্রাম। তৈরি করে ফেলেছে সোনার রেকর্ড। স্কুলের প্রধানশিক্ষক কৃষ্ণপদবাবু বলছিলেন, "অনেকেই বলেন আমরা ধার করে এনে ফুটবলার খেলাই। এটা ঠিক নয়। টিম

সাফল্যের বছর

১৯৭৭—রানার্স
১৯৮১—চ্যাম্পিয়ান
১৯৮২—চ্যাম্পিয়ান
১৯৮৩—চ্যাম্পিয়ান
১৯৮৫—চ্যাম্পিয়ান
১৯৮৮—চ্যাম্পিয়ান
১৯৮৯—রানার্স
১৯৯৫—চ্যাম্পিয়ান
১৯৯৬—চ্যাম্পিয়ান

সুব্রত কাপ জয়ী মধ্যমগ্রাম হাই স্কুলের খেলোয়াড়রা

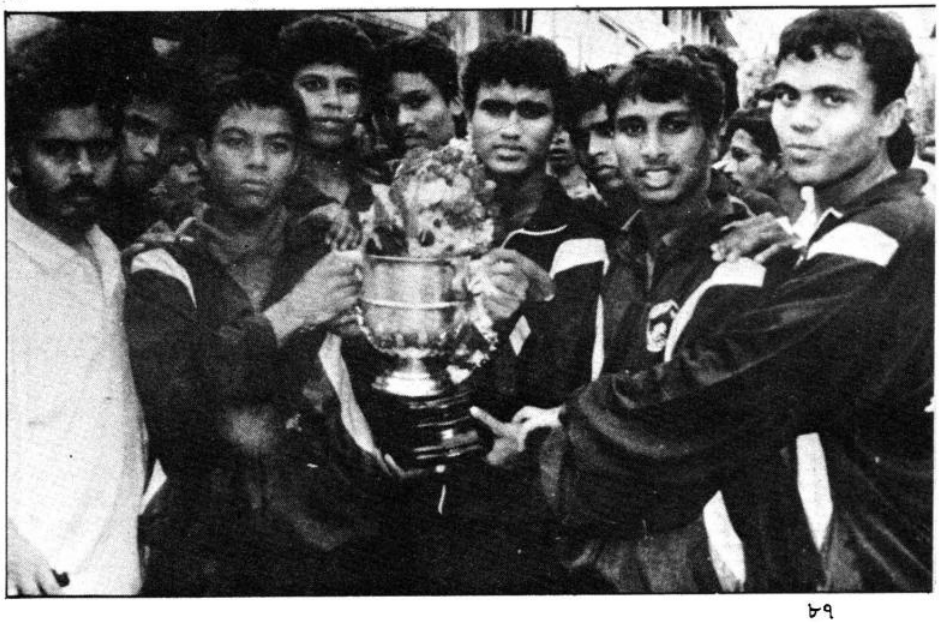

তৈরির নিয়মটা জানলে এই অভিযোগ নিশ্চয়ই টেকে না। যেভাবে আমাদের ফুটবল-দল তৈরি হয়, সেখানে বারুইপুর থেকে বনগাঁর প্রত্যন্ত গ্রামের ফুটবলাররাও খেলার সুযোগ পায়। লেখাপড়ায় ভাল স্কুলও তো মাধ্যমিকে সাফল্যের জন্য অষ্টম, নবম শ্রেণীতে ভাল ছাত্র নেয়, আর আমরা নিই ফুটবলে সাফল্যের জন্য।"

কৃষ্ণপদবাবু জানালেন, এখন দুটো লক্ষ্য নিয়ে এগোবে তাঁর স্কুল। প্রথমত, সকলে চাইছে ১৯৮১-'৮৩ সালের মতো আরও একটা সাফল্যের হ্যাট্‌ট্রিক করতে। সামনের সুব্রত কাপেই আছে সেই সুযোগ। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সাংসদ মাল্টিজিমের জন্য যে টাকা স্কুলকে দিয়েছেন, তার দ্রুত সদ্ব্যবহার।

প্রধানশিক্ষক যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল অনেক উজ্জ্বল মুখ। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল অধিনায়ক নটরাজ দাসকে। বলল, "ফাইনালটা চ্যালেঞ্জ ছিল। বিদেশে গিয়ে সকলেই হারছে। আর আমাদের সামনে ইউরোপিয়ান সার্কিটের একটা দল। সকলকে বলেছিলাম চ্যালেঞ্জ হিসেবে ম্যাচটা নাও। টাইব্রেকারে ওদের হারানোর পর মনে হয়েছিল সত্যিই আমরা চ্যাম্পিয়ান।"

স্থানীয় ছেলে নটরাজের লক্ষ্য ময়দানে বড় দলে খেলে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা। বারাসাতের রফিবুল ঢালির লক্ষ্য অবশ্য টি এফ এ-তে সুযোগ পাওয়া। প্রথম ডিভিশনের 'বি' গ্রুপের দল খিদিরপুরের স্টপার ছেলেটি বলল, "ওখানে সুযোগ পেলে শঙ্করলাল চক্রবর্তী, অনীত ঘোষদের মতো দেখবেন আমিও একদিন দেশের হয়ে খেলব।" রফিবুলের মতোই সঞ্জয় মাইতি, রূপম রায়চৌধুরীর লক্ষ্য দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা। বাগনানের ছেলে সঞ্জয়ের বাবা পেশায় শ্রমিক। এবার সুব্রত কাপে ভাল খেলার জন্য তাঁকে বৃত্তি দিয়েছেন টুর্নামেন্ট কমিটি। রাইট উইঙ্গারটি জানাল, তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ভাল ফুটবলার হয়ে দেশের সম্মান বাড়ানো। এজন্য পৃথিবীর যেখানে পাঠানো হবে, যেতে রাজি সে। সঞ্জয়ের সঙ্গে মাঠে জুটি বেঁধে মধ্যমগ্রামের হয়ে বিপক্ষের গোলে বল ঢুকিয়েছে যে, তাঁর নাম রূপম রায়চৌধুরী। ছ' ম্যাচে সাত গোল করে টুর্নামেন্টের সবাধিক গোলদাতা হওয়া রূপমের বাড়ি বারুইপুরে। সঞ্জয়ের মতো সে-ও ভাল খেলার জন্য আড়াই হাজার টাকা বৃত্তি পাচ্ছে। বলল, "বাড়ির অমতেই ট্রায়াল দিয়েছিলাম এই স্কুলে, সুব্রত কাপ খেলব বলে। এখন সাফল্য দেখে সবাই খুশি।" রূপমের লক্ষ্য বিজয়নের মতো খেলা। আর বনগাঁর কল্যাণ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন 'বাইচুং'-কে ঘিরে। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চির ছেলেটি পড়ে নবম শ্রেণীতে। কল্যাণ আগে পড়ত বনগাঁর যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাপীঠে। তাকে এখানে নিয়ে আসেন গেম্‌স টিচার ভূদেব মুখোপাধ্যায়। সে জানাল, "টি এফ এ-র মতো কোনও অকাদেমিতে খেলার সুযোগ পাওয়াই আমাদের এখন লক্ষ্য।"

ওঁরা স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যে অনেক ফারাক। মধ্যমগ্রাম থেকে উঠে এসেছেন দেবাশিস পালচৌধুরী, বলাই মণ্ডল, আব্দুল সাদিকের মতো ময়দানের অনেক নামী ফুটবলার। সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রূপম রায়চৌধুরী, নটরাজ দাসরা সেরকম হতে পারেন কি না সেটাই এখন দেখার।

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

যাদের জন্য এবারের সাফল্য

আজিজুল হক, সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়, মহেশ সরকার, রফিবুল ঢালি, ভোলা দে, তপন দাস, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জয় ঘোষদস্তিদার, রূপম রায়চৌধুরী, সঞ্জয় মাইতি, পিন্টু মণ্ডল, নরেশ সর্দার, অমিত রায়, রাজু সিংহ। কোচ—গৌরহরি দাঁ, ম্যানেজার—ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

গোলকিপার সুরজিৎ

নায়ক সম্ভবত এভাবেই বেরিয়ে আসে, যেভাবে হল মধ্যমগ্রাম হাই স্কুলের গোলকিপার সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তালিকায় দমদম ক্যান্টনমেন্টের ছেলেটির নাম ছিল রিজার্ভের গোলকিপার হিসেবে। শেষপর্যন্ত সুব্রত কাপের বিদেশ-যাত্রা আটকাল সে-ই। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচ টাইব্রেকারে যাচ্ছে দেখে নির্ধারিত সময়ের মিনিট পাঁচেক আগে তাঁকে নামান কোচ গৌরহরি দাঁ। বসিরহাটে একটি টুর্নামেন্টে টাইব্রেকারে পাঁচটি কিক আটকে দলকে জিতিয়েছিল সুরজিৎ। সেই দৃশ্যই উদ্বুদ্ধ করেছিল কোচকে। আর এতেই বাজিমাত করে দেয় আগের পাঁচটি ম্যাচে 'অপেক্ষায় থাকা' ছেলেটি। কেমন করে নায়ক হল ? পটনায় বাবা-মাকে ছেড়ে শুধু ফুটবলের টানেই কাকার বাড়িতে চলে আসে সুরজিৎ ? "সার যখন নামতে বললেন, তখন বুকটা একটু কেঁপেছিল। বিদেশি দলের প্রথম শটটা যখন রুখে দিলাম তখনই ভেবেছিলাম আজ আমার দিন। তারপরই স্বপ্নপূরণ। পরপর তিনটে কিক আটকে দিলাম। আসলে আমার পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতা আর দু' পাশে লম্বা দুটো হাত বাড়িয়ে দেওয়া ওদের কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এটা শিখেছিলাম ভাস্কর গাঙ্গুলির কাছ থেকে। আমার পুরনো স্কুল সুভাষনগর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে খেলার সময় উনি উৎসাহ দিতেন।"

রওনা হওয়ার সময় সুযোগ পাবে কি না ভাবতে-ভাবতে ট্রেন ধরেছিল সুরজিৎ। আর চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর গ্যালারি থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেছিলেন ভারতের সর্বকালের সেরা গোলকিপার পিটার থঙ্গরাজ। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখেই এগোচ্ছে সে। টাটা ফুটবল অকাদেমির ট্রায়ালে ডাক এসেছে তার।

এঁদেরই মধ্যে লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের তারকারা

পাকিস্তানে সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদি

স্পিনার থেকে বিশ্বরেকর্ডধারী ব্যাট্‌সম্যান—আফ্রিদির উত্থানের কাহিনী চমকপ্রদ। লিখেছেন **সমীরণ সেন**

ছক্কা মারার রেকর্ড নেই ক্লাব ক্রিকেটেও। অথচ সেই তিনি একদিনের ম্যাচে ছক্কা মারার বিশ্বরেকর্ড করে ফেললেন। দলে ওঁকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল স্পিন বোলার হিসেবে। অথচ এসেই বিশ্বরেকর্ড করে ফেললেন ব্যাটে—সবচেয়ে দ্রুত শতরানের। হলিউডের গল্পকেও সম্ভবত হার মানাবে তরুণ ক্রিকেটার শাহিদ আফ্রিদির নায়ক হয়ে ওঠার ওই চমকপ্রদ কাহিনী। তাঁকে নিয়ে এখন মাতামাতি চলছে পাকিস্তান জুড়ে। পাকিস্তানে এতদিন সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্রিকেটার ছিলেন ইমরান খান। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে তাঁকেও ছাপিয়ে গেছেন আফ্রিদি।

অথচ কিছুদিন আগেও পাকিস্তানে তাঁর নাম প্রায় কেউই জানতেন না। আফ্রিদির জন্ম উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, ১৯৮০ সালের ১ মার্চ। এখন করাচিতে থাকেন আফ্রিদি। এখানকারই ইসলামিয়া কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র তিনি। বয়স মাত্র ১৬ বছর। ক্রিকেটের ভক্ত ছেলেবেলা থেকেই। এখন খেলেন করাচি হোয়াইট দলে। লেগ স্পিনার হিসেবেই তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব পাকিস্তানের অনূর্ধ্ব-১৭ বছর বয়সের টুর্নামেন্টে সাতটি উইকেট প্রাপ্তি। পাকিস্তানের সেরা ক্রিকেট প্রতিযোগিতা কায়েদ-ই আজম ট্রোফিতেও তিনি সুযোগ পেয়েছেন। অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরও করেছেন আফ্রিদি। তরুণ প্রতিভা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে শুরু করেছিলেন আফ্রিদি। কিন্তু দেশজুড়ে তাঁর নাম মোটেই ছড়ায়নি। শেষপর্যন্ত বিখ্যাত হয়ে ওঠার কাজটি করে দিল মাত্র একটি ইনিংস। আহত লেগস্পিনার মুস্তাক আমেদের জায়গায় তাঁকে ডেকে নেওয়া হয়েছিল চতুর্দেশীয় টুর্নামেন্টে। টুর্নামেন্টটি হচ্ছিল নাইরোবিতে। তাঁর দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচেই বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন

মাত্র ৩৭ বলে সেঞ্চুরি করে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন আফ্রিদি

আফ্রিদি। মজার কথা, গড়লেন সেই শ্রীলঙ্কারই বিপক্ষে, যে-দেশের ব্যাট্‌সম্যান সনৎ জয়সূর্য পাকিস্তানের বিপক্ষেই একদিনের ম্যাচে দ্রুততম শতরানের বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আফ্রিদি বিধ্বংসী ব্যাট্‌সম্যান জয়সূর্যের বিশ্বরেকর্ড কেড়ে নিলেন তাঁরই বলকে বেধড়ক পিটিয়ে। মাত্র ৩৭ বলে একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে শতরান করলেন এই তরুণ ব্যাট্‌সম্যান। জয়সূর্য এ-বছরের এপ্রিলে সিঙ্গাপুরে ৪৮ বলে শতরান করেন, পাকিস্তানের বিপক্ষে। তার যোগ্য জবাব দিলেন আফ্রিদি। জয়সূর্যের বলে পাঁচটি ছক্কা মেরেছেন তিনি, জয়সূর্যের দু'ওভারে নিয়েছেন ৪৩ রান। সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার বিশ্বরেকর্ডও করেছেন আফ্রিদি। তবে এ-ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর অংশীদার জয়সূর্য। দু'জনেই ১১টি করে ছক্কা মেরেছেন।

পাকিস্তানের নির্বাচন কমিটির সদস্য হারুন রশিদ খুব প্রশংসা করেছেন আফ্রিদির।

দেশে ফেরার পরে আফ্রিদিকে নিয়ে এখন মাতামাতি চলছে। তাঁর বাড়িতে এখন অনুরাগীর বন্যা। প্রতি মুহূর্তে টেলিফোন বেজে চলেছে। ভক্তরা তো আফ্রিদির নতুন নামকরণই করেছেন 'ছয়ের রাজা'। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টেস্ট দলে আফ্রিদি সুযোগ না পাওয়ায় রীতিমত বিক্ষোভও দেখিয়েছেন ওঁর অনুরাগীরা। আফ্রিদি নিজে বলেছেন, "জয়সূর্যের মতো ক্রিকেটারের রেকর্ড ভাঙতে পেরে আমি খুশি। কিন্তু এতে থেমে থাকলেই চলবে না। আমাকে ভাল খেলতে হবে। দেশের নাম বাড়াতে হবে।" আমরা অবশ্যই চাইব, বিশ্বক্রিকেটে শাহিদ আফ্রিদির মতো এক প্রতিভাবান খেলোয়াড় নিজের যোগ্যতা দেখান।

এখন বিশ্বের

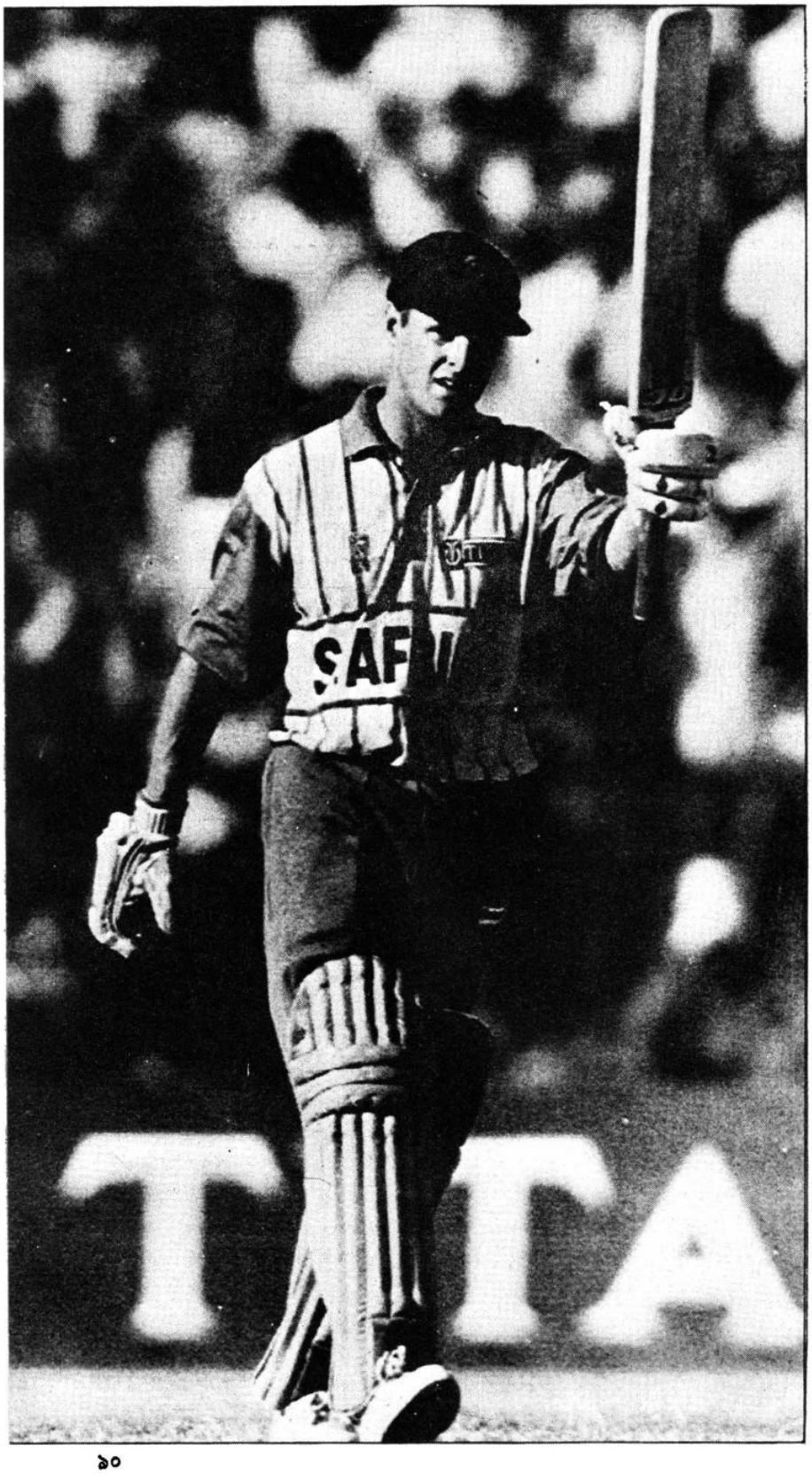

দক্ষিণ আফ্রিকার রাগবি বা স্কোয়াশ জাতীয় দলে তাঁকে এখন খেলতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বছর ছয় আগে এই দুটি খেলাতেই গ্যারি কার্স্টেন ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সেরা খেলোয়াড়দের একজন। ক্রিকেটেও তিনি যে কম দক্ষ ছিলেন, তা নয়। কিন্তু সেদিন কেউই ভাবেননি যে, দেশের হয়ে একদিন তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে অংশ নিতে পারবেন। কারণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মূল স্রোতের বাইরে ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৯১ সালে 'নির্বাসন' উঠে যেতেই দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটারের মতো গ্যারি কার্স্টেনও তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই জাতীয় দলে চলে আসেন তিনি। তবে তখন কেউই ভাবেননি, আর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি বেশ কয়েকটি বিশ্বরেকর্ড ভেঙে ফেলবেন। প্রকৃতপক্ষে এই মরসুমে দারুণ ফর্মে আছেন গ্যারি কার্স্টেন। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগত রানের বিশ্বরেকর্ড, এক 'ক্যালেন্ডার ইয়ার'-এ সর্বাধিক রানের বিশ্বরেকর্ড, সবচেয়ে বেশি শতরানের রেকর্ডও গড়লেন তিনি এ-মরসুমেই। নিঃসন্দেহে এখন বিশ্বের এক নম্বর ব্যাট্‌সম্যান গ্যারি কার্স্টেন।

গ্যারি কার্স্টেনের পরিবারের প্রায় সকলেই ক্রিকেট অনুরাগী। চার ভাইয়ের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। প্রত্যেকেই ক্রিকেট খেলেন। তবে বড় ভাই পিটার জাতীয় দলের ওপেনারও ছিলেন। গত বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলেছিলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা দলের প্রধান ব্যাটিং-ভরসা ছিলেন পিটার। মজার কথা, গত বিশ্বকাপে সেরা ছিলেন বড় ভাই। আর এবারের বিশ্বকাপে প্রধান ভরসা ছিলেন ছোট ভাই গ্যারি। তাঁর ক্রিকেট-শিক্ষার পেছনে যে দাদা পিটারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, সে-কথা অকপটে স্বীকার করেন গ্যারি। তিনি বলেছেন, "এখনও ক্রিকেটের খুঁটিনাটি দোষ ও-ই আমাকে শুধরে দেয়। ওর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি।" গ্যারি গর্বিতভাবে জানিয়েছেন, "বলার মতো কথা, আমরা দু'ভাই দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক ম্যাচে একসঙ্গে ওপেন করেছি।" তিনি আরও জানিয়েছেন, "পিটার এখনও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলছে। ভালই খেলছে। ৪২

এক নম্বর ব্যাট্‌সম্যান গ্যারি কার্স্টেন

দারুণ ফর্মে আছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ওপেনার গ্যারি কার্স্টেন। তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **তানাজি সেনগুপ্ত**

বছর বয়স হয়ে গেছে বলে জাতীয় দলে এখন আর খেলছে না। কিন্তু ও কীরকম ব্যাট্‌সম্যান, সেটা বলে ওকে ছোট করার কোনও দরকার নেই।"

গ্যারি কার্স্টেনের জন্ম কেপ টাউনে, ১৯৬৭ সালের ২৩ নভেম্বর। বাঁ হাতে ব্যাট করেন, ডান হাতে অফ ব্রেক বল করেন, ফিল্ডার হিসেবেও বিশ্বে প্রথম কয়েকজনের মধ্যে আসেন তিনি। মাস কয়েক আগেই শারজাতে তিনি টুর্নামেন্টের সেরা ফিল্ডার নির্বাচিত হন। অলরাউন্ডার হিসেবে এখন পরিচিত হলেও তাঁর উত্থান-পর্ব কিন্তু খুব মসৃণভাবে হয়নি। ক্রিকেট-অন্ত-প্রাণ গ্যারি ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স-এ দীর্ঘদিন ধরেই ভাল খেলে আসছিলেন। কিন্তু দেশের হয়ে খেলার জন্য এত আগ্রহী হয়েছিলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরে আসার খবর শুনে নিজের ছুটি কাটানো মাঝপথে বন্ধ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ উড়ে যান। দক্ষিণ আফ্রিকা তখন এক সংক্ষিপ্ত সফরে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গিয়েছিল। কিন্তু গ্যারি সেখানে গিয়েছিলেন কেন? তিনি জানিয়েছেন, "আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ব্যাপারটা যে কী, তা বোঝার দরকার ছিল।"

দেশের হয়ে খেলার জন্য গ্যারিকে খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি। তিনি প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৯৩-'৯৪ মরসুমে, সিডনিতে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। ছেলেবেলা থেকে গ্যারি নিজেকে টেস্ট ওপেনার হিসেবে তৈরি করেছিলেন। ফলে একদিনের জাতীয় দলে ঢোকার আগেই অনেকে তাঁকে 'স্লো ব্যাট্‌সম্যান' বলতে লাগলেন। ইংল্যান্ডের সঙ্গে কয়েকটি ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা পরীক্ষামূলকভাবে রিচার্ড স্নেলকে দিয়েও ওপেন করায়। তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল দক্ষতা এবং রান করার দিক থেকে কার্স্টেনই সবচেয়ে যোগ্য। তাই টেস্টের মতো একদিনের ম্যাচেও গ্যারি কার্স্টেন হয়ে উঠলেন দক্ষিণ আফ্রিকা দলের সম্পদ। শুধু তাই নয়, এখন তিনি জাতীয় দলের সহ-অধিনায়কও। অ্যালান ডোনাল্ড বা ব্রায়ান ম্যাকমিলানের মতো অভিজ্ঞ ও সিনিয়ার খেলোয়াড়কে টপকে তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়ার একটাই কারণ, তাঁর ধারাবাহিক ভাল পারফরম্যান্স। আর অধিনায়কত্ব করার অভিজ্ঞতাও তাঁর আছে। ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সের হয়ে এই দায়িত্ব তিনি দীর্ঘদিন পালন করেছেন। গ্যারি কার্স্টেন বলেছেন, "সব দায়িত্বই আমি পছন্দ করি, তবে সবচেয়ে ভালবাসি ব্যাটে রান করতে।" সেটা তিনি করেছেন এবারের বিশ্বকাপে। ছ'টি ম্যাচে তাঁর রান-সংখ্যা ৩৯১। সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীর তালিকায় তাঁর স্থান চতুর্থ। তাঁর আগে ছিলেন শচীন তেণ্ডুলকর (৫২৩ রান), মার্ক ও' (৪৮৪ রান) এবং অরবিন্দ ডি সিলভা (৪৪৮ রান)। প্রথম দু'জন অবশ্য একটি ম্যাচ বেশি খেলেছেন। দুটি বিশ্বকাপ-রেকর্ডও করেছেন কার্স্টেন। একটি অ্যান্ড্রু হাডসনের সঙ্গে প্রথম উইকেট জুড়িতে সর্বাধিক রান। তাঁরা দু'জনে মিলে ২০ বছরের পুরনো বিশ্বকাপ রেকর্ড ভাঙেন। ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার রিক ম্যাকসওকার (৭৩) ও অ্যালান টার্নার (১০১) প্রথম উইকেট জুড়িতে করেছিলেন ১৮২ রান।

হাডসন (১৬১) এবং কার্স্টেন (৮৩) মিলে তুললেন ১৮৬, হল্যান্ডের বিপক্ষে। আর-একটি গ্যারি কার্স্টেনের একেবারে ব্যক্তিগত বিশ্বরেকর্ড। এর আগে বিশ্বকাপে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভিয়ান রিচার্ড্‌স। ১৯৮৭ সালে রিচার্ড্‌সের ওই রেকর্ড ছিল ১৮১ রানের, করাচিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। সেটা ভেঙে দিয়ে জীবনের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে কার্স্টেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিপক্ষে করলেন ১৮৮ রান, রাওয়ালপিণ্ডিতে এই ম্যাচে ওপেন করতে এসে শেষপর্যন্ত তিনি অপরাজিত থাকেন। মাত্র এক রানের জন্য একদিনের ম্যাচে রিচার্ড্‌সেরই ১৮৯ রানের সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ডটি ছুঁতে পারেননি। তাঁর দুঃখ, সঙ্গীর অভাবে তিনি তা করতে পারেননি। আর-একদিক থেকে তিনি খুশিও। যোগ্য পূর্বসূরির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, "বিশ্বরেকর্ড ভিভকেই মানায়। আমি অতি সাধারণ ব্যাট্‌সম্যান। যোগ্য হাতেই বিশ্বরেকর্ড রইল।"

বিশ্বকাপে দুটি রেকর্ড দিয়ে মরসুম শুরু করার পর কার্স্টেন তাঁর দুর্দান্ত ফর্ম বজায় রাখেন শারজাতে। 'ম্যান অব দ্য সিরিজ' হন, ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের বিপক্ষেই দারুণ খেলেন। ভারতের বিপক্ষে করেন দুটি শতরান। সেই ফর্মের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়নি চলতি ত্রিদেশীয় টাইটান কাপেও। এর ফলেই তিনি আরও দুটি বিশ্বরেকর্ড করে ফেলেছেন এবার। ভেঙে দিয়েছেন একদিনের ম্যাচে এক 'ক্যালেন্ডার ইয়ার'-এ ব্রায়ান লারার করা ১৩৪৯ রানের রেকর্ড। এই মরসুমে ২৪টি ম্যাচ খেলে (২৩ অক্টোবর পর্যন্ত) তিনি করেছেন ১৩৫২ রান। গড় ৬৭.৬০। একদিনের ম্যাচে যা প্রায় অবিশ্বাস্য। শুধু লারার নয়, আর-একটা রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি শচীন তেণ্ডুলকরের। একদিনের ম্যাচে এক মরসুমে সবচেয়ে বেশি শতরান ছিল শচীনের, পাঁচটি। ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১০৫ নট আউট করার পরই এই মরসুমে কার্স্টেনের ছ'টি সেঞ্চুরি হয়ে গেল। ক্রিকেট-জীবনে মাত্র ৫৪টা ম্যাচ খেলে ২৩৩৫ রান, সাতটি সেঞ্চুরি। সে-জায়গায় প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি ম্যাচ খেলে একই সময়ে শচীনের ন'টি, লারার ১০টি শতরান। রেকর্ড গড়তে পেরে কার্স্টেন স্বাভাবিকভাবেই খুশি। তবে তিনি এও বলেছেন, "এসব রেকর্ডের কথা খেলার সময় মাথায় থাকে না। পরে রেকর্ড হয়েছে শুনলে ভাল লাগে। এক বছরে আমি লারা বা শচীনের চেয়ে বেশি রান করেছি শুনলে কার না ভাল লাগে?"

কার্স্টেনের সাফল্যের রহস্য কী? দক্ষিণ আফ্রিকা দলের কোচ বব উলমারের মতে, "গ্যারির সবচেয়ে বড় গুণ রানের খিদে। কখনও সন্তুষ্ট নয়।" সঈদ আনওয়ার বা সনৎ জয়সূর্যের মতো তিনি বিধ্বংসী নন ঠিকই, কিন্তু এই বাঁ-হাতি ব্যাট্‌সম্যানের আর-একটা বড় গুণ যখন-তখন রান-রেট বাড়িয়ে নিতে পারেন। স্ট্রোক করে খেলতে ভালবাসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রোনিয়ে বলেছেন, "গ্যারি দলের স্বার্থে খেলে। দলের কথা ভাবে। তাই সব সময় চেষ্টা করে রান করার।" নিঃসন্দেহে ফর্মের বিচারে গ্যারি কার্স্টেনই এখন বিশ্বের এক নম্বর ওপেনার ও ব্যাট্‌সম্যান।

এ-পক্ষের নির্বাচিত অনুষ্ঠানসূচি

বুধবার, ৬ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

স্টোরি অব পাওয়ার জেনারেশন
• *দুপুর ১-০০*
আর্কাইভ—এ সোর্স ফর দ্য পাস্ট
• *দুপুর ১-১৮*
এমব্রায়ো জেনেসিস
• *দুপুর ১-৩৩*

ডিসকভারি চ্যানেল

ওয়াইল্ড লাইফ ক্রনিকল্‌স
ভেনম
• *রাত ১২-০০*
ইন কেয়ার অব নেচার
হিপোজ অব উগান্ডা
• *রাত ১২-৩০*
হিস্ট্রিজ টার্নিং পয়েন্ট
দ্য ব্ল্যাক ডেথ
• *রাত ১-০০*
ওলিম্পিক হল অব ফেম
গ্রেগ লুগানিস
• *রাত ৩-০০*
পাসপোর্ট টু অ্যাডভেঞ্চার
এক্সপ্লোরিং নরওয়ে
• *ভোর ৪-০০*
উইংস
লকহিড সি ওয়ানথার্টি
হারকিউলিস
• *সকাল ৫-০০*
জু লাইফ উইথ জ্যাক হানা
পর্ব ১৯
• *সকাল ৮-৩০*

লস্ট অ্যানিম্যাল্‌স অব দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি
পর্ব ৫
➤ এই শতকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এমন প্রাণীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। হারিয়ে যাওয়া সেইসব প্রাণীদের বিষয়ে নানা তথ্য পাওয়া যাবে এই অনুষ্ঠানে। পর্ব ৫-এর বিষয় : উত্তর আমেরিকার ব্যাডল্যান্ডস বিগহর্ন ভেড়া , আরবি অস্ট্রিচ, গুয়াম দ্বীপের উড়ুক্কু শেয়াল ও আরও অনেক বিরল প্রজাতির প্রাণী।
• *সন্ধে ৭-৩০*

বৃহস্পতিবার, ৭ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

নো অ্যাবাউট দ্য টিউবলাইট
পর্ব ১
• *সকাল ৬-০০*
আন্ডারস্ট্যান্ডিং হাইড্রোকার্বন্‌স
• *সকাল ৬-১০*
টাইনি ইজ বিউটিফুল
• *সকাল ৬-২৬*
শেক্‌সপিয়র অ্যান্ড দ্য রোমান্টিক পোয়েট্‌স
• *সকাল ৬-৪০*
ইনট্রোডাকশন টু অ্যানথ্রোপলজি
পর্ব ১
• *দুপুর ১-২৬*
এডুকেশনাল ভ্যালুজ থ্রু ইংলিশ
• *দুপুর ১-৪০*

ডিসকভারি চ্যানেল

পাসপোর্ট টু অ্যাডভেঞ্চার
সুইডিশ স্কি অ্যাডভেঞ্চার
• *ভোর ৪-০০*
ওয়ার্ল্ডওয়াইড গাইড
ব্যাঙ্কক
• *ভোর ৪-৩০*
উইংস
বোয়িং ৭৪৭
• *সকাল ৫-০০*
নেচার ওয়াচ
হর্নস অব এ ডায়লেমা
• *সকাল ৮-০০*
জু লাইফ উইথ জ্যাক হানা
পর্ব ২০
• *সকাল ৮-৩০*
দ্য নিউ এক্সপ্লোরার্‌স
চিলড্রেন অব দ্য রিভার
• *সন্ধে ৬-৩০*
বর্ন অ্যামং ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল্‌স
ইন সার্চ অব বিগ মামা
• *সন্ধে ৭-০০*
ফ্রম মাম্মিজ টু এপ্‌স
লার্নিং দ্য রোপ্‌স অব লাইফ
ইন দ্য ওয়াইল্ড
• *সন্ধে ৭-৩০*

শুক্রবার, ৮ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

আন্ডারস্ট্যান্ডিং সোলার অ্যাকটিভিটি
পর্ব ১
• *দুপুর ১-০০*
ভারচুয়াল রিয়্যালিটি
• *দুপুর ১-১৫*

ডিসকভারি চ্যানেল

ওয়ার্ল্ডওয়াইড গাইড
লস অ্যাঞ্জেলিস
• *ভোর ৪-০০*
উইংস
জেনারেল ডায়নামিক্‌স
এফ ১১১
• *সকাল ৫-০০*
ইনভেনশন
আলফ্রেড নোবেল,
টায়ার ইনভেন্টর্‌স
• *সকাল ৭-০০*

দোজ ইনক্রেডিব্‌ল অ্যানিম্যাল্‌স
অ্যালিগেটরস
• *দুপুর ৩-০০*
ডাইভ টু অ্যাডভেঞ্চার
এ ট্রিপ ইন্টু দ্য ব্লু
• *বিকেল ৫-৩০*
দ্য নিউ এক্সপ্লোরার্‌স
রিভার্‌স অব ফায়ার
➤ হাওয়াই দ্বীপের কিলেউয়া আগ্নেগিরির লাভাস্রোত নিয়ে গবেষণা করেছিলেন বিজ্ঞানী ফ্র্যাঙ্ক ট্রাসডেল। কিলেউয়ার অগ্ন্যুৎপাতের এক দুর্দান্ত তথ্যচিত্র।
• *সন্ধে ৬-৩০*
ওয়াইল্ড লাইফ
পর্ব ১৮
• *সন্ধে ৭-০০*

শনিবার, ৯ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

পেন্টিং উইথ অ্যাক্রেলিক
• *সকাল ৬-৩৩*
দ্য স্টোরি অব ইন্ডিয়ান পেন্টিং
পর্ব ২— ওয়াল পেন্টিং
• *দুপুর ১-০০*

ডিসকভারি চ্যানেল

দ্য অ্যাডভেঞ্চারার্‌স
পর্ব ১৬
• *দুপুর ১২-০০*
ওয়ার্ল্ডওয়াইড গাইড
ভিয়েতনাম
• *দুপুর ১২-৩০*
ওয়াইল্ড লাইফ
পর্ব ১৮
• *দুপুর ২-০০*
লস্ট অ্যানিম্যাল্‌স অব দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি
পর্ব ৫
• *দুপুর ৩-৩০*

রবিবার, ১০ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

লিভিং উইথ হেল্‌থ
ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড প্রিভেনশন অব কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ
• *সকাল ৬-১২*
দ্য উইক অ্যাহেড
• *সকাল ৬-৪০*

ডিসকভারি চ্যানেল

ড্রিম্‌স অব ফ্লাইট
গোল্ডেন এজ অব অ্যাভিয়েশন
• *রাত ৩-০০*
ওয়ার্ল্ডওয়াইড গাইড
ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট ইন্ডিজ
• *ভোর ৪-৩০*

নেচারা ওয়াচ
অল ফর দ্য এলিফ্যান্ট
• *সকাল ৮-০০*
জু লাইফ উইথ জ্যাক হানা
পর্ব ২৩
• *সকাল ৮-৩০*

সোমবার, ১১ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

স্পিড অ্যান্ড ভেলোসিটি
পর্ব ২
• *দুপুর ১-১৬*
কালার্স
• *দুপুর ১-৪১*

ডিসকভারি চ্যানেল

আর্কিওলজি
ডে অব দ্য ডেড
• *বিকেল ৫-০০*
ডাইভ টু অ্যাডভেঞ্চার
শার্ক্স : প্রিডেটর্স অব প্রে
• *বিকেল ৫-৩০*
দ্য নিউ এক্সপ্লোরার্স
ইন্টু দ্য ডেপথ্স
• *সন্ধে ৬-৩০*
এ নিউ ওয়ার্ল্ড
সিড্স অব সারভাইভ্যাল
(ইথিওপিয়া)
• *রাত ৮-০০*

মঙ্গলবার, ১২ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

সায়েন্স কোয়েস্ট '৯৫-'৯৬
পর্ব ৬
• *দুপুর ১-০০*
মেডিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট্স অ্যান্ড ডায়াগ্নোসিস
• *দুপুর ১-২৭*

ডিসকভারি চ্যানেল

ইনভেনশন
অস্টিন রোবট্স, টু হুইল ড্রাইভ বাইক, লক্স
• *সকাল ৫-৩০*
দোজ ইনক্রেডিব্‌ল অ্যানিম্যাল্স
হর্সেস
• *সকাল ৭-৩০*
দ্য অ্যাডভেঞ্চারার্স পর্ব ১৯
• *সকাল ৯-৩০*

বুধবার, ১৩ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

মিস্ট্রি উইদিন গাল্‌ফ অব কচ্‌
• *দুপুর ১-০০*
ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন
• *দুপুর ১-২১*
পার্ল্স অ্যান্ড ব্যাঙ্গল্স অব হায়দরাবাদ
• *দুপুর ১-৪৫*

ডিসকভারি চ্যানেল

নেক্সট স্টেপ
মিনি জেট
• *সকাল ৭-৩০*
ওয়ার্ল্ডওয়াইড গাইড
ইউ এস এ ওয়েস্ট কোস্ট
• *দুপুর ১২-৩০*
দোজ ইনক্রেডিব্‌ল অ্যানিম্যাল্স
বিয়ার্স
• *বিকেল ৩-০০*

বৃহস্পতিবার, ১৪ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

টিউবলাইট
পর্ব ২
• *সকাল ৬-০০*
পপুলেশন অব ইন্ডিয়া
সাম পারস্পেকটিভ্স
• *সকাল ৬-১৩*
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়
• *সকাল ৬-৩৪*

ডিসকভারি চ্যানেল

পাসপোর্ট টু অ্যাডভেঞ্চার
পর্ব ৩৯
• *ভোর ৪-০০*
নেক্সট স্টেপ
রোলার কোস্টার ডিজাইন অ্যান্ড মেকিং
• *সকাল ৭-৩০*

শুক্রবার, ১৫ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

আন্ডারস্ট্যান্ডিং সোলার অ্যাকটিভিটি
পর্ব ২
• *দুপুর ১-০০*
মাইন্ড প্রবলেম্স
• *দুপুর ১-১৮*

ডিসকভারি চ্যানেল

উইংস
হ্যারিয়ার
• *সকাল ৫-০০*
ইনভেনশন
পেস মেকার, ইনস্ট্যান্ট ফোটোগ্রাফি
• *সকাল ১০-০০*
আর্থার সি. ক্লার্ক্স মিস্টিরিয়াস ইউনিভার্স
স্ট্রেঞ্জ পাওয়ার্স অব অ্যানিম্যাল্স
• *দুপুর ২-০০*

শনিবার, ১৬ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

নিউ হরাইজন্স
• *সকাল ৬-০০*
হোয়েন আর্ট অ্যান্ড সায়েন্স মিট
পর্ব ১
• *সকাল ৬-৩১*

ডিসকভারি চ্যানেল

লস্ট অ্যানিম্যাল্স অব দ্য টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি
পর্ব ৬
• *বিকেল ৩-০০*
ইন কেয়ার অব নেচার
ডলফিন্স অব কাইকুরা বে
• *বিকেল ৫-৩০*
স্কাইবাউন্ড
ফ্রি ফ্লাইট
• *রাত ৮-০০*

রবিবার, ১৭ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

দ্য উইক অ্যাহেড
• *সকাল ৬-৩৮*

ডিসকভারি চ্যানেল

উইংস
গ্রুম্যান এফ ১৪ টমক্যাট
• *সকাল ৫-০০*
নেক্সট স্টেপ
সাবমেরিন্স
• *সকাল ৭-৩০*
ওয়ার্ল্ডওয়াইড গাইড
মার্টিনিক
• *দুপুর ১২-৩০*
সুপারসিটিজ
রোম
• *বিকেল ৫-০০*

সোমবার, ১৮ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

হোয়াই কনজার্ভ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল্স
• *দুপুর ১-৪৬*

ডিসকভারি চ্যানেল

নেক্সট স্টেপ
নাসা হাই স্পিড সিভিল ট্রান্সপোর্ট
• *সকাল ১০-৩০*
ওয়ার্ল্ডওয়াইড গাইড
ফ্রেঞ্চ গায়না
• *দুপুর ১২-৩০*
দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড
দ্য সিক্রেট লেপার্ড
• *দুপুর ১-০০*
দ্য নিউ এক্সপ্লোরার্স
দ্য রেস্টলেস আর্থ
• *সন্ধে ৬-৩০*

মঙ্গলবার, ১৯ নভেম্বর

ইউ জি সি কান্ট্রিওয়াইড ক্লাসরুম

আয়রন-ওর
অকারেন্স অ্যান্ড মাইনিং
• *সকাল ৬-০০*
চাইনিজ পাপেট আর্ট
• *সকাল ৬-২৭*
সায়েন্স কোয়েস্ট '৯৫-'৯৬
পর্ব ৭
• *দুপুর ১-০০*

ডিসকভারি চ্যানেল

ইনভেনশন
অ্যান্টি-নয়েজ টেকনোলজি, রাডার
• *সকাল ৭-০০*
নেচার ওয়াচ
শ্যাডোজ ইন দ্য ফরেস্ট
• *সকাল ৮-০০*
দোজ ইনক্রেডিব্‌ল অ্যানিম্যাল্স
আনলাইকলি ফ্রেন্ডস্
• *সকাল ৯-০০*
নেক্সট স্টেপ
ইন্ডিয়ানাপোলিস ৫০০
• *সকাল ১০-৩০*

(অনুষ্ঠানসূচি পরিবর্তনসাপেক্ষ)

ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালি

'লজিক' শব্দটা এখন আমাদের কাছে খুব চেনা হয়ে গেছে।

এখন লজিক বলতে শুধু যে তর্কশাস্ত্র, তা নয়। তার সঙ্গে জুড়ে গেছে 'ডিজিটাল লজিক', 'কম্পিউটার লজিক', 'সিম্বলিক লজিক', 'ফাজি লজিক'—আরও কত কী! অর্থাৎ, লজিকের ব্যবহার এখন বহুমুখী। আর, এটাও ঠিক, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগের অর্থও বিভিন্ন।

যেমন, যুক্তিহীন এলোমেলো কথা শুনলে আমরা অনেক সময় বন্ধুবান্ধবকে বলি, "তোর কথায় কোনও লজিক নেই।" আবার ডিজিটাল লজিকের বেলায় ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।

সেখানে কোনও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক বর্তনির 'আউটপুট' সব সময় 'হাই' অথবা 'লো'। যার মানে হল, বর্তনির আউটপুটে ভোল্টেজ আছে, না নেই। এর সমতুল হল, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির '1' অথবা '0'।

লজিকের ভাষায় যাকে আমরা তুলনা করতে পারি 'হ্যাঁ' অথবা 'না'-এর সঙ্গে।

লজিক বা তর্কশাস্ত্রের গোড়াপত্তন তো আজ হয়নি। সেই কোন 360 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টট্‌লের হাতে এর সূচনা হয়েছিল। এত দীর্ঘ সময়ের চর্চার ফলে লজিক অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে, অনেক সূক্ষ্ম হয়েছে। কিন্তু লজিকের এমন কিছু জট আজও রয়ে গেছে, যার সমাধান এখনও হয়নি।

প্রখ্যাত মার্কিন 'লজিশিয়ান' এবং ধাঁধা-বিশারদ রেমন্ড স্মালিয়ানের অভিজ্ঞতা থেকেই একটা লজিক-জটের উদাহরণ দেওয়া যাক। মাত্র ছ' বছর বয়েসে লজিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দিনটা ছিল পয়লা এপ্রিল, 1925 সাল। অর্থাৎ, 'এপ্রিল ফুল'-এর দিন। স্মালিয়ান সেদিন ফ্লুতে শয্যাশায়ী। সকালবেলায় তাঁর 16 বছর বয়েসী দাদা এমিল তাঁর বিছানার কাছে এসে বলল, "রেমন্ড, আজ তো এপ্রিল ফুলের দিন। তোকে আজ অ্যায়সা বোকা বানাব যে, তুই আগে কখনও এরকম বোকা বনিসনি।"

রেমন্ড তো সারাদিন বোকা বনার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন, কিন্তু এমিল তাঁকে বোকা বানায়নি।

রাতে শোওয়ার সময় মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে, এখনও ঘুমোসনি কেন?"

রেমন্ড বললেন, "দাদা আমাকে বোকা বানাবে, সেজন্যে অপেক্ষা করছি।"

মা তখন এমিলকে বললেন, "নে, ওকে বোকা বানা—এপ্রিল ফুল কর।"

তখন এমিল রেমন্ডকে বলল, "তুই ভেবেছিলি আমি তোকে বোকা বানাব, তাই না?"

"হ্যাঁ—" রেমন্ড বললেন।

"কিন্তু আমি তোকে বোকা বানাইনি, তাই তো?"

"হ্যাঁ—"

"কিন্তু তুই ভেবেছিলি বোকা বানাব?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানেই তো তুই এপ্রিল ফুল হয়ে গেলি।"

এই ব্যাপারটা ছোট্ট রেমন্ডকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এমিল তাঁকে এপ্রিল ফুল করেছে, না কি করেনি? যেহেতু এমিল তাঁকে এপ্রিল ফুল করেনি সেহেতু রেমন্ড বোকা বনেছেন। আবার, এমিল যদি রেমন্ডকে এপ্রিল ফুল না করে থাকে, তা হলে রেমন্ড বোকা বনলেন কেমন করে?

এইভাবেই প্রথম লজিকের জটের মুখোমুখি হয়েছিলেন রেমন্ড স্মালিয়ান।

সুতরাং এবারের ধাঁধা শুরু হোক লজিকের জট দিয়েই।

ফাঁসি, না ইলেকট্রিক চেয়ার

এই জনপ্রিয় ধাঁধাটি নানা চেহারায় নানা দেশে পরিচিত।

একজন অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাকে একটিমাত্র মন্তব্য করতে বলা হয়েছে। যদি মন্তব্যটি সত্যি হয়, তা হলে তাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে মারা হবে। আর তার কথা যদি মিথ্যে হয়, তা হলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। অপরাধী কী এমন মন্তব্য করতে পারে যার ফলে সে অবধারিত মৃত্যু এড়াতে পারে?

ভুল অঙ্কের লজিক

নীচে একটা গোলমেলে যোগ অঙ্ক দেওয়া হল :

```
  ONE
+TWO
-----
 FOUR
-----
```

অঙ্কের প্রত্যেকটি ইংরেজি বর্ণের বদলে যদি নির্দিষ্ট সংখ্যা বসানো হয়, তা হলে এমন কি করা সম্ভব যাতে যোগ অঙ্কটা ঠিক-ঠিক মিলে যায়? তবে মনে রাখতে হবে, কোনও নির্দিষ্ট বর্ণের জন্য সবসময় নির্দিষ্ট সংখ্যা বসাতে হবে। আর দুটি ভিন্ন বর্ণের জন্য কখনওই একই সংখ্যা বসানো চলবে না।

অন্ধকারে মোজার ম্যাজিক

জামা-প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে তাতন বেরোতে যাবে, আচমকা লোডশেডিং। তাতনের তখনও জুতো-মোজা পরা হয়নি। ওর ন' জোড়া মোজা রাখা থাকে ডেস্কের ড্রয়ারে। তিন জোড়া লাল, আর ছ' জোড়া নীল। বলতে পারো, অন্ধকারে অন্তত দুটো একরঙের মোজা পেতে হলে তাতনকে কমপক্ষে ক'টা মোজা ডেস্ক থেকে নিতে হবে?

২৫ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

শ্রেণীর শূন্যস্থানে কত বসবে

শ্রেণীতে যে-সংখ্যাগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো সবই বাইনারি সংখ্যা। অর্থাৎ, বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে লেখা। এই পদ্ধতির 'বেস' বা নিধান হল 2। ফলে শ্রেণীর শূন্যস্থানে বসবে বাইনারি 100 সংখ্যাটি। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে এর মান হল 4। আর যে-শ্রেণীটি লেখা হয়েছিল, দশমিক পদ্ধতিতে সেটি হবে এইরকম :

1, 2, 3, 4, 5, 6

তিনরকম একশো

3-কে 'বেস' হিসেবে ব্যবহার করলে 100 সংখ্যাটির দশমিক মান হবে 9। 7-কে নিধান হিসেবে ধরলে 100 সংখ্যাটির দশমিক মান দাঁড়াবে 49।

ঘনক আর গোলকের ধাঁধা

100 সেন্টিমিটার বাহুবিশিষ্ট একটি ঘনককে গালিয়ে সমান মাপের দুটি গোলক তৈরি করলে এক-একটি গোলকের ব্যাস দাঁড়াবে প্রায় 98.47 সেন্টিমিটার।

সঠিক উত্তর যারা দিয়েছে :

সৌরভ মজুমদার (অঞ্জনগড়, হুগলি), শুভঙ্কর চৌধুরী (কলকাতা-১৪), অনুশীলা রায় (আসানসোল), স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (করুণাময়ী, সল্ট লেক), সব্যসাচী চৌধুরী (কোন্নগর, হুগলি), রাজবল্লভ বিশ্বাস (কলকাতা-৮২), শঙ্খশুভ্র দে (পহলামপুর, হুগলি), অরিত্র রায় (শান্ত্রীনগর, বর্ধমান), অনিমেষ রায় (কোচবিহার), সৌমী রায় (অরবিন্দ নগর, মেদিনীপুর)।

অনীশ দেব

ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট, ফ্রলিকা থ্রী-ডি, পাফ্‌ অন্‌স আর কল্পনাশক্তি।

(ব্যস, এইটুকুই যথেষ্ট !)

ক্যামলিনের ফ্যাশন কালার্সে আপনার কল্পনার তুলি ডুবিয়ে নিন। এবার দেখুন এই অসাধারণ মিশ্রণে আপনার নিস্তেজ জিনিসে আসবে কেমন জীবনের স্পন্দন !

জামাকাপড়ে রঙের বাহার আনতে, শুরু করুন ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট কালারের ব্যবহার। এটি সবথেকে নরম ফ্যাব্রিক কালার, যাতে কোনো মিডিয়াম মেশানোরই দরকার নেই । অথচ খুব সহজে জামাকাপড়, ক্যানভাস আর সেরামিক্‌স-এর উপরে নিখুঁতভাবে আঁকা যায়। ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট আপনার জামাকাপড়ে আনবে রঙের জোয়ার, আর রাখবে নরম তুলতুলে। এই রঙ পাবেন ৪৭ টি বিভিন্ন শেডে, ৫টি প্রকারে - যেমন, ক্লাসিক, পার্ল, মেটালিক, গ্লিটার এবং ফ্লুরোসেন্ট।

ফ্রলিকা থ্রী ডি'র নিখুঁত কাজ

আর পাবেন, ফ্রলিকা থ্রী ডি ডাইমেনশনাল ফ্যাশন কালার্স - বিনা ব্রাশে, বিনা পরিশ্রমে আঁকবার এক নতুন পদ্ধতি, ভাবতে পারেন ? যদি থ্রী ডি ডিজাইন বা গ্র্যাফিটি (কাপড় বা অন্য কোনো জিনিসের উপর) তৈরি করতে চান, টিউব টিপে, তার নজল দিয়ে রঙ

ক্যানভাসে ক্রাইলিন আর ফ্রলিকা

সরাসরি প্যাটার্নের উপর বুলিয়ে দিন, তাহলেই হবে। তবে এর সাথে যদি আপনি ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট মেশান, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। ক্রাইলিন আল্ট্রা সফ্‌ট পাবেন ২৭ টি শেডে ও ৫ টি প্রকারে, যেমন - ক্লাসিক, পার্ল, মেটালিক, গ্লিটার ও ফ্লুরোসেন্ট।

পাফ্‌ অন্‌স টি-শার্ট

জামাকাপড়েই হোক, বা অন্য যে কোনো জিনিসেই হোক , যদি জাদু আনতে চান, ব্যবহার করুন হীট রাইজ পাফ্‌ অন্‌স। একটি ডিজাইনের উপর টিউব টিপে পছন্দমত রঙ লাগান, তারপর ২৪ ঘন্টা শুকাতে দিন। এবার উল্টো দিক দিয়ে ইস্ত্রী করুন বা ড্রায়ার ব্যবহার করুন। রঙ ফেঁপে উঠে এক ম্যাট ফিনিশ দেবে। এটি পাবেন ১২টি উজ্জ্বল রঙে।

আপনার কিট্‌টিকে সম্পূর্ণ করতে আমরা আপনাকে দিচ্ছি ক্যামেল ডিজাইন শিট্‌ কালেকশন্‌স আর ফ্যাব-ক্রাফ্‌ট আয়রণ অন্‌ ডিজাইন্‌স, যার থেকে আপনি মনের মতো ডিজাইন ট্রেস করে নিতে পারেন অথবা ইস্ত্রি করে কোনো প্যাটার্ন ছেপে নিতে পারেন। এবার তাহলে শুরু করা যাক, এগুলি ছাড়াও আরও অনেক কিছু করার পালা।

হিন্দীতে ও ইংলিশে, 'মুড্‌স্‌ অ্যাণ্ড আইডিয়াস্‌' নামে একটি দু ঘন্টার নিজে-করুন শিক্ষামূলক ক্যাসেট পাওয়া যাচ্ছে, যাতে ক্যামেল ফ্যাশন কালার্স-এর ব্যবহার সম্বন্ধে ২৫ টিরও বেশি পদ্ধতি দেওয়া আছে। এটি পেতে "ক্যামলিন লিমিটেড"-কে প্রদেয় ৬০০/- টাকার একটি ডিম্যান্ড ড্রাফ্‌ট সুচিত্রা, ক্যামলিন লিমিটেড, এ. এম. ডিভিশন, পি.ও. বক্স ৭৪১২, মুম্বাই-৪০০ ০৫৯- তে, আপনার অর্ডারসহ পাঠান। কোন্‌ ভাষার ক্যাসেট চান, সেটা জানাতে ভুলবেন না যেন।

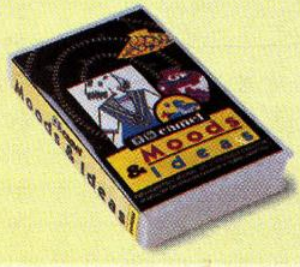

camlin সৃজনশীলতার হৃদস্পন্দন।

ANANDAMELA 6 NOVEMBER 1996 REGD. NO.
WB/CC/264 MH-BY-SOUTH-683 TN/MS(C) 731 Rs. 15.00

॥ মেতে উঠুন উজ্জ্বলতার উৎসবে ॥

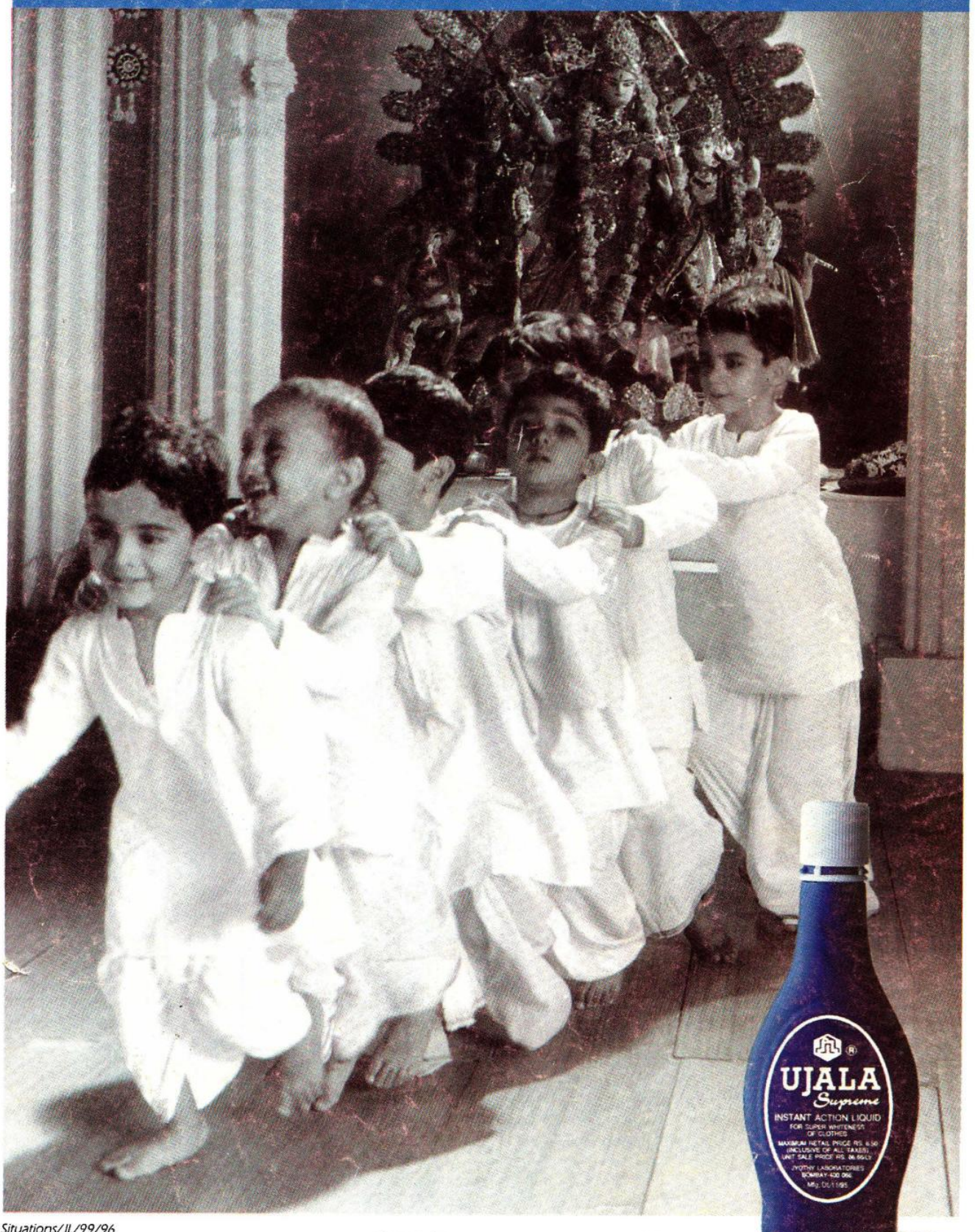

Situations/JL/99/96

FROM JYOTHY LABORATORIES, MUMBAI